বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষায় কর্মসংস্থান

মো. আবুল হাসান
খন রঞ্জন রায়

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষায় কর্মসংস্থান

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষায় কর্মসংস্থান

মো. আবুল হাসান
খন রঞ্জন রায়

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

www.pathagar.com

প্রকাশনার এক দশক

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষায় কর্মসংস্থান
প্রবন্ধসংকলন
মো. আবুল হাসান
খন রঞ্জন রায়

স্বত্ব
লেখকদ্বয়

প্রথম প্রকাশ
২৫ নভেম্বর ২০১৪

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com
web : www.ittadigranthoprokash.com

পরিবেশক
যুক্তরাষ্ট্র : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিক লেন, পূর্ব লন্ডন
রূপসী বাংলা লিমিটেড, ২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট, লন্ডন

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষরায়ন
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

ছাপাখানা
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
৪৫০ টাকা

Bangladesher Prekkhapatey Shikkhay Kormasongshatan by Md. Abul Hasan, Khana Ranjan Roy, Published by Ittadi Grantho Prokash : 25 November 2014. Price Tk. 450, ISBN: 978 984 904 428 4

www.pathagar.com

উৎসর্গ

স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মিশ্র জগতে বাস্তব আর অবাস্তবের
মুখোমুখি আমরা
বাস্তবতার দায়ে
পেশা সংক্রান্ত লেখার মাধ্যমে ঋণ শোধ
যাদের শ্রমে ঘামে
মেধা মননে আমরা ঋণী
এই সাধনাটি তাঁদের উদ্দেশে

www.pathagar.com

লেখকদ্বয়ের অন্যান্য বই

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ডিপ্লোমা শিক্ষা
ফেব্রুয়ারি-২০১২, গতিধারা প্রকাশন, ঢাকা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ
মে-২০১৩, জবান প্রকাশন, চট্টগ্রাম

উন্নয়ন ভাবনা ও স্যাঁতসেঁতে সাদা অতীত
নভেম্বর-২০১৩, জবান প্রকাশন, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

ভূমিকা

এটি সর্বজনবিদিত যে, শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন এবং মানুষকে দক্ষ, যোগ্য ও আলোকিত মানবসম্পদে পরিণত করা। বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিগত শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর, অকল্পনীয় ও ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে। ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান ও তার প্রভাব হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য।

বিশ্বব্যবস্থার সাথে এগিয়ে যেতে হলে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব-প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শিক্ষার কারিকুলাম ও ব্যবস্থাপনা সমসাময়িক করা জরুরি।

বর্তমান বাংলাদেশ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ, সুযোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদের সুযোগ্য দিক-নির্দেশনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করতে শিক্ষা-চিন্তার সমসাময়িকীকরণের ক্ষেত্র বিবেচনা করে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা আধুনিকায়নে গভীর বিশ্লেষণ অতীব প্রয়োজন। যাদের উন্নত দেশ বলে গণ্য করা হয় তারা প্রথমেই শিক্ষাকে প্রয়োজন নিরিখে সময়োপযোগী করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা পুঁজিনির্ভর। এখানে বিনিয়োগের বিষয় জড়িত। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখানে মূল ভূমিকা পালন করে। সুনির্দিষ্ট বিষয়কে শিক্ষার প্রধান শক্তিতে পরিগণিত করার কারণে তারা উন্নত। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন হয়ে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি চালু হওয়ার সময় থেকেই শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নে অনিবার্য উপাদান হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিকতার যাঁতাকল, দখল-বেদখল ও উদ্ধার-পুনরুদ্ধার রাজনীতির সমীকরণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক ও সময়োপযোগী এবং সত্যিকার মানবিক ও সমাজবান্ধব জ্ঞানভিত্তিক হয়নি। আমরা বুদ্ধিভিত্তিক শিক্ষার বেড়াজাল ছিন্ন করার প্রয়াসে অগ্রসরমান।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, তথ্য-প্রযুক্তি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, নারীর ক্ষমতায়নসহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নতি সাধিত হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর করার ক্ষেত্রে যারা দীর্ঘদিন ধরে অবদান রেখে চলেছেন তাদের অন্যতম মো. আবুল হাসান ও খন রঞ্জন রায়। একটি দক্ষ

www.pathagar.com

সুশিক্ষিত সৃজনশীল মানবসম্পদ নির্ভর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শক্তিশালী কল্যাণমুখী জাতি গঠনের শিক্ষা চালু করতে গত ২০ বছর যাবৎ লেখনীর মাধ্যমে সমাজকে শিক্ষাসচেতন করছেন লেখকদ্বয়। অনেক ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সফলতা পেয়েছেন। আলোচিত *বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষায় কর্মসংস্থান* বইটি সেই প্রয়াসের একটি অংশ। অনেক বিষয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে পণ্যভিত্তিক শিক্ষা তার আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়। কিছু বিষয় আমাদের চলমান অর্থনীতির সুদৃঢ় অবস্থানের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে। যেমন—বন, পানি, আইন, সাংবাদিকতা, মহিলা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয় অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্টকরণ সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। বইটিতে পানি বিশ্ববিদ্যালয়, বন বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবাদিকতা শিক্ষার আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ারী বটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রত্নসম্পদ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবিসহ যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষার ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং বর্তমানে বিশ্ব প্রেক্ষাপটের বিষয়ভিত্তিক কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে এই বইয়ে। সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলো পর্যালোচনা করে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা যাবে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ামকশক্তি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক শিক্ষার বহুমুখী রূপ উন্মোচিত হবে। সমাজব্যবস্থাতে গভীর মমত্ববোধ, আদর্শ, কল্যাণকামিতা ও দায়বদ্ধতার সংমিশ্রণ শিক্ষার একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত হবে।

আমার বিশ্বাস বইটি পাঠে আদর্শবাদী শিক্ষাচিন্তক হবেন। নীতিনির্ধারণী মহল এর থেকে উপকৃত হবেন। আর তা হলে লেখকদ্বয়ের শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা সার্থক হবে। সময়োপযোগী ইতিবাচক *বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষায় কর্মসংস্থান* বইটি প্রকাশের জন্য লেখকদ্বয় ও প্রকাশককে সাধুবাদ জানাই। সমাজের প্রয়োজনে প্রযুক্তি অন্বেষণে শিক্ষা বিষয়টি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্বপালনে দিকনির্দেশনার ভূমিকা পালন করবে।

আমি সুখপাঠ্য এই বইটির পাঠকপ্রিয়তা ও সফলতা কামনা করছি।

১৫ অক্টোবর ২০১৪
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী)
উপ-উপাচার্য

www.pathagar.com

আঁতুড়কথন

সভ্যতার প্রধান বাহন শিক্ষা। শিক্ষা প্রবাহমান। প্রয়োজনের নিরিখে চলমান। গুরুগৃহকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিবর্তন হয়ে যখন প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শিক্ষা চালু হয় তখন থেকেই শিক্ষা হয় অর্থনীতিনির্ভর। অর্থনীতির চালিকাশক্তি সমাজ। সমাজব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার নিবিষ্ঠ চেষ্টার ফলে শিক্ষা হয় মানবকল্যাণধর্মী, সমাজকেন্দ্রিক। মানব জীবনের অন্ধকার, কুসংস্কার দূর করে আলোকিত পরিবেশ সৃষ্টি হয় শিক্ষা থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজমুখী সৃজনশীল সমসাময়িক পরিবর্তনের শক্তিতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে জাতি হয় নির্ভরশীল।

আমাদের শিক্ষা কাঠামো ও কোর্স-কারিকুলাম দুর্ভাগ্যসৃষ্টি সহায়ক, কর্মসংস্থানভিত্তিক নয়। ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাশীল হওয়ার মতো ক্ষেত্র অনেক। কিন্তু বিকাশ লাভের সুযোগ সীমিত। প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পশ্চাদপদ করে। সু-শৃঙ্খল করে না। চেষ্টা হয়, তদবির হয়, কার্যকর হয় না। এর সুস্পষ্ট প্রভাবে ২ কোটি তরুণ উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট গ্রহণের সুযোগপ্রাপ্ত হয়েও শিক্ষার সুফল ভোগ থেকে বঞ্চিত। তাঁরা পরিবার, সমাজ ও দেশের বোঝা হয়ে শিক্ষাদীনতা প্রকাশের সহায়ক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মুনাফানির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সার্টিফিকেটের যাঁতাকলে নিষ্পেশিত হচ্ছে। শিক্ষা গ্রহণের পর প্রতিষ্ঠা পাওয়ার স্বপ্ন চুরমার হচ্ছে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে জাতীয় উন্নয়নকে প্রবলভাবে বাধাগ্রস্থ করছে।

কর্মসংস্থানকেন্দ্রিক সুর্নিদিষ্ট বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণের নির্ভরশীল সুযোগ থেকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে তরুণ যুব সমাজ। শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থার অর্থনীতিকে অগ্রসরমান খাত বিবেচনা করে একটি কর্মকেন্দ্রিক দক্ষ সৃজনশীল জাতি গঠনের শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন। নৈতিকতা নির্ভর শক্তিশালী সামাজিক শিক্ষা কাঠামোর অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা দীর্ঘদিন কলম চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা শিক্ষা গ্রহণের সুর্নিদিষ্ট কিছু নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন আকাঙ্ক্ষায় আক্রান্ত হয়েছি। প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণ চেতনা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বৈচিত্র্যময় আদর্শিক শিক্ষা বিতরণ

www.pathagar.com

প্রেরণার উদ্ভব এই লেখাসমূহ। এখানে মানবসত্তার বোধ ও বোধির বিকাশ চিন্তার ৭২টি সন্নিবেশিত প্রবন্ধে স্বতন্ত্র আইন, পানি, বন, সাংবাদিকতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় যুক্তি উপস্থাপন হয়েছে। আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধ, চলমান বিশ্বপ্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য সংকট মোকাবিলায় কী রকম ও ধরনের গুরুত্ববহ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রয়োজন তার একটি স্বচ্ছ ধারণা ও বর্ণনা যুক্ত আছে। সুর্নিদিষ্টকরণ কিছু বিষয় উল্লেখ আছে যেখানে কারা কিভাবে কেন কোন কোন নতুন বিষয়ে আমাদের এসএসসি উত্তীর্ণ দুরন্ত তরুণদের প্রতিভাউত্তরণে উদ্ভাবনশীলতা বিকাশ শিক্ষার সংমিশ্রণ ক্ষেত্র তৈরি করবেন।

আমাদের গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এই ব্যাপারে সুর্নিদিষ্ট দাবি-যৌক্তিকতা ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিলাম। ২৭.০৭.২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে জননেত্রী শেখ হাসিনা পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলেন। তরুণ শিক্ষার্থীদেরকে ব্যাপকহারে মধ্যমমানের প্রযুক্তিশিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ডিপ্লোমা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস ছিল উক্ত পরিকল্পনায়। দেশে বিচ্ছিন্ন মতাদর্শের ভিন্ন ভিন্ন ফ্যাকাল্টি, কাউন্সিল, পরিদপ্তর, অধিদপ্তরের মাধ্যমে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট প্রদানের ফলে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দেশ-বিদেশে নানা রকমের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এর অবসানই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে আমরা গত ২৯.০১.২০০৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে এবং ২০.১০.২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে 'সম্মিলিত ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড' প্রতিষ্ঠার প্রকল্প প্রস্তাবনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে উপস্থাপন করেছিলাম। কাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে সময় ও ব্যয় কমানোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যন্ত থেকে রাজধানী পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭-৮ ঘণ্টা কার্যকর থাকে। বাকি দীর্ঘসময় থাকে পরিত্যক্ত। সীমাহীন অসঙ্গতির ফল আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা। এসএসসি উত্তীর্ণ উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীদের বাঁধভাঙা আবেগ ভর্তিপ্রক্রিয়ায় দিকনির্দেশনাহীন হয়ে উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়। পরিত্যক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী থেকে বৃহৎ একটি অংশকে সৃজনশীলতা বিকাশের কর্মমুখী ডিপ্লোমা শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ করে দিলে বাণিজ্যিকীকরণের সার্টিফিকেট শিক্ষা রুখে দাঁড়াবে।

দেশে চলমান রাজনৈতিক সামাজিকতা ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কয়েকটি প্রস্তাবনার প্রবন্ধ জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। সবগুলোই দেশের নানাপ্রান্তের নানামত ও পথের পত্রিকার মাধ্যমে। অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। কিছু কিছু বিষয় সরকারি নীতি-নির্ধারণীমহল স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছে। দেশের শিক্ষাচিন্তক নীতিগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গও এর যথার্থ সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। আমাদের শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা এখানে সফল।

বিরস রচনার প্রবন্ধসমূহকে শ্রুতিমধুর রসবোধ জাগাতে আমাদেরকে সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাভাষা গবেষক অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান স্যার। বই আকারে প্রকাশের উৎসাহ ও আগ্রহবোধ জাগিয়েছেন ভাষা গবেষক অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক স্যার। শিক্ষা সমসাময়িকীকরণের সুর্নিদিষ্ট বিষয়সূচিকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝে উৎসাহজনক ভূমিকা লিখে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী স্যার। শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে আমাদের বিনীত ঋণ রইল। আমাদের চিন্তা-চেতনার সর্বাত্মক বহিঃপ্রকাশ ও বানানরীতি প্রচলিত ও স্বীকৃত ধারা শুদ্ধরূপে অনুসরণ বিষয়ে সতর্ক পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছে বন্ধুবর সাংবাদিক দেবদুলাল ভৌমিক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমাদের অনুজ মাধব দীপ। পড়ার টেবিলে গভীর রাত অবধি বিরামহীন সময় অতিক্রম করাকে মানবীয় নিষ্ঠার চোখে দেখেছে মিত্রা দেব। দ্বাদশবর্ষী ত্রিয়মা মাঝে মধ্যে নিজের পড়া ফেলে তাঁর বাবার কাণ্ড প্রত্যক্ষ করে জড়িয়ে ধরে উদ্দীপ্ত করেছে; কিছু বুঝে, কিছুটা না বুঝে। তাদের সকলের প্রতি রইল আমাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা।

বইটি প্রকাশের দায় বহন করায় *ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ* ও এর কর্ণধার জহিরুল আবেদীন জুয়েল-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। সুন্দর সাবলিল দৃষ্টি উপযোগী প্রচ্ছদ এঁকে ধন্যবাদার্হ করেছেন প্রচ্ছদ শিল্পী ধ্রুব এষ। অক্ষরবিন্যাসে অসাধারণ ধৈর্য ও কষ্ট স্বীকার করে নির্ভুল করার চেষ্টা করেছে আমাদের কম্পিউটার কর্মী মোস্তাক আহমদ, মো. মুরাদ ও মো. ফারুক। তাঁদের এই শ্রমকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধসমূহকে বিন্যাস করতে গিয়ে হয়তো পাঠক্রমে কিছু বিভ্রাট অনুভূত হবে। বাংলা বানানরীতির উপস্থাপনাসহ নানান কারণে প্রকাশনা শতভাগ নির্ভুল করা অতি জটিল কাজ। এ ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতার সাথে সকলে মিলে চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরেও হয়তো মুদ্রণপ্রমাদ কিছু রয়েছে। সব কিছু মিলে আপনাদের সহযোগিতা পরামর্শ ও মূল্যায়ন আমাদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে সহায়তা করবে—এ প্রত্যাশা রইল।

২২ জুলাই ২০১৪
৪৭, মতি টাওয়ার, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
০১৭১১১২২৪২৫, ০১৭১১০৬১২৮৬

মো. আবুল হাসান
খন রঞ্জন রায়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

স্বতন্ত্র আইন বিশ্ববিদ্যালয় ১৭
পানি বিশ্ববিদ্যালয় ২১
পূর্ণাঙ্গ বন বিশ্ববিদ্যালয় ২৬
উয়ারী বটেশ্বরে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ৩০
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের প্রস্তাবনা ৩৪
সাংবাদিকতা শিক্ষার স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮
ক্রমবিকাশের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ৪১
শিক্ষক হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা ৪৫
ধর্মীয় ও সামাজিক আবেদনের অর্থনীতি ৪৮
স্বপ্নের বিশ্বকাপ : দর্শনসুখ না সুফলভোগ ৫২
রিও অলিম্পিকের পূর্বপ্রস্তুতি ও আমরা ৫৭
হিরোশিমা নাগাসাকি বিপর্যয় ৬২
ব্যর্থ নার্সিং কাউন্সিল ও আমাদের প্রস্তাবনা ৬৬
ফার্মেসি কাউন্সিল ৬৮
রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ ও তাদের কর্মকাণ্ড ৭৩
কারিগরি শিক্ষাবোর্ড প্রসঙ্গে ৭৮
নারী-পুরুষ সমতা সূচক ৮৩
তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব ৮৬
উত্ত্যক্তকরণ প্রতিকারে কর্মসংস্থান ৯০
প্রশিক্ষিত ও পর্যাপ্ত নার্সেস সেবা ৯৩
অন্তত একটি হাসপাতাল হোক আন্তর্জাতিকমানের ৯৬
আমাদের শিশু মুক্তিযোদ্ধা ১০১

www.pathagar.com

প্রকৃত বিজয়ের অপেক্ষায় জাতি ১০৫
বিজয় চেতনার সূর্যশিখা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ১০৯
স্বাধীনতার অস্তিত্ব দুর্গমে পৌঁছাতে ১১২
দক্ষ জনশক্তির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা ১১৫
প্রসঙ্গ : নরসিংদীতে খালেদা জিয়ার মহাসমাবেশ ১১৮
নবনির্বাচিত নগরপিতাদের প্রতি জনপ্রত্যাশা ১২২
ডিপ্লোমা শিক্ষার বেহাল দশা : শিক্ষামন্ত্রীর আক্ষেপ ১২৫
সড়ক দুর্ঘটনা : বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ১২৯
বেওয়ারিশ লাশের মিছিল ১৩৩
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ১৩৭
যোগ্য শিক্ষক নিয়োগে ব্যর্থ নেপ ১৪০
এসএসসি উত্তীর্ণদের ভর্তি উৎকণ্ঠা ১৪৪
উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যহীনতা ১৪৮
ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম : প্রতিভাদীপ্ত উত্তরণ ১৫১
উপেক্ষিত মাতৃভাষা শিক্ষার ইনস্টিটিউট ১৫৫
সম্প্রসারিত হোক গ্রন্থসেবার পরিধি ১৫৮
চিনির চাহিদা পূরণের শিক্ষা ১৬১
দেশের চামড়া বাজারের অস্থিরতা ১৬৫
ডাক বিভাগের আধুনিকায়ন ১৬৮
বিমান পরিবহন ব্যবস্থা ১৭৩
পরমাণুশক্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারে বাংলাদেশ ১৭৬
সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ১৮০
পরিবেশ সংরক্ষণের পরিকল্পিত শিক্ষা ১৮৩
মাদকের ভয়াল থাবা ১৮৬
যুবসমাজের সমবায়ী মনোভাব ১৯০
জনাধিক্য সমস্যা উত্তরণ ১৯৬
বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা চ্যালেঞ্জ ২০০
ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালকরণে প্রতিবন্ধকতা ২০৬
হালকা প্রকৌশল শিল্প ২১০
ড্রাইভিং-এর সূর্যোদয় ২১৩
কর্মসংস্থানভিত্তিক মেধার বিকাশ ২১৬
মজুরিকাঠামো ও কর্মপরিবেশের ক্ষেত্র উন্মোচন ২১৯

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অনুষঙ্গ শিক্ষা ২২২
সাভার ট্র্যাজেডি : বিপর্যয় উত্তরণে যা প্রয়োজন ২২৫
মানব উন্নয়ন সূচক : অগ্রগতিতে বাংলাদেশ ২২৯
জাতীয় যুবদিবস : স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ ২৩২
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশায় তরুণ প্রজন্ম ২৩৬
স্বাবলম্বী ইউনিয়ন পরিষদ : সমৃদ্ধ দেশ ২৩৯
সংকটাপন্ন ব্রিটেনের তারুণ্য ২৪৩
আরববসন্তের উচ্ছ্বাস ও যুবশক্তি ২৪৬
মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক সুবাতাসে আমাদের প্রস্তুতি ২৫০
ভিয়েতনামের উদ্যোক্তা বিনিয়োগ পরিকল্পনা ২৫৪
প্রযুক্তি বিপ্লব ও সাংবিধানিক দ্বন্দ্বে মিসর ২৫৭
সঙ্কটময় মধ্যপ্রাচ্য ও বাংলাদেশের শ্রমবাজার ২৬০
উন্নত দেশের শ্রমবাজার ও বাংলাদেশ ২৬৩
বিশ্ববাসীর সুফল ভোগের শিক্ষা ২৬৬
আদিবাসী দশক : প্রাপ্তি ও অপূর্ণতা ২৭০
রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে লক্ষ্যচ্যুতি ২৭৫
দিনবদল প্রত্যাশার গুড়েবালিতে তরুণ প্রজন্ম ২৭৯
উদ্ভাবনশীলতার সূচক অধঃপতনে বাংলাদেশ ২৮১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র আইন বিশ্ববিদ্যালয়

বিচারব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণ করে আইনি প্রতিকার নিশ্চিত করা। পৃথিবীর বয়স যতদিন মানুষে মানুষে বিরোধের বয়সও ততদিন। মানবসভ্যতার শুরু থেকেই বিরোধ নিষ্পত্তির বিভিন্ন পন্থা মানুষ আবিষ্কার করেছে। আদালতের বাইরে বা আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিরও প্রক্রিয়া রয়েছে।

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা প্রধানত ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সে সময়ের প্রবর্তিত একহাজার চারশো আইন হুবহু বা কতিপয় পরিবর্তন সাপেক্ষে এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। আমাদের আইনব্যবস্থা এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সে কারণে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা আমদের বিচারব্যবস্থাকে অনেক পিছিয়ে রেখেছে। আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে সততা, নিরপেক্ষতা, ন্যায্যতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও মানবিক দিক প্রাধান্য থাকার কথা। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম, অবিচার, হয়রানি, স্বজনপ্রীতি, নিয়মবহির্ভূত ও অনৈতিক বিষয়গুলো দূরীকরণে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার সমসাময়িকীকরণ প্রয়োজন। আইনের প্রয়োগ ও বিচারকার্যে মানুষের সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। অথচ এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশের আদালতগুলোতে ২০১৪ সালের শুরুতে বিচারাধীন মামলা ছিল ২৪ লাখ ৫৪ হাজার ৩৬০টি। অধস্তন আদালতে বিচারকসহ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার পদের সংখ্যা এক হাজার ৭৬০। উচ্চ আদালতে রয়েছেন ৯৯ জন বিচারপতি। ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার মধ্যে আপিল বিভাগে সাড়ে ১৫ হাজার, হাইকোর্টে দুই লাখ ৯৭ হাজার ৭৩১ এবং অধস্তন আদালতে ছিল ২১ লাখ ৩৯ হাজার ৯৮২টি।

অন্যায়, অপরাধ, অবিচার, জুলুম, খুন-খারাবি, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে মানুষের শেষ ভরসা আদালত। সেই আদালতে যদি বিচারক

www.pathagar.com

স্বল্পতা বা শূন্যতা দেখা দেয় তাহলে জনগণের বিচারপ্রাপ্তি বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্ত হবে এটা স্বাভাবিক। সারা দেশেই কমবেশি বিচারক স্বল্পতা রয়েছে। প্রায় পাঁচ বছর আগে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের পর বিচার বিভাগীয় ২০২ ও নির্বাহী বিভাগের ১৬ জনসহ মোট ২১৮ জন ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করা হয়। এরপর প্রথম দফায় ৩৯০ এবং দ্বিতীয় দফায় ২১১ জন বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে দেশের চাহিদা অনুযায়ী বিচারকের সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। আমাদের ভয়াবহ মামলা জটের অন্যতম প্রধান কারণ বিচারকের অপর্যাপ্ততা।

কোনো অপরাধের বিচার দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মা ও পরিবার শান্তি খুঁজে পায় এবং অন্য অপরাধীরা অপরাধ করতে সাহস করে না। বিজ্ঞান প্রযুক্তির সমন্বয়ে অপরাধী শনাক্তকরণ ও বিচারপ্রক্রিয়া সহজ করে বর্তমান প্রচলিত বিলম্বিত বিচারব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অপরাধপ্রবণতা দমনের অন্যতম উপায়। উপজেলায় বিচারিক আদালত না থাকায় পুলিশি ব্যবস্থাও অতিমাত্রায় স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেছে। তার সঙ্গে রাজনীতির অপরাধপ্রবণতার একটা সখ্য গড়ে ওঠেছে। সার্বিক ভারসাম্যের জন্য উপজেলা পর্যায়ে বিচার বিভাগের সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

দেশের গ্রামীণ গরিবদের বিচারের সুবিধাদানের নামে আইন মন্ত্রণালয় ও আদালতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে 'গ্রাম আদালত আইন ২০০৬'-এর অধীনে ইউনিয়ন পরিষদকেন্দ্রিক একটি 'গ্রাম আদালত' ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ আইনের অধীনে ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যবিধির বেশ কিছু ধারাবলে মামলা রুজু করার বিধান রয়েছে। মামলার আবেদন করা, মামলা নথিবদ্ধ করা, বাদী-বিবাদীকে সমন দেয়া, সাক্ষ্যগ্রহণ, হলফনামা আইন ১৮৭৬ অনুযায়ী হলফ পাঠ করানো, লিখিতভাবে মামলার রায় প্রদান ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট বিধান এ আইনে রয়েছে। ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপের বিধানও রয়েছে। গ্রাম আদালত আইন অনুযায়ী এ আদালতের বিচারক নিয়োজিত করা হয় ইউপি চেয়ারম্যান, দুজন ইউপি সদস্য এবং অপর দুজন সাধারণ মনোনীত ব্যক্তি। তাদের কারো বিচারকার্য পরিচালনার উপযোগী শিক্ষাগত পটভূমি, আইন বিষয়ে দক্ষতা, প্রয়োজনীয় আইনবিষয়ক শিক্ষা প্রশিক্ষণ নেই। এ আদালতের ওপর দেশের উচ্চতর কোনো আদালতের নজরদারি পর্যন্ত নেই। প্রায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে এ আদালতের বিচারকদের রায় লেখার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ নেই। এ আদালতের প্রদত্ত রায় কার্যকর করার মতো ইউনিয়ন পরিষদের যথাযোগ্য প্রশাসনিক শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

www.pathagar.com

এসব কারণে ২০১২ সালের ২৮ নভেম্বর ওয়াশিংটনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'দ্য ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্টে'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের ৯৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের দেওয়ানি বিচারব্যবস্থা সবচেয়ে খারাপ। প্রতিবেদনে বলা হয়, মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগা ও বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতিই দেওয়ানি বিচারব্যবস্থায় বাংলাদেশ সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকার জন্য দায়ী।

বর্তমানে চলমান স্বাধীন বিচার বিভাগের কাছ থেকে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। একটি দেশের বিচারব্যবস্থার সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা না গেলে রাষ্ট্রের সার্বিক শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতাও নিশ্চিত করা যায় না। দেশে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিচারপতি নিয়োগের ঘটনা ঘটছে। বিচারপতি নিয়োগব্যবস্থায় সংস্কার আনা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক পরিশুদ্ধি আনা সম্ভব নয়। মেধা ও দক্ষতা এ দুটি বিষয় যাতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিশ্চিত হয় সেটি দেখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। মেধাবিচারে শিক্ষাসনদ বাংলাদেশের প্রধান মাপকাঠি হলেও ডিগ্রি সবসময় মেধাবিচারে একমাত্র বিবেচ্য হয় না। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি কর্ম কমিশনের পরীক্ষাকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয়।

২০২১ সালে জাতি অত্যন্ত ধুমধামের সাথে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করবে। জাতির প্রত্যাশা এরই মধ্যে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠবে। নিম্ন থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত বিচারক নিয়োগ হবে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে সরকারি কর্ম কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে হতে পারে। বিচারক কর্মস্থলে থেকে দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবে, এমফিল, এমএস, ডক্টরেট, পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করবে। প্রমোশনের ক্ষেত্রে গবেষণা, প্রকাশনার মূল্যায়ন করা হবে।

আগামী দিনে বাংলাদেশের শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য-সাংস্কৃতি, ক্রীড়া, অর্থনৈতিক, সামরিক, ভূমি, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক স্বার্থ নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে লড়াই করতে হবে। এর জন্য এ দেশের তরুণ আইনজীবীদের এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে। আইন বিষয়ে শিক্ষা প্রসারে বর্তমানে যেসব সরকারি, বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে ওইসব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষাকাঠামো অপ্রতুল।

দেশে আইন শিক্ষা বিস্তারে এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ফলে যে বিপুল সংখ্যক মানসম্পন্ন আইনজীবী প্রয়োজন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় তা

www.pathagar.com

কুলিয়ে উঠতে পারছে না। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ বিদ্যমান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষক থাকলে তো বই নেই, ক্লাস রুম থাকলেও যানবাহন-হোস্টেল নেই—এই অবস্থা। বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্রছাত্রী ভর্তি নীতিমালা গ্রহণ করা হয়নি।

বিচারাঙ্গণের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং বিচারব্যবস্থা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রয়োজন দেশে আইনশিক্ষার প্রসার। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিচারকার্য গণমুখী করা সম্ভব।

দৈনিক ইত্তেফাক : ২৩ নভেম্বর ২০১৩

www.pathagar.com

পানি বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। প্রকৃতপক্ষে ৩৬১ মিলিয়ন স্কয়ার কিলোমিটার জল এবং ১৪৯ মিলিয়ন স্কয়ার কিলোমিটার স্থল। আবার এই স্থলভাগে রয়েছে নদী, হ্রদ, জলাভূমি ও হিমবাহ, যা ভূপৃষ্ঠে জলের উৎস। আর আছে ভূগর্ভস্থ জল। এসব মিলিয়ে সমস্ত জলের দুই শতাংশের কিছু বেশি বিশুদ্ধ জলের এক শতাংশেরও কম জল ব্যবহারযোগ্য। হিমশীলত তুষার ও হিমবাহ সঞ্চিত দুই-তৃতীয়াংশের বেশি বিশুদ্ধ জল পাওয়া প্রায় সম্ভব হয় না। প্রতি বছর গড়ে ১,১২,০০০ কিউবিক লিটার জল তার ৭০,০০০ কিউবিক কিলোমিটার ভূপৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীভবন ও উদ্ভিদ থেকে বাষ্পাকারে নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। জলপ্রবাহের ধারাবাহিকতা নিয়ে মানুষের কৌতূহল, কল্পনা আবহমান কাল ধরে। পুরাণে-ধর্মে, গল্প-গাথায় কখনো দেবীত্ব আরোপ করা হয়েছে নদীর ওপর, কখনো কল্পনায় অলৌকিক সব ঘটনা রচনা করা হয়েছে নদীর প্রেক্ষাপটে। ইতিহাসজুড়ে মানুষের জীবনযাপনের, সমাজ-সাংস্কৃতির একেকটি পর্বের অনেক আবেগ-অনুভূতির সাক্ষী জল প্রবাহের এই ধারা। গ্রিক-রোমান যুগে জলযুদ্ধের সময় রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভূমধ্যসাগর, যা সালামিস ও একটিয়াম জলযুদ্ধেরও লীলাক্ষেত্র। পরবর্তীতে মানবসভ্যতার অগ্রগতির ফলে ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর মানব সংগ্রামের নতুন ক্ষেত্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মাত্র এক-চতুর্থাংশ স্থলভূমিতে বসবাসকারী মনুষ্য নামক প্রাণীর ক্ষেত্রে জলাভাব এক প্রবল সমস্যা। প্রাকৃতিক কারণে জলাভাব হলো উপাদানজনিত সমস্যা। সমুদ্রের জলে আছে প্রচুর পরিমাণে লবণ। তা না-লাগে পানের কাজে, না সেচের কাজে। নদী, খাল, বিল, পুকুর, ইঁদারা, ঝরনা এবং ভূগর্ভস্থ পানির সুষম জোগান সীমিত।

পানির অধিকার প্রতিষ্ঠা করার বিবাদ মানেই রাজনৈতিক বিবাদ। কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ পানি বিবাদ হলো কোনো দেশের রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দলগুলোর মধ্যে মিষ্টি জলের অধিকার ও ব্যবহার নিয়ে বিবাদ। অপরপক্ষে আন্তর্জাতিক পানি বিবাদ হলো একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী নিয়ে বিবাদ। সমুদ্রতীরবর্তী দেশ না হলে এই বিবাদে যুক্ত হওয়ার প্রশ্নেই ওঠে না। এ কারণে সমুদ্রসীমা বিযুক্ত দেশকে অন্যকোনো দেশের সহানুভূতি এবং সাহায্য নিয়ে চলতে হয়। সমুদ্র সংলগ্ন হওয়া প্রত্যেক দেশের জন্য ঐশ্বরিক প্রাপ্তি।

মিঠা পানির উৎসকে মানুষ দুভাবে ব্যবহার করে। প্রথমটি হলো নদীর জলপ্রবাহকে সরাসরি কাজে লাগানো। নৌ-চলাচল, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, খালের সাহায্যে জল সেচ, মাছ এবং জলজপ্রাণী উৎপাদন এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, জল নদী, হ্রদ অথবা ভূগর্ভ থেকে উত্তোলন করে ব্যবহার করা হয়।

পানিই জীবন, কিন্তু পানি মানুষের অসুস্থতা বা মৃত্যুর কারণও হতে পারে। পৃথিবীর মতো মানুষের দেহেও প্রায় তিনভাগ পানি অথবা তরল পদার্থ। জলের প্রয়োজনীতা কারোর-ই অজানা নেই। একজন মানুষের প্রতিদিন পানীয় হিসেবে কমপক্ষে ২ লিটার থেকে ৫ লিটার পর্যন্ত পানি প্রয়োজন হয়। শরীরের নিজস্ব প্রয়োজনেই যে পানি দরকার তা প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। মানুষের লালায় ২০ শতাংশ, পাকস্থলির ৯৭ ভাগ, পিত্ত ৮৮ শতাংশ, মাংসে ৭৫ শতাংশ, ঘামে ৮ শতাংশ আর হাড়ে ১৩ শতাংশ পানি। এভাবে শরীরজুড়ে থাকা শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত রক্তরস, দেহের প্রতিটি কোষ ইত্যাদিও পানি পরিপূর্ণ। এই পানির একটা বিরাট অংশ প্রতি মুহূর্তেই বাইরে বেরিয়ে আসছে। ঘাম, মূত্র, মল বা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এই পানি বেরিয়ে আসে। যেমন ঘামের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ সিসি, মূত্রের মাধ্যমে ২৫০০ সিসি, শ্বাসত্যাগের মাধ্যমে ৩৫০ সিসি পানি।

পানির এই অসীম গুণ সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিরাও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলকেই তিনবার স্নানের ব্যবস্থা, ভোরবেলা খালি পেটে উষাপন, পূর্ণ খাওয়ার ১ ঘন্টা আগে পানিপান, খাওয়ার ১ ঘন্টা পরে পানিপান এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিকারের জন্য বিশেষভাবে পানির প্রয়োগ, অবগাহন স্নান, আতপ্লান, বমন ধৌতি, বারিসার ধৌতি, সহজ অগ্নিসার ধৌতি, নির্দিষ্ট সময়ে জলপানবিধি, জলপট্টির ব্যবহার ইত্যাদি বহু ব্যবস্থা প্রচলন করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রাচীন কাল থেকে জলীয় এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত। প্রাচীন মিশরীয়, গ্রিক এবং রোমান সভ্যতায়ও মুনি-ঋষিদের এ ধারা অব্যাহত ছিল।

www.pathagar.com

ভারতীয় উপমহাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশে জলের ভূমিকা অসামান্য। শিল্পায়নের তাগিদে জলের চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। প্রয়োজন মেটাতে শুধু নদী-নালার জল নয়, ভূ-গর্ভস্থিত পানির উপর কুদৃষ্টি চলছে। প্রায় প্রতিটি শিল্পজাত দ্রব্য তৈরিতে জলের প্রয়োজন। শিল্পে কেবল মিষ্টিজলের প্রয়োজন হয়। সেসব শিল্প ধাতু, কাঠ, কাগজ, রাসায়নিক, গ্যাসোলিন, তেল বা অন্য অনেক দ্রব্য তৈরি করে, তাদের কোন না কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পানি ব্যবহৃত হয়। বেশি প্রয়োজন খাদ্য শিল্পে, ওষুধ শিল্পে, বস্ত্র শিল্পে, চর্ম শিল্পে, সিরামিক শিল্পে, কাগজ শিল্পে, রাসায়নিক শিল্পে, একক ধাতুশিল্পে এবং জ্বালানি তেল শোধনশিল্পে। এমনকি মোটরগাড়ি তৈরিতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে পানির প্রচলন রয়েছে। ইট শিল্প, সিমেন্ট শিল্প প্রভৃতি যেমন পানি নির্ভর, তেমনি অসংখ্য কুটির শিল্পও জলভিত্তিক—যেমন মৃৎশিল্প, খাদ্যানুষঙ্গ (কাসুন্দি, সস, পাঁপড়, আচার, ভিনিগার ইত্যাদি) মিষ্টি ইত্যাদি। এছাড়া রন্ধন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে পানির অপরিহার্যতা সকলেই বিদিত। সিমেন্ট শিল্পে পাথর, চুন ও অন্যান্য নানান কঠিন বস্তুকে পাউডার করে পানিতে গুলে গোলা তৈরি করা হয়। সেই গোলাকে উচ্চ তাপে শুকিয়ে নিয়ে সিমেন্ট পাউডার হয়—যা বর্তমান সভ্যতার অন্যতম প্রধান উপকরণ।

পানির মোট ব্যবহার কৃষিকার্যে ৭০ ভাগ, শিল্পে ২২ ভাগ, ব্যক্তিগত খাতে ৮ ভাগ, অবশ্য উন্নয়নশীল ও উন্নত বিশ্বের হিসাবে কিছুটা হেরফের থাকে। একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই পানির ব্যবহারের পরিসংখ্যান দাঁড়াবে প্রায় ২০,০০০ ঘনকিমি প্রতি বছরে। এই পরিমাণ পানি নদী এবং ভূ-গর্ভ থেকে পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে মিঠা পানি একটি দুর্লভ সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। এর কারণ হিসেবে পৃথিবীর প্রায় পঁচিশটি দেশ ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মারাত্মক আর্সেনিক দূষণের শিকার হয়েছে। দেশগুলি হলো– আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, কানাডা, চিলি, চীন, গ্রিস, হাঙ্গেরি, ভারত, জাপান, লাওস, মেক্সিকো, মঙ্গোলিয়া, মিয়ানমার, নেপাল, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, পেরু, ফিলিপাইনস্, রোমানিয়া, সাউথ আফ্রিকা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, আমেরিকা এবং ভিয়েতনাম।

পানি ও পরিবেশ শব্দটির সাথে 'দূষণ' বর্তমানে সমোচ্চারিত। জল, স্থল আর বায়ুমণ্ডলের দূষণ নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা চিন্তিত ও বিব্রত। সেই চিন্তা আরো ভায়াবহ রূপ নিয়েছে সমুদ্র-দূষণের ভয়ংকর পরিস্থিতি দেখে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্রের এই বিশাল জলরাশি সম্পদে পরিপূর্ণ। পানিতে যে

www.pathagar.com

পরিমাণ বর্জ্য আসে তার অধিকাংশই জৈব পদার্থ। জৈব পদার্থের মিশ্রণে সমুদ্রের পানি বিষাক্ত আকার ধারণ করছে। অথচ পানি ব্যবহারে নানা আধুনিক প্রযুক্তির সংমিশ্রণ হচ্ছে। যীশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশো বছর পূর্বে মুসলিম সভ্যতার পিঠস্থান সিরিয়াতে কাচের তৈরি বোতলের পানি বিক্রির প্রচলন ছিল। এ ছাড়া সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সে এই পানি ব্যবহার জোরেশোরে শুরু হয়। তখন ইউরোপে সংস্কারভিত্তিক বিশ্বাস ছিল যে, বোতলজাত খনিজ ও ঝর্ণার পানি খেলে কিডনির পাথর নষ্ট হয় এবং আয়ু বৃদ্ধির পথ সুগম হয়। এ কারণে ইউরোপ ও আমেরিকায় এর ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফ্রান্সে বোতলজাত পানি শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং এটি সামনে রেখে ১৮৫৫ সালে ফ্রান্সে আইনগত দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। আজ সুপেয় পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বোতল পানি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়।

বাংলাদেশেও বোতলজাত পানির প্রথম পদচারণা শুরু হয় ১৯৯০ সালে। সম্প্রতি ভারত মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমার অধিকারী হয় বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগর সম্পদে ভরপুর। এখানে রয়েছে তেল-গ্যাসসহ বিভিন্ন আকরিক সম্পদ। এর বালিতে রয়েছে মূল্যবান খনিজ উপাদান। জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে এর সমৃদ্ধি কোনো অংশে কম নয়। বঙ্গোপসাগরে প্রায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, ২৬ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ঘুন্টি হাঙ্গর, হাতুড়ি হাঙ্গর, করাতি হাঙ্গর, পিতাম্বরী, হাউস পাতা, শঙ্খচিল, পদ্ম ইলিশ, চন্দনা ইলিশ, গুর্তা ইলিশ, কোরাল, করাতি অলুয়া, লটিয়া, সফেদি, বাংদা, মৌরি, মালাবার মৌরি, চাম্পা, মিনি মাছ, সামুদ্রিক কই, লাল দাতিনা, রুপালি পোয়া, সোনালি বাটা, বিশ তারা, ছুরি মাছ, রূপচান্দা, ফলি চান্দা, ডোরা রঙিলা, খল্লা, তাপসী, রুপালি পটকা, জিহ্বা শোল, সার্ডিন, বাগদা চিংড়ি, হরিণা চিংড়ি, চাকা চিংড়ি পুষ্টিগুণে গুণান্বিত আমাদের ঐতিহ্য। এই সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন সময়ের দাবি।

মোনালিসার হাসির মতো রহস্যঘেরা পৃথিবীর জল সৃষ্টির রহস্য। আমাদের সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবীতেই তরল অবস্থায় প্রচুর পরিমাণ পানি আছে। পৃথিবীতে মোট ১৪০ কোটি কিউবিক কিলোমিটার পানি আছে। যার তিন-চতুর্থাংশ বরফ হিসেবে রয়েছে পর্বতচূড়ায়। ভূপৃষ্ঠের ৭১ শতাংশ পানি ঢাকা। ১.৬ শতাংশ পানি রয়েছে ভূগর্ভে আর ০.০০১ শতাংশ পানি আবহমণ্ডলে বাতাসে মিশে বা মেঘ হয়ে। ভর অনুযায়ী ৯৭ শতাংশ পানি আছে সমুদ্রের নোনা পানি হিসেবে, পর্বতচূড়ায় ২.৪ শতাংশ এবং জলাশয়, নদী ইত্যাদিতে ০.৬ শতাংশ। আবহমণ্ডলের উপরিভাগে ০.০০০০৪ শতাংশ।

www.pathagar.com

মেরু প্রদেশের জমা বরফ সম্পূর্ণ গলে তরল হয়ে গেলে সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্তমানের তুলনায় ৭৩ মিটার উচ্চতায় বেড়ে উঠবে।

কোটি কোটি বছর ধরে কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় অবস্থান জলের পৃথিবী। বাংলাদেশে পানি নিয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হয়নি। একটি পানি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পানির উত্থান-পতন গতিপ্রকৃতির শিক্ষায় উদ্দীপ্ত করবে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের। অবহেলিত পানি সম্পদের প্রতিভাদীপ্ত ব্যবহারের ফলে সম্ভাবনার বাংলাদেশ নতুন দিগন্তে উপনীত হবে।

দৈনিক আজাদী : ১৬ জানুয়ারি ২০১৪

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ বন বিশ্ববিদ্যালয়

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের অনেক আগে গাছের জন্ম। মানুষের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনে গাছ জড়িয়ে আছে একান্ত আপনজনের মতো। প্রথম মানব-মানবী আদম ও হাওয়া সৃষ্টির আনন্দে আকাশ-পাতাল, সূর্য-তারা, বৃক্ষ-লতাসহ যাবতীয় সৃষ্টি দিয়ে ভরে তোলেন স্বর্গ-মর্ত চরাচর। এরপর সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ করেন মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমে। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদি ধর্ম গ্রন্থ যে স্থানেই স্বর্গের বর্ণনা আছে সেখানেই সবুজ ঘাসের গালিচায় ঢাকা সুশোভিত পুষ্প-পল্লবে, বৃক্ষ-লতায় সমৃদ্ধ বাগান, দৃষ্টিনন্দন স্রোতস্বিনী, সুস্বাদু ফলফলাদির চিত্র আঁকা। সনাতন ধর্মগ্রন্থ বেদ—বৃক্ষবন্দনার শ্লোকে সমৃদ্ধ। রামায়ণ-মহাভারতের ছত্রে ছত্রে বৃক্ষলতা কিংবা কুঞ্জবনের বর্ণনা এসেছে নানারূপে, নানাভাবে। রাম-সীতার বনবাস, রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন; সবখানেই বৃক্ষ গুল্ম লতাপাতার অহর্নিশ বর্ণনা। রবিঠাকুর বলেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর' এ কথাটির মর্মবাণী আমাদের শুধু বুঝলেই চলবে না উপলব্ধি করতে হবে। শান্তিনিকেতনেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি পেয়েছিলেন। বৃক্ষতলে বসেই তাঁর ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করেছে। অশ্বত্থ বৃক্ষতলে সাধনা করে আড়াই হাজার বছর আগে মহামানব বুদ্ধ মানুষের মুক্তির পথে খুঁজে পেয়েছিলেন।

গাছ ছাড়া পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সৃষ্টিজগতে প্রাণি হিসেবে বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান অক্সিজেনের জন্য মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৃক্ষের উপর নির্ভরশীল। জীবনের জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন ও পানিসম্পদ উদ্ভিদজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, উন্নতজীবনের জন্য জ্বালানি কাঠ, শিল্প কারখানার কাঁচামাল, আসবাবপত্র, গৃহায়ন ও নির্মাণসামগ্রী, জীবজন্তুর খাদ্য এবং মানুষের প্রধান খাদ্য শস্য, ফলমূল, ওষুধপত্র ইত্যাদির জন্যও মানবজাতি উদ্ভিদজগতের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধেও গাছপালার ভূমিকা অপরিহার্য। বৃক্ষ জীবন ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

উপাদান, অকৃত্রিম বন্ধু। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে ধরিত্রীকে বাসযোগ্য রাখতে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। 'বৈশ্বিক উষ্ণতা' জলবায়ু পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বলে বিবেচিত। বৃক্ষ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের মাধ্যমে উষ্ণতা হ্রাস করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কমাতে সহায়তা করে। কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, বাসস্থান, চিকিৎসা, জ্বালানি তথা জীবন ও জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। মোট বনভূমির পরিমাণ ২ দশমিক ৫২ মিলিয়ন হেক্টর, যা মোট ভূমির প্রায় ১৭ শতাংশ। তবে বেসরকারিভাবে বনভূমির পরিমাণ আরো কম। দেশে ম্যানগ্রোভ বন ০ দশমিক ৭৩ মিলিয়ন হেক্টর, পাহাড়ি বন ১ দশমিক ৪ মিলিয়ন হেক্টর, শাল বন ০ দশমিক ১১ মিলিয়ন হেক্টর এবং গ্রামীণ বন ০ দশমিক ২৭ মিলিয়ন হেক্টর। বন বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বনের পরিমাণ ১ দশমিক ৫২ মিলিয়ন হেক্টর (১০ দশমিক ৩০ শতাংশ)। পরিবেশগতভাবে এ দেশে বন আছে চার ধরনের। এসবের মধ্যে উষ্ণমণ্ডলীয় চির সবুজ বন, উষ্ণমণ্ডলীয় আংশিক চির সবুজ বন, উষ্ণমণ্ডলীয় ম্যানগ্রোভ বন ও উষ্ণমণ্ডলীয় আর্দ্রপত্রমোচী বন। বনজ সম্পদের অবদান জিডিপিতে ১ দশমিক ৮৬ শতাংশ। কৃষিখাতে ৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪ শতাংশ কর্মসংস্থানে জড়িত বন বিভাগের সাথে।

বাংলাদেশে বৃহৎ বা গভীর অরণ্য নেই। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন আছে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কূলঘেঁষে সুন্দরবন, সিলেটের সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনাঞ্চল, গাজীপুরের ভাওয়াল গজারি বন, টাঙ্গাইলের মধুপুর বনাঞ্চল, দিনাজপুরের শালবন, কুমিল্লার শালবন বিহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এককালে এসব বনাঞ্চল বড় বড় গাছপালায় পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমানে দেশের বনাঞ্চলগুলো উজার হওয়ার পথে। বৈশ্বিক গুরুত্বের দিক থেকে সুন্দরবন এক অনন্য বনভূমি। এটি উপকূলীয় বা প্যারাবনের প্রান্তর। চিরপরিবর্তমান দ্বীপমালা ও সর্পিল খালের চোখজুড়ানো গোলকধাঁধা তৈরি করে বাংলাদেশের উপকূল হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত চলে যাওয়া ব-দ্বীপের পুরোটাতেই এর বিস্তৃতি। সুন্দরবনে বাংলাদেশ অংশটি ছড়িয়ে আছে প্রায় ছয় হাজার বর্গকিলোমিটার এলকাজুড়ে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম প্যারাবন ও বিপুলসংখ্যক জীববৈচিত্র্যের আবাস। বন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শিক্ষা, গবেষণা ও পরিকল্পিত বনায়নের

www.pathagar.com

মাধ্যমে কেবল বনজ সম্পদ রফতানি থেকে বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।

বিশ্বে একাধিক দেশ আছে যেসব দেশ বনজ সম্পদ রফতানি তালিকার শীর্ষে রয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বনজ সম্পদ। জাতিসংঘ প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, গত ১০ বছরে বিশ্বের এক কোটি ৭০ লক্ষ হেক্টর বনাঞ্চল বিলুপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে গড়ে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার পরিবেশবান্ধব ফুল ও ফলের গাছ কাটা হয়। যে কোনো দেশে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এক-চতুর্থাংশ বন থাকার কথা সকলেরই জানা। বর্তমানে আমাদের আছে মাত্র ৭ শতাংশ। পরিমাণ প্রায় ২ দশমিক পাঁচ দুই মিলিয়ন হেক্টর। আমাদের দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১০০ মানুষ বসবাস করে, এখানে বনাঞ্চলসহ অনেক কিছু রক্ষা করা কঠিন। যেসব প্রাণি বনে বাস করে তাদের বন্যপ্রাণী বলা হয়। বন্যপ্রাণী হলো বন বা সবুজের অতন্দ্রপ্রহরী। এরা বনের শোভাবর্ধন করে। বন্যপ্রাণী প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। বনজ সম্পদ সংরক্ষণের অন্যতম নিরাপত্তার জন্য গ্রামের নির্দিষ্ট এলাকা বন্য পশুপাখির নিরাপদ স্থান 'অভয়ারণ্য' হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এখানে বনের পশুপাখিরা নিরাপদে বিচরণ ও প্রজনন মৌসুমে বংশ বিস্তার করতে পারে।

সবুজ বনরাজি, বিশাল জলরাশি আর চোখে লাগা পাহাড়ি এলাকা নিয়ে এক বিস্ময়ভূমি ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু এখন এ অবস্থা আর নেই। নদীতে চর পড়েছে। সবুজ বনভূমি অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। যেটুকু আছে তাও আবার ধ্বংসের মুখে। বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করে বৃক্ষের অস্তিত্বকে মানুষ বিপন্ন করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারত উপমহাদেশে স্থলভাগের আশি শতাংশ প্রাকৃতিক বনভূমি ছিল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনবসতির ঘনত্বের কারণে বন সম্পদ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশে সিপাহি বিপ্লবের পর বন ধ্বংস শুরু হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ রাজশক্তিই সামরিক ঔপনিবেশিক স্বার্থে বিশ্বব্যাপী বন সম্পদ ধ্বংস করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ও পাক দখলকার বাহিনী লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ ও বন সম্পদ ধ্বংস করে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোকে বৃক্ষশূন্য মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। এবার চলমান রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে সজীব সবুজ বৃক্ষকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তা একাত্তরেও হয়নি। বৃক্ষের গুরুত্ব অনুধাবণ করে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা আমাদের দেশে

www.pathagar.com

প্রতিবছরই সাড়ম্বরে আয়োজিত হয়। প্রতিবছর পহেলা জুন থেকে পরবর্তী তিন মাস চলে এই কার্যক্রম। এই কর্মকাণ্ডের আওতায় দেশের মানুষকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা যায়, তবে শেষপর্যন্ত তাদের কতজনকে এই কর্মে যুক্ত রাখা সম্ভব হয় তা নিয়ে বন গবেষকদের পরিসংখ্যান নেই।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন ও বনজসম্পদের উন্নয়ন সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ক গবেষণার একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বনসম্পদের সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারবিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে (ফরেস্ট প্রোডাক্ট ল্যাবরেটরি) নামে পরবর্তীতে ১৭৫ একর জমির উপর বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় চট্টগ্রামে। ১৯৬৮ সালে বনজসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের পাশাপাশি বনজসম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে বিএফআরআই-কে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। ১৭টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে বিএফআরআই প্রায়োগিক ও অভিযোজিত গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ১৯৮৫ সাল থেকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের বনবিষয়ক একমাত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি দেশে বনবিদ্যাবিষয়ক একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। এতে ১১,৮৩২ বই, বুলেটিন এবং মনোগ্রাফ রয়েছে। এ ছাড়া নিয়মিতভাবে ১২টি স্থানীয় ও ৭৯টি আন্তর্জাতিক সাময়িকীর সাথে প্রকাশনা বিনিময় কর্মসূচির আওতায় পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় করা হয়। এখানে প্রথম শ্রেণির ১০৩ জন, ২য় শ্রেণির ৪৫ জন, তৃতীয় শ্রেণির ৪৩১ জন ৪র্থ শ্রেণির ২১৩ জন মিলে মোট কর্মরত চাকরিজীবীর সংখ্যা ৭৯২ জন। বাংলাদেশে বন সংক্রান্ত শিক্ষা প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনার একমাত্র বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান এটি। অতীতে বিশেষায়িত অনেক প্রতিষ্ঠান যেমন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি আদেশবলে প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। একটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানকে বন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তর করলে, বনজ শিক্ষা ও বনজ সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথ উন্মুক্ত হতো বাংলাদেশের।

দৈনিক সংবাদ : ২১ মার্চ ২০১৪

www.pathagar.com

উয়ারী বটেশ্বরে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ ৯ মাস ৫৫ হাজার বর্গমাইলের ক্ষুদ্র বাংলাদেশে ভুট্টো-ইয়াহিয়ার দোসর জেনারেল টিক্কা-নিয়াজীর নেতৃত্বে পাকিস্তানি বর্বর সেনা-নৌ-বিমান বাহিনী ধ্বংসলীলার তাণ্ডব চালায়। বাংলার প্রতি ইঞ্চি ভূমিতে রক্তের ফোঁটা ছিটকে পড়ে। নিহত হয় ত্রিশ লক্ষ, আহত হয় দ্বিগুণ। ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতহানি ঘটে। ১ কোটি লোক বাধ্য হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। যুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তে বড় বড় স্থাপনাগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আত্মসমর্পণের মাত্র ১৮ ঘণ্টা পূর্বে ১৪ ডিসেম্বর এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ধ্বংসলীলার নজির নেই।

বাঙালি বীরের জাতি। এ জাতি কখনো মাথা নত করতে জানে না। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে না। বাংলাদেশ জন্ম নেয়ার পূর্বে ১৬ ডিসেম্বর পড়ন্ত বিকালে একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম যুদ্ধে পরাজিত সেনাপতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্ত আকাশের নিচে রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

একচল্লিশ বছর পর এবারের মার্চ মাসটি ২টি কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশের দীর্ঘদিন বিরোধ মীমাংসা মামলার ১৪ মার্চের ঐতিহাসিক রায়। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি পেয়েছিল ১,৪৪,০০০ বর্গকিলোমিটারের সার্বভৌম বাংলাদেশ। আর বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতি পেল ১,১১,০০০ বর্গকিলোমিটারের আরো এক নতুন ভাসমান বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় কারণটি মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত। মুক্তিযোদ্ধারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে অনেক মুক্তিযোদ্ধা সশরীরে উপস্থিত থেকে যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন। পঙ্গু যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা ধৈর্য ধরে উপভোগ করেন স্মৃতিচারণ। সেক্টর কমান্ডাররা সভা-সমাবেশ, র‍্যালি, টকশো আয়োজন

www.pathagar.com

করে যুদ্ধবিরোধীদের বিচারের দাবিতে জনমত গড়ে তুলেছেন। ব্যাপক ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে মাত্র ৪১ বছরে মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরিরা যা অর্জন করেছে তার নজির বিরল। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের কুলিন স্থায়ী সদস্য দেশ আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড থেকে মাত্র ৪টি বিষয়ে পিছিয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশ।

* চাঁদের বুকে লাল সবুজের পতাকা উত্তোলন
* জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ মহাসচিবের পদ অলঙ্করণ।
* পারমাণবিক বোমার অধিকার অর্জন
* ফুটবলে বিশ্বকাপ জয় ছাড়া বাকি সবগুলো মাইলফলক অতিক্রম করেছে শিশুরাষ্ট্র বাংলাদেশ।

খ্যাতনামা ম্যাগাজিন নিউজ উইকে সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বের সেরা ৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশের কোনো বিদ্যাপীঠের নাম নেই। এই রিপোর্টটি বাংলাদেশের সকল অর্জনকে ধূলিসাৎ করে কালিমা লেপে দিয়েছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর সপ্তম জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার অনুপাতে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় তালিকায় কমপক্ষে ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। জ্ঞান বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি আধুনিক প্রযুক্তি সর্বক্ষেত্রে বিশ্বের উন্নত প্রগতিশীল জাতিসমূহের সাথে প্রতিযোগিতা করে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে নিজস্ব স্থান করে নেয়ার সকল উপকরণ রয়েছে বাংলাদেশে।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে কোনো দেশ, জাতি, জনগোষ্ঠীর ক্রান্তিকালে একদল বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিককর্মী, সমাজসেবক ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করে থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমরবিদরা পরিকল্পনা করেছিলেন মানবজাতির সর্বশেষ ভ্রূণটি ধ্বংস করে দিবেন। সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে একদল প্রশিক্ষিত ডিপ্লোমা ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কর্মী ও নার্স আহত নিহতদের উদ্ধার, শুশ্রূষা, চিকিৎসা ও মৃতদেহ সৎকার্য করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্ব যখন অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন, তখন ৪৯ জন রোটারিয়ান জাতিসংঘের সনদ রচনা করে স্বল্প সময়ের মধ্যে শান্তির পায়রা উড়িয়ে যুদ্ধের ইতি টেনে আনেন।

আমাদের এ ভূখণ্ডে যে কোনো ক্রান্তিকালে বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিককর্মীরা ত্রাণকর্তার ভূমিকায় জাতিকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি পটভূমিকা রচনায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান, গাফ্ফার চৌধুরীর কলম-কাগজের মিলনে প্রমাণ করেছেন অসি থেকে মসী বড়। মহান

www.pathagar.com

স্বাধীনতাযুদ্ধে জহির রায়হান, আপেল মাহমুদ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, জর্জ হ্যারিসন, দাদা সিরাজুল আলম খান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকায় যুদ্ধে জয়লাভ ত্বরান্বিত হয়। শিল্পী আবদুল জব্বারের *"মাগো তোমার শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে, তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি, তোমার ভয় নেই মা, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি"* গানটি লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে তরুণদের চিরদিন অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আন্তর্জাতিক ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সাবেক ডিন ড. মনিরুজ্জামান, সাগরিকা রোটারি ক্লাবের সাবেক সভাপতি খন রঞ্জন রায়, সাংবাদিক মাহমুদ মনি, লেখক মো. আবুল হাসান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামানকে নিউজ উইকের রিপোর্ট ভাবিয়ে তোলে। যে জাতি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে সেই দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের ৫০০টির মধ্যে থাকবে না তা মেনে নেয়া কঠিন।

দেশ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান, আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা করে তারা দাবি করেন দেশে একটি আন্তর্জাতিকমানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। স্বপ্নের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রূপরেখা তারা প্রণয়ন করেন—

কৃষি, প্রকৌশল, ভাষা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক, পালি, ধর্ম, মেরিন, সামরিক, যোগাযোগ, অনুবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনুষদ অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রতিবছর স্বদেশী ৫ হাজার বিদেশি ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বাংলাদেশের ১ হাজার বিদেশি ৩ হাজার নিয়োগ দেয়া হবে। ৫-৭ লক্ষ বইয়ের সমৃদ্ধ পৃথিবীর বৃহত্তম একটি আধুনিক লাইব্রেরি প্রতিস্থাপন করা হবে। ৪০ হাজার আসনবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় একটি অডিটোরিয়াম ও ক্যান্টিন প্রতিষ্ঠা হবে। পৃথক পৃথক কাউন্টার থেকে বিভিন্ন ধর্ম ও মহাদেশের লোকেরা নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ ও জীবনযাপন করবেন।

প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন, ডেন্টাল, নার্সিং, মেডিকেল টেকনোলজি, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি ও আয়ুর্বেদীয় অনুষদের অধীনে ৭ হাজার শয্যাবিশিষ্ট বিশ্বের বৃহত্তম একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা দাবি করা হয়েছে। দেশি ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্টসহ বিশ্বের নামি দামি স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ লাভ করবেন। এই হাসপাতালে এলডিসিভুক্ত সদস্যদেশের অতিদরিদ্রদের

www.pathagar.com

বিনামূল্যে জটিল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। সাথে চলবে গবেষণাকাণ্ড। অর্জিত হবে নোবেলের মতো মর্যাদার স্বীকৃতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো মেধাবীদের মেধা আরো বিকশিত করে জনকল্যাণে নিবেদিত করা। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সাদা-কালো, পীত, ধনী-গরিব, মেধাবী-প্রতিবন্ধী ও কম মেধাবীদের সমন্বয় করা। এজন্য উপজেলাকেন্দ্রিক আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। হাজার বছরের নয়, আড়াই হাজার বছরেরও প্রাচীন আমাদের সংস্কৃতি। নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরে মিলেছে এমন সব নিদর্শন, যার ভিত্তিতে লিখতে হচ্ছে বাংলাদেশের নতুন ইতিহাস। নেদারল্যান্ডসের বিখ্যাত ল্যাবরেটরিতে কার্বন-১৪ পরীক্ষা করে এখানকার দুর্গ-নগর বসতিকে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

নরসিংদী জেলা বাংলাদেশের মধ্যখানে অবস্থিত। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট রেল, স্থলপথ নির্মাণ করা হয়েছে নরসিংদীর উঁচু-নিচু পাহাড় কেটে। ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দর মাত্র ৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। গ্রিন হাউজ মুক্ত এলাকা বলে খ্যাত। মেঘনা-শীতলক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের সুকোমল জলধারার ঐতিহ্যবাহী নরসিংদী। বাংলাদেশ এখন অনেক কিছুর জন্যই উদাহরণ। আবিষ্কৃত নতুন ইতিহাসের স্থান উয়ারী বটেশ্বরে স্বপ্নের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে পারে বাংলাদেশের জন্য নতুন বিশ্ব আকর্ষণ।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

www.pathagar.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও আমাদের প্রস্তাবনা

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রায় সবকটি কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। ডিগ্রি পরীক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের অধিকর্তা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। ১৯৫৩ সালে রাজশাহী এবং ১৯৫৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এ তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর যার যার আশপাশের কলেজগুলো পরিচালনার দায়িত্বভার বর্তায়।

দেশে উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা বাড়ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চশিক্ষা পাঠ্যক্রম সরকারি-বেসরকারি কলেজ পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে, কতিপয় সমস্যা এবং সমন্বিত উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মহতি লক্ষ্যে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর জাতীয় সংসদে গৃহীত আইন অনুযায়ী ১২ একর জমির ওপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ক্যাম্পাস গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (National University)।

দেশের সকল অঞ্চলের সব স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজের যাবতীয় বিষয় ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একই কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বিগত দিনে শত ব্যর্থতার মাঝে কিছু সাফল্যও রয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছে। এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের উচ্চশিক্ষার প্রায় ৮০ শতাংশ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। সারা দেশের কলেজশিক্ষার (স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও প্রফেশনাল ডিগ্রি পর্যায়) মান উন্নয়ন; কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রবর্তন, মূল্যায়ন ও পরিমার্জন; কলেজ শিক্ষকদের চাকরিকালীন বুনিয়াদি ও গবেষণামূলক প্রশিক্ষণ, এমফিল ও পিএইচ-ডি ডিগ্রি প্রদান এর মূল কর্মপরিসর। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ এই বিশ্ববিদ্যালয়টির অন্যতম দায়িত্ব।

www.pathagar.com

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও আসন স্বল্পতা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্রাতিরিক্ত টিউশন ফি এবং প্রত্যাশিত পরিবেশ ও গুণগত মানের নিশ্চয়তা, বেশিরভাগ মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতা প্রভৃতি নানা কারণে বিগত বছরে সাধারণ ও অল্প আয়ের এবং মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রধান নির্ভরতার স্থান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমানে সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ লাখ ৩ হাজার ৬৫৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৪ লাখ। এর নিয়ন্ত্রণাধীন কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ৬২৪। বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত সব কলেজে অনার্স ও ডিগ্রি (পাস) ১ম বর্ষে এখন থেকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস শীর্ষক ১০০ নম্বরের একটি কোর্স বিষয় হিসেবে পড়তে হয়। গত ২৬ অক্টোবর ২০১৩ বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেটি ঐতিহাসিক।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রমাণ করে রেখেছে এ দেশে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার জন্য ডিজিটাল বা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে রেজিস্ট্রেশন করে অ্যাডমিট কার্ড দেয়া সম্ভব, একই দিনে সারা দেশের পরীক্ষা নেয়া সম্ভব এবং মূল্যায়নের জন্য উত্তরপত্র একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিরাপদে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করতে এবং ভালো রেজাল্ট করতে অনেক বেশি অধ্যয়ন করতে হয় শিক্ষার্থীদের। এক কলেজে শিক্ষার্থীদের অন্য কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দেয়ার মতো সুন্দর পদ্ধতি চালু করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এক কলেজের শিক্ষার্থীদের খাতা মূল্যায়ন করা হয় অন্য কলেজের শিক্ষকদের দিয়ে। এতসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে। তথাপি শিক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়নে অনেক বেশি স্বচ্ছতা অনুসরণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীরা যাতে ভোগান্তিতে না পড়েন সে কারণে মাসের ৩০ দিনই কর্মব্যস্ত থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শাখা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১০ হাজারের বেশি পরীক্ষক রয়েছেন। সংখ্যাগত হিসেবে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। দেশে স্নাতক/স্নাতকোত্তর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ছে জ্যাতিমিক হারে। শিক্ষার্থীদের সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ও কলেজের সংখ্যা দিয়ে পঞ্চম অবস্থানের এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের গর্ব।

মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক, যুগোপযোগী কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, পাঠদান ও মূল্যায়ন

www.pathagar.com

পদ্ধতিকে যুগোপযোগীকরণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সন্তোষজনক আনুপাতিক হার নিশ্চিতকরণ, চাহিদাভিত্তিক পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় কতটুকু সাফল্য দেখাচ্ছে তা মূল্যায়নের বিষয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরিত করতে ওয়েবসাইট, পুনর্গঠন, ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার তৈরি, কানেক্টিভিটি বৃদ্ধি, ই-টেন্ডারিং প্রবর্তন, ই-লাইব্রেরি, শিক্ষকদের ডাটাবেজ প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠানে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাবান্ধব পরিবেশ রাখতে হবে, যেন প্রত্যেক শিক্ষক বা গবেষক স্বাধীন ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষা ও গবেষণাসহ অন্যান্য কাজ নির্বিঘ্নে করতে পারেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সেমিনার, আলোচনাসভা, মতবিনিময় প্রভৃতি কার্যক্রম প্রবর্তন করতে পারলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জ্ঞানক্ষেত্রের পরিসর ও সৃজনক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। গ্রন্থাগার উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি সুবিধা বৃদ্ধি করে প্রতিটি জেলাকে ইন্টারনেট যোগাযোগের আওতায় আনতে পারলে সারা দেশের কলেজ শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবে। যদিও সম্প্রতি প্রকাশিত মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফলে ৯৩.৮১ শতাংশ পাশের রেকর্ড গড়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। দেশব্যাপী ১০১টি কলেজ থেকে ১ লাখ ৯ হাজার ৮৬৬ জন পরীক্ষার্থী থেকে মাস্টার্স উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৩ হাজার ৪৬৯ জন।

শত ব্যর্থতার মাঝে এসব সফলতা আমাদের চোখে পড়ে না। ফলে দেশের সুশীল সমাজও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনা নিয়ে খুব বেশি ভাবে না। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ, সরকারের সবচেয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েই আমাদের সবচেয়ে বেশি ভাবতে হবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষার্থী পড়ে তার বেশিরভাগই গ্রামের নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। যারা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে শুধু নিজেকে নয় পুরো পরিবারকে, সমাজকে তথা দেশকে বদলে নিতে পারে। প্রবাদ আছে—'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং'। জাতীয় উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে—যাতে শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা চাকরি পেতে পারে, দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষা হবে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, দেশপ্রেম-মানবপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত। উচ্চশিক্ষা বিলাসিতা নয়, অত্যাবশ্যক, উচ্চশিক্ষায় পাড়ি দিতে হবে অনেক দুর্গম পথ।

প্রতি বছর জাতীয় জনসংখ্যা আদমশুমারিতে ২৬ লক্ষ নতুন মুখ যোগ হচ্ছে। সেই সাথে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি

www.pathagar.com

পাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে কৃষি, বনজ, জলজ সম্পদ নষ্ট না করে বর্তমান কলেজগুলোতে মর্নিং ডে ইভিনিং নাইট শিফট চালু করতে হবে। কলেজে ৩ দিনের মধ্যে রেজাল্ট প্রকাশিত, সেশনজট চিরতার নির্মূল করতে হবে। কলেজগুলোতে বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ ও ছাত্রভর্তির পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পিত ব্যবস্থায় এত বেশি ছাত্র নিয়ন্ত্রণ একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বিকেন্দ্রীকরণ করে জাতীয়ভাবে বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেগুলি হবে উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী ঢাকা বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও রংপুর বিভাগীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিভাগীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। সমাবর্তন প্রক্রিয়া হবে একসাথে। শিক্ষার্থীর হতাশা মোচনে বিভাগীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সৃজনশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

দৈনিক সংগ্রাম : ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা শিক্ষার স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্যপ্রযুক্তির এ বিশ্বে সংবাদ শিল্পের তাৎপর্য দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক কিংবা স্থানীয় যে কোনো পরিমণ্ডলে তথ্য আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠেছে। সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশের গৌরব ৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইতালির ভেনিস বন্দরে। চীন দেশে প্রথম কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভারতবর্ষে মোগল শাসনে সরকারি অধিদপ্তরে হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল। ইউরোপে প্রথম সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল নব-জাগরণের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ইতালিতে। ইতালি থেকেই সংবাদপত্র অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন প্রান্তে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজিতে সংবাদপত্র। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি জেমস অগাস্টাস হিকি (James Augustus Hicky)-এর মাধ্যমে 'বেঙ্গল গেজেট'ই হলো প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র। পরে ইনডিয়া গেজেট, হরকরা, ক্যালকাটা গেজেট ইত্যাদি। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র *দিকদর্শন*-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটির সম্পাদকের নাম মাশম্যান। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ২৩ তারিখের ভোরের আলোয় চোখ মেলল সংবাদপত্র *সমাচার দর্পণ*। বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পত্রিকা আজো তুলনাহীনভাবে মর্যাদার আসনে অলঙ্কৃত। কথিত আছে *সমাচার দর্পণ* বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। রামমোহন রায় প্রকাশ করেন *সম্বাদ কৌমদী*। *সম্বাদ কৌমুদীর* প্রতিবাদ উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সমাচার চন্দ্রিকা*। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে সাপ্তাহিক, তিনদিন এবং পরে *সংবাদ প্রভাকর* নামে একটি পত্রিকা দৈনিকের মর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। মুসলমান সম্পাদিত প্রথম বাংলা পত্রিকা *সমাচার সভারাজেন্দ্র* শেখ আলীমুল্লাহর সম্পাদনায় কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের জুন মাসে চট্টগ্রাম থেকে *দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান* নামে একটি পত্রিকা বের হয়। প্রায় একই সময়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *জিন্দেগী*। পাকিস্তান হওয়ার পরও বহুদিন পাকিস্তানবাদী পত্রিকা *আজাদ*, *ইত্তেহাদ*, *মিল্লাত* ও *মর্নিং নিউজ*-এর ঠিকানা ছিল কলকাতা। ১৯৪৯ সালে মুসলিম লীগ নেতা হামিদুল চৌধুরী প্রথম এ দেশে পেশাদারি সংবাদপত্র বের করার উদ্যোগ নেন ইংরেজি ভাষায়। ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*। ১৯৫৩ সালে *ইত্তেফাক* দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়। তখন এর মালিক-সম্পাদক ছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। ১৯৫১ সালের ১৭ মে *দৈনিক সংবাদ* প্রকাশিত হয় খায়রুল কবিরের সম্পাদনায়। শুরুতে পত্রিকাটি মুসলিম লীগের ছিল। ষাটের দশকে আরো কিছু পত্রিকা যুক্ত হয়। *দৈনিক আজাদী*, *পয়গাম*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *দৈনিক পূর্বদেশ* (প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক) *সাপ্তাহিক হলিডে*, *সান্ধ্য দৈনিক আওয়াজ*, *দি পিপলস*, *দৈনিক পয়গাম* ও *দৈনিক পাকিস্তান* ছাড়া সব পত্রিকা প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। সত্তরের প্রথম দিকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *বাংলার বাণী* ও *একতা*।

বর্তমানে সংবাদপত্রের বিচরণ রয়েছে দেশ-বিদেশের রাজনীতিতে, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনধারার নানা ঘটনা প্রবাহে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-বাণিজ্য, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলায়, মানবজীবনের সকল কর্মধারায় আনন্দ-বিনোদন, কৌতুক, জাদু, রাশিফলসহ হরেক রকমের পাত্র-পাত্রী, জায়গাজমি ক্রয়-বিক্রয়, বাসা ভাড়া, কর্মখালি থেকে শুরু করে আইন-আদালত, আন্তর্জাতিক খবরা-খবর বুকে ধারণ করে সংবাদপত্রই মধ্যরাতে ছুটে চলে সর্বসাধারণের দ্বারে দ্বারে। নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ বলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছাড়া সমাজে ভালো কিছু আশা করা যায় না। সমাজের সবক্ষেত্রে অর্থবহ পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রের ভূমিকা পালন এখন অনিবার্য।

সংবাদপত্রের শক্তিকে ব্যক্তিগত-রাজনৈতিক এবং কায়েমি স্বার্থে ব্যবহারের যে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হচ্ছে তাতে এ শিল্পের অগ্রযাত্রা শঙ্কামুক্ত ভাবার উপায় নেই। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই প্রত্যাশিত। কিন্তু দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভূমিকা এই শিল্পের জন্য লজ্জাকর এবং অপমানজনক। আজ সংবাদকর্মীরা স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ নিয়ে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে

www.pathagar.com

নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। তারপরও সাংবাদিকদেরকে এই ব্রত নিয়ে কাজ করতে হবে যে, সত্যের জন্য তাদের সবকিছু ত্যাগ করা সম্ভব। শুধু বাংলাদেশের সাংবাদিকরা নয়, সারা বিশ্ব আজ চরম অস্থির। সাংবাদিকরা কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা না করলে পৃথিবীর অবস্থা আরো খারাপ হতো। এক্ষেত্রে তরুণ ও উদীয়মান সাংবাদিকদের মেধা, বিদ্যা-বুদ্ধি সততা এবং যোগ্যতার মাধ্যমে দেশসেবায় দক্ষতার পরিচয় রাখতে হবে।

প্রযুক্তির কল্যাণে পত্রিকা প্রকাশ সহজ হয়েছে সত্য। তবে সংবাদপত্রের পাশাপাশি প্রচুর টিভি চ্যানেলের প্রতি ঘণ্টার সংবাদে তাৎক্ষণিক ঘটে যাওয়া বিশ্বের যে কোনো সংবাদ টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে কিংবা ইন্টারনেটে মানুষ তৎক্ষণাৎ জেনে যাচ্ছে। সংবাদপত্রের সংবাদের জন্য আর অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। তারপরও দৈনিক সংবাদপত্রের অগ্রযাত্রা কিংবা পাঠক হ্রাস পায়নি। মানুষ কেবল সংবাদ জেনেই তৃপ্ত হতে পারে না। সংবাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সব ঘটনা বিস্তারিত জানতে সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চয় স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্পর্শকাতর সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের অধিক দায়িত্বশীল হতে হয়। অথচ উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্পর্শকাতর সংবাদ প্রকাশ করে দেশকে অস্থিতিশীল ও সাম্প্রদায়িক উস্কানীতে যেন না পড়ে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

সংবাদপত্র শিল্প তার স্বকীয়তায় আরো বাড়-বাড়ন্ত হোক এই চিন্তা করতে হবে। ব্যক্তি শ্রেণি এবং দলবাজির উর্ধ্বে সমষ্টিগত মানুষের প্রত্যাশা পূরণে অবদান রাখতে হবে। মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্ররূপে সংবাদপত্র সব পাঠকের আস্থা-বিশ্বাস ও ভরসার স্থলে পরিণত হতে হবে। এ শিল্পের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখতে হবে। সংবাদপত্রের যথাযথ বিকাশ ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি ঘটাতে প্রয়োজন শিক্ষা গবেষণা ও প্রযুক্তি সন্নিবেশন। সংবাদিকতা শিক্ষার স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে পারে এর সহজ সরল বুদ্ধিদীপ্ত সমাধান।

দৈনিক সংবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

www.pathagar.com

ক্রমবিকাশের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের গণমাধ্যম

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মৌলিক আদর্শগুলো চিহ্নিত করে ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে আফ্রিকার নামিবিয়ার উইন্ডহোয়েক শহরে ইউনেস্কো ও ইউএনডিপিআইয়ের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ডিক্লারেশন অব উইন্ডহোয়েক ঘোষণা হয়। ১৯৯৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩ মে-কে বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়।

প্রেস স্বাধীনতা কীভাবে লঙ্ঘিত বা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং কোন কোন সাংবাদিক স্বীয় কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বা কারাবরণ করেছেন, সেসব তথ্য জনগণকে জানানো এ দিবস পালনের লক্ষ্য। সাধারণ জনগণকে এ সম্বন্ধে সতর্কীকরণ এবং তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রেস-স্বাধীনতার প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয় ও পেশাগত নৈতিকতার কথা মিডিয়া পেশাজীবীদের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করা, পেশাগত কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের স্মরণ করা এবং প্রেস স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ বা বিলুপ্ত করার প্রয়াসে যাঁরা শিকার হয়েছেন, তাঁদের সহায়তাদান হচ্ছে ওই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য।

Newspaper is the hearld of the civilization 'সংবাদপত্র হলো সভ্যতার অগ্রদূত'। একদিনে গড়ে ওঠেনি আমাদের এই সম্ভ্রান্ত আধুনিক সভ্যতা। এই সভ্যতার পেছনে বহু মানুষের বহু দিনের শ্রম যেমন অবদান রেখেছে, সংবাদপত্র তথ্যের পরে তথ্য প্রদান করে তেমনি তিলে তিলে দাঁড় করিয়েছে এই সভ্যতার রূপরেখা। সংবাদপত্রই প্রথম তৈরি করেছে সভ্যতা উন্নয়নের উত্তাল ঢেউ। এই ঢেউকে আবার ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে; যার ফলে পৃথিবীর নানান প্রান্তে লেগেছে আমাদের এই সভ্যতার ছোঁয়া। ইদানীং অবাধ তথ্য প্রবাহের এই যুগে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার যে জয়জয়কার তার সূতিকাগারও এই সংবাদপত্র।

www.pathagar.com

সংবাদ ও সাংবাদিকতা দুটো যুগ্ম এবং প্রায় সমার্থক শব্দ। একটা অন্যটার পরিপূরক। সংবাদ ছাড়া যেমন সাংবাদিকতার কথা ভাবা যায় না, তেমনি সাংবাদিকতা ছাড়া সংবাদও হয় না। ফলে দুটো শব্দই পরস্পর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে কিংবা পৃথিবীর তাবৎ দেশে সাংবাদিকতা আজ একটি মহান পেশা হিসেবে গণ্য হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা সাংবাদিকরা কলমের স্বাধীনতা ভোগ করবে। মত প্রকাশে থাকবে অবারিত—এই ধারণা থেকে সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। সাংবাদিকদের এ স্বাধীনতার কথা আসে মূলত সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আমল থেকে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলনের তাদের আপসহীন ভূমিকার কারণে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, আইয়ুব খানের মার্শাল ল' বিরোধী আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাংবাদিকদের ভূমিকা ও দিক-নির্দেশনা এ দেশের মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। বিশ্বের স্বনামধন্য সাংবাদিকরা '৭১ সালে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের বস্তুনিষ্ঠ, সত্যাশ্রয়ী ও মর্মান্তিক সংবাদগুলো গণমাধ্যমে প্রচার করে বিশ্ববাসীর জনমত তৈরি করার ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান বাংলাদেশে সংবাদপত্রের মূল বিষয় থাকে রাজনৈতিক খবরাখবর। অর্থনীতি, ক্রীড়া, বিনোদন এসব ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সংবাদপত্র যে নেই তা নয়। তবে এর সংখ্যা খুব সীমিত এবং পাঠকপ্রিয়তাও কম। এরপরও সংবাদপত্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ডিএফপি'র নিরীক্ষা বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে এখন ৪৭১টি সংবাদপত্র আছে। এর মধ্যে ৩২০টিই দৈনিক পত্রিকা। এসব সংবাদপত্র ঢাকা, চট্টগ্রাম ছাড়াও দেশের প্রায় সবগুলো জেলা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিষ্ঠা হয়। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে আমাদের মিডিয়া জগতের একটা বড় অর্জন বেসরকারি খাতে কেবল টেলিভিশন বা 'স্যাটেলাইট টিভি'। সরকারের গঠনমূলক ও সুদূরপ্রসারী চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত দেশে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, এটা তার প্রমাণ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গ্রামীণ সাংবাদিকতাকে আরো বিকশিত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। নিত্য নতুন মেধা যুক্ত হচ্ছে। এর সাথে জড়িত হচ্ছে সৃষ্টিশীল মানুষ। যাদের কর্মপ্রতিভাকে যথাযথ মূল্যায়ন করা গেলে তা হতে পারে আমাদের সম্পদ। পরবর্তী প্রজন্মের পথ প্রদর্শক। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বলছে, দেশের ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ মানুষ সংবাদপত্র পড়ে। পাঠকের মধ্যে গ্রাম এলাকায় ১২ দশমিক ৭৪ ও শহরে ২৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। এ দেশটি বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সংবাদপত্র শিল্পকে শিক্ষায় সম্পৃক্ত করে একাত্তরের মতো বিপ্লব ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশ একটি নিম্নপ্রযুক্তির দেশ। ধীরে ধীরে মাধ্যম প্রযুক্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই নিম্ন-মধ্যম প্রযুক্তির কর্মকাণ্ডনীতি গ্রহণ করা হয়। সংবাদপত্র শিল্পেও এই নীতি গ্রহণ করা হয়। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সকল নিয়মনীতি ত্যাগ করে ১৯৬২ সালে কলা অনুষদের অধীনে ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম কোর্স চালু করে। স্বাধীনতার পর ডিপ্লোমা কোর্স বন্ধ করে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। আশির দশকে সকল পাবলিক ও নব্বই দশকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়।

এই দীর্ঘ সময়ে সাংবাদিকতায় বিপুল সংখ্যক ডিগ্রিধারী নিজস্ব পেশায় কর্মে যোগদান করলে বাংলাদেশের শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিক অর্থনৈতিক রাজনীতির ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। সাংবাদিকতা পেশা ঝুঁকিপূর্ণ। জার্নালিজমে ডিগ্রি অর্জন করে অনেকেই একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন না। সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যয়ন করে প্রতিষ্ঠা পান বিচারপতি হিসেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এ বিভাগের ছাত্র ছিলেন এবং পরে শিক্ষক হিসেবে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সদ্য প্রয়াত দেশবরেণ্য সাংবাদিক এবিএম মূসা অক্সফোর্ডের কুইন এলিজাবেথ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম থেকে ১৯৬১ সালে ডিপ্লোমা অর্জন করে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। তিনি সত্য ও বস্তুনিরপেক্ষ এবং বাস্তব ও কার্যকর গঠনমূলক লেখনীর মাধ্যমে দেশের বটবৃক্ষ সাংবাদিক হয়েছিলেন।

বর্তমান অবস্থায় সাংবাদিকতা কাজটা কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কণ্টকাকীর্ণ। এ পথটা বড়ই পিচ্ছিল ও দুর্গম। এ সময় কলমসৈনিক থাকবে সদাজাগ্রত, অতন্দ্র প্রহরীর মতো। অত্যন্ত সজাগ ধীর অথচ তীক্ষ্ণ-বিচক্ষণ এবং সার্বক্ষণিক চৌকস অবস্থায়। এজন্য দরকার সৃজনশীল সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা শিক্ষা।

www.pathagar.com

ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা। তাদের শিক্ষার মূল লক্ষ দ্রুততম সময়ে কাজে যোগদান করে পরিবারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনা। পৃথিবীর কোনো দেশে ডিপ্লোমাধারীদের পেশা পরিবর্তনের কোনো নজির নেই। প্রতিটি জেলায় সরকারি/ বেসরকারিভাবে একাধিক ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সেখান থেকে স্বল্পব্যয়ে ঘরে বসে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা শিক্ষা অর্জন করবে যুবসমাজ। পেশা পরিবর্তনের মানসিকতা উত্তীর্ণ হবে। তাদের মেধা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতায় সংবাদমাধ্যম দ্রুত বিকাশ লাভ করবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণভিত্তিক চিন্তা ও কাজের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে আগামী প্রজন্মের সংবাদ শিল্প। সংবাদ শিল্পের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার ভাবনায় শক্তিশালী হবে স্বাধীন সাংবাদিকতা।

দৈনিক নয়াদিগন্ত : ৩ মে ২০১৪

www.pathagar.com

শিক্ষক হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ। লক্ষ্য মানবমুক্তি ও উন্নয়ন। সভ্যতা ও উন্নয়নের চাবিকাঠি শিক্ষা। বৈষয়িক উন্নতি ও মানসিক প্রশান্তির জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর শক্তি অপরিমেয় ও অসীম। শিক্ষার কাছে সব শক্তিই অসহায়। তাই বলা হয়ে থাকে 'অসির চেয়ে মসির শক্তি বেশি'। দক্ষিণ আফ্রিকার স্থপতি নেলসন মেন্ডেলা তার আত্মজীবনী 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' গ্রন্থে বলেছেন, শিক্ষা ব্যক্তিগত উন্নয়নের বৃহৎ চালিকাশক্তি। শিক্ষা উৎপাদনশীলতা ও সৃজনশীলতার হৃৎপিণ্ড। শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে উঠেছে প্যারাডাইস লস্টের বিখ্যাত কবি মিল্টনের বক্তব্যে। তিনি বলেন—Education is the harmonious development of body, mind and soul. শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়, তাহলে শিক্ষক সেই মেরুদণ্ড গড়ার কারিগর। মানুষের মধ্য থেকে সুকুমারবৃত্তিগুলোকে তপ্ত করে এনে মানুষকে সভ্য এবং সুন্দর করে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব শিক্ষকের। উন্নত বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মূল্যয়ন করা হয় প্রাথমিক শিক্ষাকে। মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করা। এ বিশাল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে অতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা হয় সেভাবে। আর বাংলাদেশে তার সম্পূর্ণ উল্টো। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থায় বেশ কিছু অন্তরা বিদ্যমান, যাতে উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথমে উল্লেখ করা যায়, শিক্ষকদের যোগ্যতার মানদণ্ড ও বেতন ভাতা প্রশ্নসাপেক্ষ।

www.pathagar.com

যোগ্য নাগরিক-কর্মী তৈরির সূতিকাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষকরা এ কারখানার কারিগর। তাই যোগ্য মন্ত্রী, আমলা, নেতা, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, বিচারক, আইনবিদ, সাংবাদিক, লেখক, শ্রমিক-কর্মচারী সবই তৈরির পূর্বশত সুযোগ্য শিক্ষক। শুধু বেসরকারি নয় সব শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও হুজুরেরই যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিশু-কিশোর মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা প্রদানের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি জানা থাকা দরকার। বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ এবং প্রতিনিয়ত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ঐকান্তিক ইচ্ছার অধিকারী হওয়া দরকার একজন শিক্ষককে।

প্রস্তাবিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা-২০১২ ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে। সেটি এখন পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপন করার প্রস্তুতি শেষ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী জুলাই মাসে এই বিধিমালা সংশোধনের কাজ শেষ করা হতে পারে। প্রস্তাবিত বিধিমালায় সহকারী শিক্ষক নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তে বলা হয়েছে, নারী ও পুরুষ শিক্ষকদের জন্য আলাদা যোগ্যতার বিষয়টি বিলুপ্ত হবে। সেখানে ডিগ্রি বা সমমানের হবে।

প্রস্তাবিত বিধিমালায় শিক্ষক নিয়োগে ৫০ শতাংশ নারী কোটা, ২০ শতাংশ পোষ্য কোটা ও ৩০ শতাংশ পুরুষ কোটা রাখা হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ৫০ দশমিক ২ শতাংশ নারী। ও ৪৯ দশমিক ৮ শতাংশ পুরুষ। অর্থাৎ লিঙ্গ সমতা অর্জন হয়েছে। এজন্য নারী কোটা শতাংশ কমানো হয়েছে। তবে পোষ্যসহ অন্যান্য কোটা থেকেও নারীরা শিক্ষক হয়ে আসেন। নিজ উপজেলার মধ্য থেকেই সব শিক্ষক নিয়োগের ওপর জোর দেয়া হয়েছে প্রস্তাবিত বিধিমালায়। তবে বিকল্প উপায়েও শূন্যপদ পূরণের প্রস্তাব থাকছে।

আমাদের রয়েছে প্রায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার করুণ ইতিহাস। সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও রয়েছে এই দীর্ঘ সময়ের ঔপনিবেশিকতার কালকানুনের কালিমা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই উচিত ছিল পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে স্বাধীন দেশের উপযোগী একটা শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা। কিন্তু দুঃজনক হলেও সত্য, তা আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবর্তিত হয়নি। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় রয়ে গেছে স্বাধীন দেশের উপযোগী পাঠ্যক্রম ও দক্ষ শিক্ষকের অভাবসহ সীমাহীন

www.pathagar.com

অব্যবস্থা ও দুর্বলতা। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপানে রয়েছে যুগোপযোগী শিক্ষার পাঠ্যক্রম এবং মানবিক ও দেশপ্রেমসম্পন্ন গুণাবলি অর্জনের ট্রেনিং। ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন অ্যাডুকেশন কোর্সের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শিক্ষক নিয়োগ লাভের পূর্বশর্ত।

শিক্ষক শব্দটির সাথে 'প্রশিক্ষণ' কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'প্রশিক্ষণ' ব্যতীত শিক্ষকতা পেশার পরিপূর্ণতা আসে না। আমরা সকলেই জানি জ্ঞান অর্জন নতুন জ্ঞান আবিষ্কার এবং নতুন কলাকৌশল আয়ত্তকরণ ও তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ অতি দ্রুত পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এ পরিবর্তনের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে শিক্ষক। আমাদের প্রতিবেশী অনেক দেশ যারা মাত্র ২০/২৫ বছর পূর্বে আমাদের চেয়ে এগিয়ে ছিল না, বর্তমানে তাদের এবং আমাদের দূরত্ব হাজার কদমেরও বেশি। তার সর্বপ্রধান কারণ সুষম জাতীয় বিকাশে শিক্ষায় প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ এবং গুণগত বিকাশ সাধনে পারঙ্গমতা অর্জন।

৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন অ্যাডুকেশন ডিগ্রিধারী শিক্ষকরা একবিংশ শতাব্দীর চেলেঞ্জ উপযোগী বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে। সদ্য পাস এসএসসি, এ প্লাস (A+) তরুণদেরকে রিক্রুট করে ৪ বছর মেয়াদি শিক্ষক শিক্ষাকোর্স অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। মানসম্পন্ন শিক্ষক অপরিহার্য বিধায় অবশ্যই প্রশিক্ষণ করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োগের সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ নীতিমালা গ্রহণ করা জরুরি। এ নীতিমালায় প্রথমত, পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় করতে হবে। শিক্ষকতাকে লোভনীয় করতে হলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে হবে সর্বাগ্রে। ৪ বছর মেয়াদি শিক্ষা প্রশিক্ষণের কারণে শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা নার্সদের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। এভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীর শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে যোগ্য শিক্ষকের জোগান নিশ্চিত করার পথ সুগম হবে। শিক্ষা গড়ে ওঠবে বাস্তবিক অর্থে সজৃনশীলতা প্রকাশ ও বিকাশের অনুপম ক্ষেত্র।

দৈনিক জনকণ্ঠ : ২৪ আগস্ট ২০১৩

www.pathagar.com

ধর্মীয় ও সামাজিক আবেদনের অর্থনীতি

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর, ১৪২০ বঙ্গাব্দের, আশ্বিন এবং ১৪৩৪ হিজরির জিলহজ মাস তিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আবহমানকাল থেকেই বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে নানা ধর্মের মানুষ একসাথে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থেকে বসবাস করে আসছে। ইসলাম, সনাতন বা হিন্দু এবং বৌদ্ধ—এ তিনটি আমাদের দেশের প্রধান ধর্ম। এ দেশের মানুষকে ধর্মাচারে, উৎসব পালনের ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকেই বেশ উৎসাহী দেখা গেছে।

ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় ইবাদত-উৎসবগুলো আরবি মাসের হিসেবে হয়, হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হয় বাংলা মাসের হিসেবে আর বৌদ্ধদের কিছু উৎসব হয় চাঁদের ওপর ভিত্তি করে। আরবি মাস চন্দ্রমাস। এ কারণে বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব উদযাপিত হয়। সময়ের আবর্তনে এবার একটি চমৎকার বিষয় ঘটেছিল। বাংলাদেশের তিনটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব প্রায় একই সময়ে বা কাছাকাছি সময়ে পরপর সম্পন্ন হয়েছে। হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাৎসব। মাত্র একদিন পর মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের একটি পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়েছে। এর মাত্র দুদিন পর বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসব 'প্রবারণা পূর্ণিমা' পালিত হয়েছে। প্রধান তিনটি ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত-উৎসব এ দেশের মানুষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করেছে।

এই উৎসবের সাথে যোগ হয়েছিল রাজনৈতিক ও নির্বাচনী হাওয়া। দশম জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান একসাথে হওয়ায় অনুষ্ঠান তিনটিতে চতুর্থ মাত্রা যোগ হয়েছিল। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—এ কালজয়ী বার্তা আহ্বান করে দেশবাসীকে এক পতাকাতলে সমবেত হতে দেখা গেছে। উৎসব অনুষ্ঠান সময়ে দেশের অর্থনীতিতে এক বিশেষ আবেগ ও আবহ সৃষ্টি হয়েছিল। ঘূর্ণায়মান অর্থনীতির

www.pathagar.com

গতিপ্রবাহে যে কোনো ব্যয় অর্থনীতির জন্য আয়। দেশজ উৎপাদনে এর থাকে অনিবার্য অবদান। যে কোনো উৎসব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনে, মানুষ জেগে ওঠে নানা কর্মকাণ্ডে, সম্পদ বণ্টনব্যবস্থায় স্বতঃপ্রণোদিত একটা আবহ সৃষ্টি হয়। এ সময়ে সামষ্টিক ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও পারঙ্গমতা দেখাতে পারলে এবং মুদ্রা সরবরাহ, ব্যাংকের তারল্য তারতম্য, পরিবহন খাতের ব্যয়প্রবাহকে স্বাভাবিক গতিতে ধরে রাখতে পারলে অর্থনীতির জন্য তা পুষ্টিকর হয়।

এ খাতের শিক্ষাব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন করতে পারলে এই তিনটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভীত আরো মজবুত করা সম্ভব হতো।

বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের তার দেবীবন্দনায় সংস্কার কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারেনি। দুর্গার যে সংহার রূপ, ভয়াল মূর্তি মূলত অসুর নিধনে মত্ত থাকা এখন কিন্তু তাকে সে আকার বা অবয়বে দেখা যায়নি। যদিও তার দশ হাতে দশ ধরনের অস্ত্র, চোখে দ্যুতি আর জয়ের উল্লাস তারপরও তার বদনে প্রসন্নতা। বাঙালির দুর্গাপূজায় লাখ লাখ মূর্তি আছে যেখানে দেবীর মুখশ্রী শুধুই জননীর প্রতিচ্ছবি। সেখানে সংহার বা বিনাশের পরিবর্তে তার মুখে করুণা ও ভালোবাসা ফুটে ওঠে। রণরঙ্গিনী দুর্গার এমন বিচিত্র ও চমৎকার আদল ভারতের দক্ষিণ বা উত্তর অঞ্চলে বিরল। নেপালের দুর্গাও আমাদের মতো নয়। শাস্ত্রমতে দেবী হিমালয় দুহিতা, কৈলাশ কন্যা। অথচ তার বাপের বাড়িতে আগমন মেনে আমরা মেতে উঠি আনন্দ উল্লাসে, এই বরণ ও মেনে নেয়ার উদারতা এই আগ্রহ বাঙালি হিন্দুকে অসাম্প্রদায়িক ও সংস্কৃতিপ্রবণ করেছে। ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা প্রতিমা তৈরি প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স চালু করে ধর্মীয় সংস্কৃতির অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধন করছে।

পবারনা বা প্রবারণা শব্দটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রবারণ শব্দের অর্থ আশার কৃর্তি, অভিলাষ পূরণ, শিক্ষা সমাপ্তি অথবা ধ্যান শিক্ষা সমাপ্তি বুঝায়। বর্ষাব্রত পূর্ণ হবার দিনে আশ্বিনী পূর্ণিমা দিবসে প্রবারণা উদযাপিত হয়। প্রবারণকে বৌদ্ধদের আনন্দের দিন বলা যায়। কারণ ঐ দিনই ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রতের অবসান হয়। এটি বৌদ্ধদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব। শুধু বাংলাদেশের বৌদ্ধরা নন, বিশ্বের সব বৌদ্ধ এ শুভ তিথিটি যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপন করে থাকে। রং-বেরংয়ের ফানুস আর কল্পতরু তৈরির

www.pathagar.com

মহাধুমধাম হয়। বৌদ্ধরা বহির্মুখী শিক্ষার চেয়ে অন্তর্মুখী ভাবনাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়, চিত্তের উৎকর্ষই হলো অন্তর্মুখী শিক্ষা। এতে মানবিক গুণাবলি বা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। বিহারে প্রবেশ করে অনুধাবন করা যায় শিক্ষা ক্ষেত্রে এদেশ পিছিয়ে আছে। গৌতমবুদ্ধের মূর্তিগুলো থাইল্যান্ড কিংবা মিয়ানমার থেকে উচ্চমূল্য ক্রয় করা বা দানকৃত। মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স চালু করা সম্ভব হলে এ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ ধর্মালম্বীর নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা সম্ভব হতো। বৌদ্ধ প্রবারণা ধর্মীয় জীবনে যেমন অর্থবহ দিকনির্দেশনা করে, তেমনি সামাজিক ও জাতীয় অর্থনীতিতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান বহন করতে পারতো।

পশু কুরবানি উপলক্ষে জাতীয় অর্থনীতিতে এক ব্যাপক আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএ) হিসাব মতে এবার প্রায় ৮০ লাখ গরু ও খাসি কুরবানি হয়েছে। গরুপ্রতি গড় মূল্য ৩০ হাজার ধরলে গরু বাবদ লেনদেন হয়েছে ৯ হাজার কোটি এবং ৫১ লাখ খাসি (গড়ে ২৫০০ টাকা দরে) ২ হাজার ২৫ কোটি টাকা। পশু কুরবানিতে ১১ হাজার কোটি টাকার ওপর ব্যবসা হয়েছে। ৮১ লাখ কুরবানি পশুর মধ্যে প্রায় ৪৫ লাখ পশু এসেছে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে। এর একটা বড় অংশ অবশ্য চোরাই পথে বা পদ্ধতিতে আদান-প্রদান হয়েছে।

পশুর সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ অবশ্যই অনুমাননির্ভর। যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন, বাংলাদেশের প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়েছে এ খাতে। জাতীয় অর্থনৈতিতে প্রতি বছর বড় ক্ষতের সৃষ্টি করে। অর্থনীতি বিশ্লেষকদের হাভ-ভাব দেখে প্রতীয়মান হয় এ রোগের চিকিৎসার কোনো পদ্ধতি তাদের জানা নেই। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মনে করেন রোগ যত কঠিন হোক তার চিকিৎসা ব্যবস্থা সৃষ্টিকর্তা বাতলে রেখেছেন। শুধু অনুসন্ধান করে সঠিক মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করলে রোগ নিরাময় করা সম্ভব। ভেটেরিনারি প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে এসএসসি পাস তরুণদের এ খাতে শিক্ষা দেয়া উচিত। শিক্ষিত তরুণদের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে ২/৩ টি পশুখামার তৈরি করা গেলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে পশু/দুগ্ধ/ চামড়া/জৈবসারে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। এই খাতে ৩০/৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

ইসলাম ধর্মমতে, 'কুরবানির শিক্ষা হলো পশু কুরবানির মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ-লোভ-লালসা পরিত্যাগ করে আল্লাহর

www.pathagar.com

দরবারে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করা। হিন্দুধর্ম মতে 'স্বর্গ যখন অসুররা দখল করতে উদ্যত হয়েছিল, অসুরদের অত্যাচার-অনাচার যখন পৃথিবী ভরে উঠল, তখন দেবতারা বৈঠকে বসল, কী করা যায়। সব দেবতাশক্তির সম্মিলিত রূপ দেবীদুর্গা দশভুজা। দশহাতে যুদ্ধ করে তিনি পৃথিবীকে অসুরমুক্ত করলেন। এই অসুর হলো রিপু, মানুষের ষড়রিপু। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা, 'জগতের সকল প্রাণি সুখি হোক'। এ বছর একসাথে তিন ধর্মের বিশ্বাসী মানুষজন, অনুসারীগণ ইবাদত আরাধনা-প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদের সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করছেন একযোগে। তিনটি উৎসবেরই মূলবাণী 'পশুত্বের বিনাশ'। আজন্ম লালিত সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ। সম্প্রতি ঐতিহ্য আর বন্ধনে আমরা সবাই একসঙ্গে সম্মিলিতভাবে অংশ নেব দেশ ও জাতির যে কোনো উন্নয়নে। যে কোনো ব্যর্থতার গ্লানি, যে কোনো সাফল্যের আনন্দ সমানভাবে ভাগ করে নেব। ধর্মীয় আচারে শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির মিশ্রণে এগিয়ে চলব জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পথে।

দৈনিক জনকণ্ঠ : ১ ডিসেম্বর ২০১৩

www.pathagar.com

স্বপ্নের বিশ্বকাপ : দর্শনসুখ না সুফলভোগ

আন্তর্জাতিকভাবে ফুটবল এখন সভ্যতার অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত। মানবজাতির কল্যাণ, অগ্রযাত্রা, ঐক্য, সহমর্মিতা ও শান্তির পক্ষে জাতিসংঘ যা পারেনি তা পেরেছে ফুটবল তার কল্যাণময়ী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে। ফুটবল সব সময় তুলে ধরছে মানবজীবনের বৈচিত্র্যকে। ফুটবল বিশ্বকাপ শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, এটি বিশ্বের বিবেকবান মানুষের সবচেয়ে বড় মিলনমেলা। এই মিলনমেলায় দেখতে পাওয়া যায় মানুষের স্বপ্ন, শ্রম, সাধনা, বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্য।

১২ জুন বৃহস্পতিবার চোখ ধাঁধানো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ব্রাজিল-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ দিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিশ্বকাপের পর্দা উঠেছে। এটি ফিফার ২০তম আসর। ৬৫ হাজার দর্শক আর কোটি ভক্তর হৃদয় কাঁপানো উদ্বোধন হয়েছে ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরের নয়নাভিরাম স্টেডিয়ামে। উদ্বোধন করেছেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত একজন প্রতিবন্ধী। রোবটিক মেশিনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবেই এ কাজ করেছেন। উদ্বোধনী ম্যাচের রেফারি হিসেবে খেলা পরিচালনা করেছে এশিয়ার গর্ব জাপানের টোকিওতে জন্ম নেয়া ৪২ বছর বয়সী ইউচি নিশিমোরা।

ব্রাজিল বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ৩২ দেশ। ১২টি স্টেডিয়ামে ম্যাচ হবে মোট ৬৪টি। ১৩ জুলাই বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠবেন মাত্র একটি দেশের খেলোয়াড়রা। কিন্তু তার আগে পুরো এক মাস প্রাণপণ লড়াই করবে ৩২টি দল। গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হবে ১৬টি দলকে। বাকি ১৬টি দলকে নামতে হবে নকআউট পর্বের বাঁচা-মরার লড়াইয়ে। শুধু এইটুকু বললে ঠিক বোঝা যায় না যে, কেন বিশ্বকাপ জ্বরে কাঁপে গোটা বিশ্ব। গোটা আসরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ২০০টিরও বেশি দেশ। বিশ্বের প্রায় সব দেশই অংশ নেয় ফিফা বিশ্বকাপে। বিশ্বকাপের বাছাইপর্বকেও বিশ্বকাপ হিসেবে ধরা

www.pathagar.com

হয়। এদিক দিয়ে ফুটবল বিশ্বকাপের ব্যাপ্তি জাতিসংঘের চেয়েও বড়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের সংখ্যা ১৯৩। আর এবারের বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে ২০৩টি দেশ। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব। খেলা হয় ৮০০টিরও বেশি ম্যাচ। মূল পর্বে খেলাটা নিশ্চিত থাকে শুধু স্বাগতিক দলের। বাকি ৩১টি দেশকে তুমুল লড়াই করে পেরোতে হয় বাছাইপর্বের বাধা। এবার প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলছে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা। ২০০২ বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েই চমক জাগিয়েছিল সেনেগাল। কোয়ার্টার ফাইনাল খেলেছিল। ৩২ দলের বিশ্বকাপ শুরু হয় ১৯৯৮ সাল থেকে। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৪ বিশ্বকাপের চারটি আসরে অংশ নিয়েছিল ২৪টি দেশ। সে সময় খেলা হতো ৫৬টি ম্যাচ। বিশ্বকাপের পরিসর আরো ছোট ছিল ১৯৮২ সালের আগে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বকাপে অংশ নিত মাত্র ১৬টি দল। ১৯৩০ সালের প্রথম বিশ্বকাপে খেলেছিল ১৩টি দেশ।

এবার পুরো বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ৫৭৬ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ৭০ মিলিয়ন ডলার পাবে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের ক্লাবগুলো। খেলা শুরুর আগে প্রস্তুতির জন্য প্রতিটি দল পেয়েছে ১৫ লাখ ডলার করে। গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিলে প্রতিটি দল পাবে আট মিলিয়ন ডলার।

দ্বিতীয় রাউন্ডে নয় মিলিয়ন ডলার, কোয়ার্টার ফাইনালে ১৪ মিলিয়ন ডলার, চতুর্থ দল পাবে ২০ মিলিয়ন ডলার, তৃতীয় দল পাবে ২২ মিলিয়ন ডলার, রানার্সআপ ২৫ মিলিয়ন ডলার, চ্যাম্পিয়ন ৩৫ মিলিয়ন ডলার পাবে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো খেলা মানে এর সঙ্গে বড় ধরনের অর্থনীতির সংশ্লিষ্টতা থাকা। আর বিশ্বকাপ খেলা মানে এর অর্থনীতির সঙ্গে সারা বিশ্বের যোগসূত্রতা। শুধু আয়োজক দেশ নয় বরং যেসব দেশে এ ধরনের খেলা অনুষ্ঠিত হয়, খেলা চলাকালীন ফুলে-ফেঁপে ওঠে ওইসব দেশের অর্থনীতিও। চলতি বছরের জুনে ব্রাজিলে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপকে ঘিরে প্রায় চাঙ্গা হয়ে উঠছে দেশটির অর্থনীতি। ফুটবল বিশ্বকাপ ২০১৪ আয়োজনকে ঘিরে ব্রাজিলমুখী হচ্ছেন আন্তর্জাতিক পর্যটকরা। দেশটিতে ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছে। গতি বেড়েছে বিনিয়োগ ও অবকাঠামো নির্মাণ কর্মকাণ্ডসহ আরো অনেক ক্ষেত্রেই। খেলাকে কেন্দ্র করে ব্রাজিলকে সাজানো হয়েছে নতুন রূপে। তার এমনি একটি সুদিনের অপেক্ষায় ছিলেন ব্যবসায়ীরা। এতে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানও হয়েছে। এক মাসের আয়োজনের মধ্য দিয়ে পর্যটনশিল্প যেমন চাঙ্গা হচ্ছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে বাণিজ্যিক আস্থা। এর ইতিবাচক প্রভাব

www.pathagar.com

আসবে বিনিয়োগে। এ আয়োজনে দেশটির জিডিপিতে যোগ হতে পারে ০ দশমিক ২ শতাংশ পয়েন্ট। চলতি বছর ১ দশমিক ৭ শতাংশ হতে পারে ব্রাজিলের জিডিপি প্রবৃদ্ধি।

এর আগের ২০১০ সালে ফুটবল আয়োজনে দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতিতে যোগ হয়েছিল ০ দশমিক ৩ শতাংশ পয়েন্ট। এর সুফল ভোগ করছে বাংলাদেশও।

বাংলাদেশ থেকে এবার লাখ লাখ পিস সমর্থক জার্সি এবং টি-শার্ট তৈরি করে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়েছে বিশ্বকাপ উপলক্ষে। এতে আমাদের দেশের পোশাকশিল্পের শুধু বাড়তি ব্যবসা নিশ্চিত হয়নি, বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, দেশের পরিচিতি এবং এটি দেশের পোশাকশিল্পের গৌরব ও স্বীকৃতিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বকাপ ফুটবলের ৮৪ বছরের ইতিহাস বর্ণনায় আর বৈচিত্র্যে ভরপুর প্রতিটি আসর। একটি বিশ্বকাপের সঙ্গে আরেকটি বিশ্বকাপের কোনো মিল নেই। অঘটন, চমক আর অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিশ্বকাপ ফুটবলকে করেছে আকর্ষণীয় ও মধুময়। ৩২টি দেশের ৭৩৬ জন ফুটবল শিল্পীর পা, মাথা ও শরীরের শৈল্পিক প্রদর্শনী আমাদের আপ্লুত, উচ্ছ্বসিত, আবেগতাড়িত ও আনন্দিত করছে। ব্রাজিল বিশ্বকাপের প্রথম গোলটি হয়েছে আত্মঘাতী। খেলার ১১ মিনিটের সময় ব্রাজিলের মার্সেলের পা থেকে নিজ দলের বিপক্ষে আসে এই গোল।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিন্ট ডেম্পসির ৩২ সেকেন্ডের মাথায় করা গোলটি বিশ্বকাপ ইতিহাসের দ্রুততম গোলের তালিকায় পঞ্চম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। আর ব্রাজিল বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত দ্রুততম গোলও এটি। এর আগেও বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম মিনিটেই গোলের ঘটনা ঘটেছে অনেকবারই। বিশ্বকাপের ইতিহাসের সবচেয়ে দ্রুততম গোলটি তুরস্কের মিডফিল্ডার হাকান সুকারের। ২০০২ বিশ্বকাপে ১১ সেকেন্ডেই তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার জালে বল পাঠান তিনি। ১৯৬২ সালের বিশ্বকাপ চেকপ্রজাতন্ত্রের ভক্লাভ মাসেকের মেক্সিকোর বিপক্ষে ১৬ সেকেন্ডে করা গোলটি দ্বিতীয় দ্রুততম গোল। ১৯৩৪ বিশ্বকাপে পশ্চিম জার্মানির আর্নেস্ট লেনহারের করা ২৫ সেকেন্ডের গোলটি দ্রুততম গোলের তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ডের ব্রায়ান রবসনের গোলটি। ফ্রান্সের বিপক্ষে ১৯৮২ বিশ্বকাপে ২৭ সেকেন্ডে গোলটি করেছিলেন তিনি। এরপরই থাকছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লিন্ট ডেম্পসির ৩২ সেকেন্ডে করা গোলটি।

www.pathagar.com

এ লেখা শুরু করার সময় গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেন নেদারল্যান্ডসের সাথে ৫-১ এবং চিলির সাথে ২-০ গোলে হেরে সর্বপ্রথম ১ম রাউন্ড থেকে বিদায় নেয়। এদিকে জার্মানির দুরন্ত গতির সামনে বাধা হতে পারল না পর্তুগাল। জার্মান স্ট্রাইকার থমাস মুলারের হ্যাটট্রিকে বিধ্বস্ত হলো পর্তুগাল। বড় পরাজয় দিয়ে শুরু হলো ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর বিশ্বকাপ যাত্রা।

ফুটবল মহাযজ্ঞ শুরুর পর ক্যালেন্ডারের পাতায় ৮৪ বছর কেটে গেছে। এই সময়ে বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসনের নিগড় থেকে মুক্ত হয়েছে। ভেঙে গেছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নও। কিন্তু ফুটবলের রঙ বদলায়নি। কমেনি খেলাটির প্রতি মানুষের অকৃত্রিম অনুরাগ ও আবেগ। তাই বিশ্বকাপের কিছু স্মৃতি ফুটবলপ্রেমীর মানসপটে অমলিন। কিছু কিছু গোল জায়গা পেয়েছে মানুষের দৈনন্দিন আলাপচারিতায়।

বিশ্বকাপ এখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সত্যিকার অর্থেই একটি আন্তর্জাতিক মিলনমেলা হয়ে উঠেছে। এতে অংশ নেয়া দলগুলো একে অপরকে, এক দেশ অপর দেশ সম্পর্কে জানতে পারছে। বাড়ছে সৌহার্দ্য। বিপরীতে বিশ্বকাপ নিয়ে হুলস্থুল বাজি ধরা, এমনকি খুনখারাবির মতো ঘটনাও অনেক দেশে ঘটে। বিশ্বকাপের মূলপর্বে বাঙালি খেলোয়াড়রা খেলবেন এই চিন্তা আমাদের শিহরিত করে। কিন্তু বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। অথচ যে ব্রাজিলে বিশ্বকাপের আসর, যে ব্রাজিলকে নিয়ে এত উচ্ছ্বাস, আবেগ আর মাতামাতি, সেই ব্রাজিলিয়ানদের অনেক আগে আমাদের পূর্বপুরুষদের ফুটবলের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে।

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই প্রতিযোগিতার সাধারণ নিয়মনীতি হলো শান্তির সাথে শান্তি, অস্ত্রের সাথে অস্ত্র, প্রযুক্তির সাথে প্রযুক্তির মোকাবিলা। ফুটবল খেলায়ও দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে হয়। আমাদের এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ভিশন নির্ধারণ করতে হবে ২০১৮ সালে রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত ২১তম আসরে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ। ২০২২ সালে কাতারে অনুষ্ঠিত ২২তম এবং ২০২৬ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত ২৩তম আসরে বাংলাচমক চিন্তা করে অগ্রগামী হতে হবে।

এর জন্য বাংলাদেশের ফুটবলকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ জনবল দিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে। কোচ আমদানিনীতি ত্যাগ করতে হবে। বাংলাদেশের ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার

www.pathagar.com

সাথে ফুটবলের উপর সাধারণ জ্ঞান প্রদান করা হয় মাত্র। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের এখন প্রয়োজন সম্পূর্ণ পেশাদারী ফুটবল খেলা। ফুটবল ক্রীড়ায় ৪ বছর মেয়াদি আন্তর্জাতিকমানের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার ভিশন নির্ধারণ করতে হবে। দীর্ঘ প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষ শিক্ষাভিত্তিক পেশা হিসেবে ফুটবল গৃহীত হবে। প্রতিভাধর খেলোয়াররা উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় জাতীয় দলে খেলবেন। পাশাপাশি স্থানীয় ক্লাবগুলোতে সৃষ্টিশীল খেলোয়ার তৈরিতে নেতৃত্ব দিবেন। ফুটবল প্রযুক্তি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খেলোয়ারের মেধা দক্ষতা ও সৃজনশীলতায় ফুটবলে হৃত গৌরব ফিরে আসবে। বিশ্ব আসরে দর্শনসুখী না হয়ে সুফলভোগী হবো।

দৈনিক সংবাদ : ২ জুলাই ২০১৪

www.pathagar.com

রিও অলিম্পিকের পূর্বপ্রস্তুতি ও আমরা

জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বজায় রাখা এবং বিশ্বের জনগোষ্ঠীর হিংসা, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ-সংঘাত দূর করে এক পৃথিবীর এক মানবগোষ্ঠীর মেলবন্ধন সৃষ্টিই অলিম্পিক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগে সূচিত হওয়া সীমিত আকারের অলিম্পিকের উদ্দেশ্য ছিল দেব-দেবীর তুষ্টি আর মনোরঞ্জন। অ্যাথলেট আর ক্রীড়াবিদদের শক্তি, শৌর্য ও সামর্থ্য নিবেদন করা হতো। ফ্রান্সের ব্যারন ডি কুবার্টিন জন্ম দেন নব্য অলিম্পিকের। দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে আধুনিক অলিম্পিক নিয়ে আসে শান্তির বাণী। সারা বিশ্বের তরুণ আর যুবসমাজ মিলিত হয় অলিম্পিক পতাকাতলে, জ্বলজ্বলে অলিম্পিক মশাল সৃষ্টি করে সোনালি অতীত, গৌরবোজ্জ্বল বর্তমান আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন। অনেকে বলে জাতিসংঘ অর্থ, বিত্ত-বৈভব আর প্রভাব দিয়ে যা পারেনি অলিম্পিকের ভূমিকা এর থেকেও অনেক উজ্জ্বল দ্যুতিময়। মশাল অলিম্পিকের অবিচ্ছেদ্য ইতিহাস। প্রাচীন অলিম্পিক চলাকালে গ্রিসের অলিম্পিয়ায় জিউস দেবতার বেদিতে পবিত্র মশাল শিখা প্রজ্বলিত করে জ্বালিয়ে রাখা হতো। ১৯২৪ আমস্টার্ডাম গেমস থেকে পুনরায় অলিম্পিক মশাল চালু হয়।

গ্রিক ভাষার কবি কেস্তিস আলামাসের লেখা অলিম্পিক সংগীতে সুরারোপ করেছিলেন আরেকজন গ্রিক কবি ও সুরকার স্পাইরোস সামারাস। ১৮৯৬ সালে গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে হওয়া প্রথম আধুনিক অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো গাওয়া হয়েছিল অলিম্পিক সংগীত। গেল বছরের আসরটি বসেছিল লন্ডনে ১৬ জুলাই থেকে ১৩ আগস্ট মোট ১৬ দিনের। অলিম্পিক শেষেও রয়ে গেছে রেশ। বিশ্বে যা কিছু মহান চির-কল্যাণকর অর্ধেক করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর—কবি নজরুল অনেক আগেই এমন কথা লিখে গেছেন। নারী অধিকার সব স্তরে প্রতিষ্ঠিত না হলেও নারীরাও এগিয়ে আসছেন। যেমন লন্ডন অলিম্পিক গেমসে। পদক জেতার দৌড়ে ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে মেয়েরাই। লন্ডনে নারী ক্রীড়াবিদদের আধিপত্য শীর্ষ স্বর্ণপদক জেতা দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দলে। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬

www.pathagar.com

স্বর্ণের ২৯টিই এনে দিয়েছিল মেয়েরা। চীনের ৩৮ স্বর্ণপদকের ২০টি নারীদের। মেয়েদের এমন আধিপত্যের পরিসংখ্যান রাশিয়ান দলেও।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আইওসির নিয়ম অনুসারে অলিম্পিকে প্রত্যেক দেশ থেকে অন্তত দুজন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ করার সুযোগ উন্মুক্ত। এ দুজনের মধ্যে একজন হবেন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। কিন্তু এই লন্ডন অলিম্পিকের আগে কখনোই অংশগ্রহণকারী সব দেশ মহিলা প্রতিযোগী পাঠায়নি। সৌদি আরব, আফগানিস্তান, কাতার আর ব্রুনাই থেকে এবারই প্রথম অংশ নিলেন মহিলা প্রতিযোগীরা। প্রথম মহিলা প্রতিযোগী হওয়ার ইতিহাস গড়তে গিয়ে কোহিস্তানি আর শাহেরখানিকে লন্ডনে আসার পর নানা প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়েছে। ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে মেয়েদের মাথার চুল ঢেকে সৌদি আরবের প্রথম মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে অলিম্পিকে অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েন শাহেরখানি। ঐতিহ্যের অলিম্পিকে হিজাবের জয় হয়েছে। ১৬ দিনের প্রতিযোগিতায় ৩০২টি পদকের জন্য লড়াই করেছেন ১০ হাজারেরও বেশি অ্যাথলেট। যাতে বিশ্বরেকর্ড হয়েছে ৪৬টি। শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা জিতেছে ১০৪টি পদক। তার মধ্যে স্বর্ণপদক ৪৬টি, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ২৯টি করে। দ্বিতীয় হয়েছে চীন। তারা পেয়েছে ৩৮ স্বর্ণপদকসহ ৮৭টি পদক। স্বাগতিকদের সুবিধা নিয়ে তৃতীয় হয়েছে গ্রেট ব্রিটেন। তারা পেয়েছে ৬৫টি পদক, যার ২৯টি স্বর্ণ। তারা পেছনে ফেলেছে রাশিয়াকে। রাশিয়া পেয়েছে ২৪টি স্বর্ণপদক। মোট পদকের সংখ্যা ৮২। দখল করেছে চতুর্থ স্থান।

লন্ডন অলিম্পিকের নায়ক অনেকেই হয়েছেন, কিন্তু মহানায়ক হয়েছেন তিনজন। উসাইন বোল্ট, মাইকেল ফেলপস এবং মোহাম্মদ ফারাহ। এ তিনজনই হৃদয় জয় করেছেন কোটি কোটি দর্শক সমর্থকের। কিংবদন্তিদের কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন জ্যামাইকার 'অতিমানব' বোল্ট। টানা দুটি অলিম্পিকে জিতেছেন ১০০, ২০০, এবং ৪০০ মিটার রিলের স্বর্ণপদক। যেটি অলিম্পিকের ইতিহাসে আর কারো করার সামর্থ্য হয়নি।

প্রযুক্তিতে প্রতিটি মুহূর্তে নতুন নতুন অগ্রগতি হচ্ছে। সে হিসেবে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের সবচেয়ে আলোচিত ও বনেদি আসর বলা হয়ে থাকে অলিম্পিক গেমসকে। বাংলাদেশের মতো দেশের কাছে যেখানে অংশগ্রহণটাই বড় কথা হয়ে থাকে সেখানে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কে কত বেশি স্বর্ণ জিততে পারে চলে সে প্রতিযোগিতা। প্রযুক্তিতে দিন বদলের মতোই বদল হয়েছে অনেক কিছু।

www.pathagar.com

প্রযুক্তি যতটা পরিবর্তন তার বেশিরভাগই চলতি শতাব্দীতে। সে কারণেই গত শতাব্দীর চেয়ে চলতি শতাব্দীর আয়োজনের দিক থেকে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রযুক্তির বদৌলতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় বিচারকরা। তাদের স্থান নির্ধারণের বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যায়। পাশাপাশি অ্যাথলেটেরা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের ক্রীড়াশৈলীতে দিতে থাকেন নতুনত্বের ছোঁয়া। এছাড়া সাঁতারে সুইম স্যুট ইলেকট্রনিক রিয়েল টাইম কভারেজ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে অ্যাথলেট, বিচারক ও কোচরা সুবিধা প্রাপ্তির দিক থেকে অনেক এগিয়ে থাকেন। নতুন নতুন গ্রাফিক্স উদ্ভাবনের মাধ্যমে আরো সমৃদ্ধ ও মানসম্পন্ন আয়োজন হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম ফল যা পেতে অনেক সময়ের পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতো সেগুলো মুহূর্তেই পাওয়া যাচ্ছে। প্রযুক্তির কল্যাণে অলিম্পিকে ব্যবহার হতে থাকে হেলমেট ক্যামেরা, অন স্ক্রিন স্পিডোমিটারসহ অন্যান্য প্রযুক্তি। এসব প্রযুক্তি শুধু অলিম্পিক গেমসকে সমৃদ্ধ করেছে তা নয়, ধীরে ধীরে এ প্রযুক্তিগুলো জায়গা করে নিয়েছে ফুটবল, বাস্কেটবল খেলাগুলোতে।

গেল অলিম্পিকের ৯৪ ভেন্যুতে ১০ হাজার কম্পিউটার সার্ভার, নেটওয়ার্ক ও সিকিউরিটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। লন্ডন অলিম্পিকের প্রযুক্তি বেইজিং অলিম্পিক প্রযুক্তির চেয়ে ৩০ শতাংশ বেশি কার্যকর ছিল। ফলস্বরূপ যে কোনো জায়গা থেকে নিমিষেই পাওয়া গেছে তরতাজা সব তথ্য। অলিম্পিক মাঠে দেখার পাশাপাশি টিভিতে দেখেছেন ৪ বিলিয়নেরও বেশি মানুষ, যা পৃথিবীর মোট চার ভাগের তিনভাগ। ব্যবহৃত সব প্রযুক্তি একটি অপারেশন সেন্টারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। সেটির নাম মিশন কন্ট্রোল। এর সহায়তায় ৯৪টি অলিম্পিক ভেন্যুর ফলাফল, আইটি নিরাপত্তা ও টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এ প্রযুক্তির ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ৪৫০ জন টেকনিশিয়ান ২৪ ঘণ্টা ভেন্যুর অভ্যন্তরে ও বাইরে অবস্থান করেছিলেন। যদি কোনো কারণে আবহাওয়া বৈরী থাকে তাহলে বৃষ্টিরোধক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রস্তুতিও ছিল। ডিজিটাল অলিম্পিক গেমসের বাইরে এবারের অলিম্পিক সবুজ শ্যামল ছায়ায় আচ্ছাদিত ছিল। একটি বিশেষ প্ল্যান্ট থেকে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ, ঠাণ্ডা ও গরম পানি সরবরাহ করা হয়েছে অলিম্পিক পার্কে। এখানে এমন একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যাতে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ গ্রিডের চেয়ে ৩৩ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়। পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ছিল মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম। এ কারণে লন্ডন অলিম্পিককে নাম দেয়া হয়েছে 'ডিজিটাল অলিম্পিক'।

www.pathagar.com

খেলোয়াড় পাঁচজন আর কর্মকর্তা ৪৫ জন মিলে এবারের অলিম্পিকে বাংলাদেশের দলটি একেবারে ৫০ জনের। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্য ২০৪ দেশের মধ্যে ৮০টি দেশের ভাগ্যে এখনও অলিম্পিকের কোনো পদক জোটেনি। বঞ্চিত তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ওপরের সারিতে। বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ বাংলাদেশের অলিম্পিক অভিষেক ঘটে ১৯৮৪ সালে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে। এতে বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়াবিদ হিসেবে অংশ নেন ১০০ মিটার প্রিন্টার সাইদুর রহমান ডন। এরপর সিওল, বার্সেলোনা, আটলান্টা, সিডনি, এথেন্স, বেইজিং। পর পর সাত অলিম্পিক আসরেই উড়েছে বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা। কিন্তু তা শুধু শোভা বাড়িয়েছে উদ্বোধনী আসরগুলোরই।

এবারের অলিম্পিকে অংশ নেয়া দেশগুলোর মধ্যে কেনিয়া, ইথিওপিয়া কিংবা কাজাখিস্তানের মতো দেশের নাম রয়েছে। এসব দেশের অ্যাথলেটেরা বাংলাদেশি অ্যাথলেটদের মতো এত বেশি সুযোগ সুবিধা পায় না। তারপরও আপন আলো ছড়িয়ে তারা উজ্জ্বল। কেনিয়া ২, ইথিওপিয়া ২ ও কাজাখিস্তানের অ্যাথলেটেরা ৫টি করে পদক জিতেছেন। লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ ছিল আংশিকভাবে হলেও বাঙালির অলিম্পিক। এই অলিম্পিক আয়োজনে ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের ভূমিকা ছিল সর্বমহলে প্রশংসনীয়। অলিম্পিক ২০১২'র আয়োজক হওয়ার দৌড়ে প্যারিসের চেয়ে মাত্র চার ভোট বেশি পেয়ে লন্ডন হয়েছিল অলিম্পিক ২০১২ এর আয়োজক। আর এর পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান যার তিনি বাঙালি নারী আয়েশা কোরেশী। এর স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি অবশ্য ব্রিটেনের রানী কর্তৃক এমবিই (মেম্বার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার) পদকে ভূষিত হয়েছিলেন। লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ আয়োজনের জন্য যে আয়োজক কমিটি কাজ করেছে সেখানেও ছিল একজন বাঙালি, তিনি হলেন ড. মোহাম্মদ আবদুল বারী। লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ উপলক্ষে পাঁচ পাউন্ড মূল্যের যে স্মারক মুদ্রাটি বের করা হয়েছে সেই মুদ্রার ডিজাইনও করেছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশী যুবক সায়মান মিয়া। অলিম্পিকের টর্চ হাতে দৌড়ানো বিশাল সম্মানের। যুক্তরাজ্যের আট হাজার সৌভাগ্যবান মানুষের সুযোগ হয়েছে এই টর্চ হাতে দৌড়ানোর, যার মধ্যে ব্রিটিশ বাংলাদেশী ছিল নয়জন। লন্ডন অলিম্পিক ২০১২'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ইতোমধ্যেই অনেকে বলেছেন ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। স্লামডগ মিলিয়নেয়ার ছবির পরিচালক ড্যামি বোরেল ছিলেন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায়। আর তিনিই অনুষ্ঠানের কোরিওগ্রাফি এবং একক নৃত্যের

www.pathagar.com

জন্য বেছে নিয়েছেন বিখ্যাত আরেক ব্রিটিশ বাঙালি ড্যান্সার এবং কোরিওগ্রাফার আকরাম খানকে। শুধু তাই নয়, যে মেট্রোপলিটন শহরে অলিম্পিক আসর বসেছে সেখানের মেয়র লুৎফর রহমানও একজন বাঙালি।

মুখে দাড়ি, গায়ে কুর্ত্তা, পায়ে চম্পল, মাথায় টুপিওয়ালারা টঙ্গীতে ১৯৬৬-২০১৩=৫৭টি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অনুষ্ঠান বিশ্ব ইজতেমা আয়োজন করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) কে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হলে এই শতাব্দীতেই বাংলাদেশের মাটিতে অলিম্পিক গেমস আয়োজন অসম্ভব হবে, এ চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২০৪টি দেশের অলিম্পিক মশাল যা আবার জ্বলবে ঠিক চার বছর পর ২০১৬ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে। ফের বসবে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের মেলা। উড়বে অলিম্পিক গেমসের ভ্রাতৃত্বের পতাকা। বিশ্বের হাজার হাজার অ্যাথলেট আবার দাঁড়াবেন একমঞ্চে।

জেনেটিক্যালি আমাদের সব যোগ্যতাই আছে। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রীড়াবিদ ও খেলোয়াড় সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবানে বসবাসকারী পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বা ঝুমিয়ারা কাঁধে-পিঁঠে বোঝা বয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গায়। প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার যোগ্যতা বিশ্বের অনেকের চেয়ে এদের অনেক বেশি। তাদের বংশধারায় এই সহ্যশক্তির উপযুক্ত ডিএনএ বহন করে আসছেন। এদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ভারোত্তালন, বর্ষা নিক্ষেপ, চাকতি নিক্ষেপ, কুস্তি, দ্রুত ও দীর্ঘ দৌড় (১০০ মিটার স্প্রিন্ট থেকে ম্যারাথন পর্যন্ত) উচ্চ ও দীর্ঘ লাফ, ফুটবল, কাবাডি, প্রভৃতি ক্রীড়া ও খেলাধুলার প্রতিযোগী হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

অলিম্পিকে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে একাধিক ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চালু করতে হবে প্রতিটি ইভেন্ট ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স। সরকারি বেসরকারি ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ নীতি সহজ সরল করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড। যে বোর্ডের দিকনির্দেশনায় জন্ম নিবে নবজাতক ক্রীড়াবিদ। ২০১৬ ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে চীন, আমেরিকা, রাশিয়া, জামাইকার সাথে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজবে।

আলোকিত বাংলাদেশ : ১৭ জুলাই ২০১৩

www.pathagar.com

হিরোশিমা নাগাসাকি বিপর্যয়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর। প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ ইউরোপেই বিস্তৃত থাকে। জার্মানি যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই পোল্যান্ডে প্রবেশ করে। সেপ্টেম্বরের তিন তারিখে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একমাত্র আয়ারল্যান্ড ছাড়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সব দেশই গ্রেট ব্রিটেনের পাশে এসে দাঁড়ায়। জার্মানদের আকাশপথে নতুন যুদ্ধ কৌশল ও অন্যান্য রণকৌশলের কারণে অল্পদিনের মধ্যেই পোল্যান্ড অধিকারে সমর্থ হয়। ডেনমার্ক জার্মানদের প্রতিরোধ না করলেও নরওয়ে তাদের প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। একইভাবে নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামও আক্রান্ত হয়। জার্মান ও ইতালিয়ানদের প্রভাবে ইউরোপের সর্বত্র যুদ্ধের আগুন জ্বলতে থাকে।

আমেরিকা প্রথম পর্যায়ে নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা দিলেও ক্রমে তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৪১ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল অ্যাটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষর করেন। এরপর আমেরিকাও বিশ্বযুদ্ধে সন্তর্পণে অগ্রসর হতে থাকে। ইতোমধ্যে জাপান, মিয়ানমার ও ভারতের দিকে অগ্রসর হয়ে বোমা নিক্ষেপ করে। হাওয়াইয়ে পার্ল হারবারে আমেরিকার নৌবহরের আস্তানা ছিল। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান এখানে বোমা নিক্ষেপ করে নেভাল বেসের বড় একটি অংশ ধ্বংস করে দেয়। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া হলো বিপরীত। আমেরিকা জাপানকে পরাজিত করার এক নিন্দিত কৌশল গ্রহণ করে। যার চূড়ান্ত ফলাফল হিরোশিমা এবং নাগাসাকি। সেই ভয়ংকর প্রজেক্টের নাম ছিল 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট'। ২শ' কোটি ডলারের এই প্রজেক্টে অনেক গবেষণা করে তৈরি করা হয়েছিল চারটি বোমা ট্রিনিটি, লিটল বয়, ফ্যাট ম্যান. অনামিকা। ট্রিনিটি পরীক্ষামূলকভাবে ১৬ জুলাই ১৯৪৫ সালে আমেরিকার নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যে বিস্ফোরণ করা হয়েছিল, যার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ছিল ২০ কিলোটন টিএনটি।

www.pathagar.com

সারা বিশ্ব যখন বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার নরকে পরিণত হয়েছে এমন সময় ৬ আগস্ট সোমবার ১৯৪৫ সালে জাপানের বিখ্যাত শহর হিরোশিমা, আণবিক বোমার বিস্ফোরণ নিমিষে রূপ নেয় ধুলো আর ছাইয়ের শহরে। তখন মাত্র সকাল ৮টা ১৫ মিনিট। মার্কিন বিমান বি-২৯ এনোলা গে হিরোশিমার শান্ত আকাশে মৃত্যুদূত নিয়ে হাজির হয়ে ভূমি থেকে ১৬৭০ ফুট ওপর থেকে হিরোশিমার বুকে ফেলে ৬০ কেজি ওজনের ইউরেনিয়াম-২৩৫ সমৃদ্ধ বোমা 'লিটল বয়'। পতনের ৫৭ সেকেন্ড পর ১২০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ২৮ ইঞ্চি প্রস্থের এই বোমাটি বিস্ফোরিত হলে সেখানে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৫০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায় ৫.০২ বর্গকিলোমিটার এলাকা। প্রাণ হারায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ। ধ্বংস হয়ে যায় ৫১,৭৮৫টি বাড়ি। হিরোশিমার আকাশ ছেয়ে যায় কালো ধোঁয়ার মেঘ। যারা বিস্ফোরণস্থলে ছিল তারাই মরে বেঁচে গিয়েছিল। কারণ তাদের খুব একটা মরণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। কিন্তু যারা বিস্ফোরণ স্থলের কিছুটা দূরে ছিল তাদেরকেই মরণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে ধুকে ধুকে। এরাই অনুভব করতে পেরেছিল মানুষ কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে। হিরোশিমায় পরবর্তী সময়ে যেসব শিশুর জন্ম হয় তাদের বেশিরভাগই ছিল বিকলাঙ্গ। কারণ আণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তা তখনো মানুষের শরীরে থেকে গিয়েছে। আজও কিন্তু সেই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব রয়ে গেছে হিরোশিমার আকাশে-বাতাসে। হিরোশিমার মাটিতে আজও ঝরে পরে এক বুক দীর্ঘশ্বাসের শোকের অশ্রু।

তার ঠিক তিন দিন পর ৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার ১৯৪৫ সালে আবারো যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় জাপানের আরেকটি শহর নাগাসাকিতে। স্থানীয় সময়, বেলা ১২টা ২ মিনিটে মার্কিন বিমান 'বি-২৯ বক্সকার' থেকে প্লুটোনিয়াম-২৩৯ সমৃদ্ধ 'ফ্যাট ম্যান' নামক দ্বিতীয় আণবিক বোমাটি নাগাসাকি শহরে নিক্ষেপ করা হয়। ভূমি থেকে ১৬৪০ ফুট ওপর থেকে নিক্ষেপ করার ৪৩ সেকেন্ড পর এই বোমাটি বিস্ফোরিত হওয়ার মুহূর্তে প্রাণ হারায় প্রায় ৮০ হাজার মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ২.৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা। নিমিষে ধ্বংস হয়ে যায় ১২,৭৫০টি বাড়ি। ফ্যাট ম্যান যদি নাগাসাকি শহরের ঠিক মাঝখানে বিস্ফোরিত হতো তাহলে হয়তো পুরো নাগাসাকিই গোরস্থানে পরিণত হতো। কারণ প্লুটোনিয়াম-২৩৯ সমৃদ্ধ ফ্যাট ম্যান ছিল হিরোশিমায় বিস্ফোরিত হওয়া লিটল বয় থেকে অনেক উচ্চ ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা। সৌভাগ্য যে বোমাটি লক্ষভ্রষ্ট হয়ে বিস্ফোরিত হয়েছিল কিছুটা পাহাড়ি জনপদে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে

www.pathagar.com

আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর জাপান মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। হিরোশিমায় আমেরিকার বোমাবর্ষণ শান্তিকামী মানুষের ওপর যে আক্রমণ, তা এক অর্থে বিশ্বশান্তি বিনষ্টকারী একটি আগ্রাসী ভূমিকা। পৃথিবীর কোনো দেশে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া সাধারণভাবে বসতি এলাকায় আক্রমণ করে মানুষ হত্যা নিষিদ্ধ ও অপরাধ বলে বিবেচিত। হিরোশিমায় বোমা ফেলে একটি ঘনবসতি অধ্যুষিত শহর প্রায় নিশ্চিহ্ন করার যে উদ্যোগ তা মানবতার চরম নির্লজ্জ অপরাধ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানকে যুদ্ধের জন্য অনেক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তারপর শুধু জাপান নয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত জার্মানিও ক্রমান্বয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানি ও জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা সবচেয়ে ঈর্ষণীয়। এ ধ্বংসযজ্ঞ জাপানিদের জীবনে নতুন চেতনার সৃষ্টি করেছে। তারা যুদ্ধ নামে ঘৃণ্য এক অপঘাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শান্তির পথে নেমে এসেছে। শুধু প্রতি বছর হিরোশিমায় আগস্টের বোমা বর্ষণের দিন স্মরণ করে শান্তির জন্য জাপানিরা প্রার্থনা করেন না, সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও বহন করে নিয়ে যান শান্তির পতাকা। বাংলাদেশেও তারা এসেছিলেন কয়েক বছর আগে, শান্তির বাণী নিয়ে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে খুঁটি পুঁতে তার ওপরে শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন।

হিরোশিমা ও নাগাসাকি বিপর্যয়ে জাপানিদের মন ভেঙে পড়লেও পড়েনি শুধু সম্রাট হিরোহিতোর। তিনি শোককে শক্তিতে পরিণত করেন। শক্ত হাতে জাপানি জাতির হাল ধরেন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন অ্যাটম বোমার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপান বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই পরিবর্তন করতে হবে। প্রযুক্তির মোকাবিলা প্রযুক্তির মাধ্যমে করতে হবে। ধ্বংসের মাধ্যমে না হয়ে সেটি হবে সৃষ্টির মাধ্যমে। সিদ্ধান্ত নিলেন একগ্রাম একপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হবে। স্বল্পমূল্যে স্বল্প সময়ে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করতে হবে। এর জন্য পণ্যভিত্তিক জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করলেন। মাত্র ২০ বছরের মধ্যে ১৯৭৫ সালে ৫৬ শতাংশ লোককে ডিপ্লোমা শিক্ষায় শিক্ষিত গড়ে তুললেন। ডিপ্লোমা পেশাজীবীর মেধা, শ্রম নিরলস প্রচেষ্টা স্বল্পব্যয়ে উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদন করল জাপান। কুলিন ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকাকে চমকে দিয়ে নব্য শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটল। জাপানি ভাষা থেকে বেকার শব্দ নির্বাসিত হলো।

www.pathagar.com

আমরা আমাদের যুবকদের ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষিত করে সম্পদের সাথে সংযোগ ঘটাতে পারিনি। বাংলাদেশে বর্তমানে ডিপ্লোমা শিক্ষার হার ২ শতাংশ। সীমান্তবর্তী, দ্বীপ, হাওর, বরেন্দ্র, পাহাড়ি এলাকা .০৩ শতাংশ। এর কুফলে ৩ কোটি শিক্ষিত যুবক কর্মহীন জীবন কাটাচ্ছে।

৬৯তম হিরোশিমা দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক যেখানে হাইস্কুল আছে সেখানে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। এর জন্য ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ নীতি সহজ, সরল বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রযুক্তি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তরুণ যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করা।

দৈনিক সংবাদ : ৬ আগস্ট ২০১৪

www.pathagar.com

ব্যর্থ নার্সিং কাউন্সিল ও আমাদের প্রস্তাবনা

'মানুষ মানুষের জন্য' এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত যে মহৎ পেশাদার ব্যক্তি তিনি 'নার্স'। আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তিতে চিকিৎসকের পাশাপাশি কোমল পরশ বুলিয়ে রোগিকে সুস্থ করে তোলে নার্স। মহান ও আদর্শ পেশার দাবিও একমাত্র তাদেরই। ডাক্তাররা রোগের ভিত্তিতে প্রেসক্রিপশন করে। নার্স প্রেসক্রিপশনের নির্দেশ মোতাবেক অক্লান্ত পরিশ্রম ও শুশ্রূষার মাধ্যমে রোগিকে সুস্থ করে তোলে। হাসপাতালে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে যাদের অপলক দৃষ্টি কামনা করে রোগি, তিনিই নার্স। পৃথিবীর যেসব দেশের প্রতিটি নাগরিক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নার্সদের সেবা পেয়ে থাকে, সেসব দেশে ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী বোর্ড দেশের উপজেলায় পর্যন্ত নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশে নার্সিং কাউন্সিলের উপর ডিপ্লোমা নার্সিং প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত। নার্সিং কাউন্সিল গত ৪২ বছরে দেশের চাহিদার পর্যাপ্ত সংখ্যক ও গুণগত মানের নার্স প্রশিক্ষণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। নার্সিং কাউন্সিল সরকারিভাগে ৪১টি ও বেসরকারিভাবে ৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে মাত্র।

এই ৪৯টি ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর ২২১০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পায়। নার্সিং এ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত জনবলের অভাবে ক্লিনিক ও হাসপাতালগুলোতে প্রশিক্ষণবিহীন মেয়েদের দিয়ে নার্সিং এর কাজ করানো হচ্ছে। ফলে চিকিৎসা সেবার মান নিয়ে পত্রিকায় প্রতিদিন শিরোনাম হচ্ছে। প্রসবকালীন জটিলতা, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে, এর কারণ প্রশিক্ষিত দক্ষ ও নার্সের অভাব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে একজন চিকিৎসকের বিপরীতে তিনজন নার্স প্রয়োজন। সে হিসাবেও আমাদের দেশে নার্সের প্রয়োজন ১,৬৮,০০০ জন। বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল পরিচালিত নার্সিং ইনস্টিটিউটগুলোর শিক্ষার মান নিয়েও দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ

www.pathagar.com

করা হয়। এ দেশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকমানের দেড় হাজার চিকিৎসক ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট রয়েছে। যাদের নিয়ে দেশ ও জাতি গর্ববোধ করতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিকমানের ডিপ্লোমা নার্সের অভাব রয়েছে। বেসরকারিভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক নার্সিং স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সহযোগিতা করলে দ্রুত দেশে নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিযোগিতা থাকার কারণে গুণগত মানসম্পন্ন নার্স তৈরি হবে।

মধ্যপ্রাচ্যসহ বহু দেশে দক্ষ নার্সের অভাব এবং চাহিদা রয়েছে। বিদেশে নার্স নিয়োগের জন্য প্রতিবছর রিক্রুটিং টিম বাংলাদেশে আসে। উচ্চমানসম্পন্ন ডিপ্লোমা নার্সের অভাবে লোভনীয় এই চাকরিগুলো পূরণ করে ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা ও মিশর। বাংলাদেশ বঞ্চিত হয় জনশক্তি রপ্তানি আয় থেকে। ঢাকায় আমেরিকান সুপার স্পেশিয়ালিটি হাসপাতালের উদ্যোগে নার্সিং দক্ষতা নিয়ে একটি গোল টেবিল আলোচনা করা হয়েছিল। তাতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নার্স তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দেশে চিকিৎসা পেশার মান উন্নত করতে হলে নার্সিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা আবশ্যক।

দেশের প্রতিটি গ্রামে ২ জন করে প্রশিক্ষিত নার্স প্রেরণ এবং হাসপাতাল-ক্লিনিকসমূহে আনুপাতিকহারে নার্স প্রদানে প্রয়োজন প্রায় ৫ লক্ষ নার্স। বর্তমানে চালু ৪৯টি ইনস্টিটিউট থেকে এর চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। আমাদের প্রয়োজন নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার নীতি আরো সহজতর করে উপজেলা পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ঘটানো। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা।

বর্তমানে চলমান নার্সিং কাউন্সিলের মাধ্যমে এর সমাধা সম্ভব নয়। তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এর জন্য প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগে পৃথক ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

দৈনিক আমার দেশ : ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৬

www.pathagar.com

ফার্মেসি কাউন্সিল

পৃথিবী সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রতিটি দেশের প্রতিটি মানুষ জীবনে এক বা একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। রোগি রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসক রোগির আদিবৃত্তান্ত শ্রবণ করে চিকিৎসাপত্র প্রদান করেন। রোগি প্রেসক্রিপশনের নির্দেশমতো ওষুধ সেবন করে রোগ মুক্তি লাভ করেন। ওষুধ একটি জীবনরক্ষাকারী অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। গুণগত মানসম্পন্ন ওষুধ যেমন জীবন রক্ষা করে তেমনি নিম্নমানের ওষুধের অপপ্রয়োগ জীবন কেড়ে নিতে পারে। শরীর, স্বাস্থ্য, সুখ-অসুখ, ওষুধ শব্দগুলো যদিও একই তবু এদের কারো কারে সাথে সম্পর্ক কিন্তু মোটেও আত্মীয়ের নয়।

যেখানে স্বাস্থ্য সেখানেই অসুখের প্রশ্ন আছে। অসুখ থাকলে ওষুধ আসবেই। ওষুধ আবিষ্কারের মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নবযাত্রা শুরু হয়। ওষুধ বিজ্ঞানীরা সেই থেকে পিছনে ফিরে থাকাননি। অব্যাহতভাবে আবিষ্কার করতে থাকেন নতুন নতুন ওষুধ। ওষুধবিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ সৃষ্টি করে বহু ঘাতক ব্যাধিকে এই ধরা থেকে চিরবিদায় করা হয়েছে। ওষুধবিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সুন্দর ভুবনে বেঁচে থেকে নিরাপদ, সুস্থ সবল ও নিরোগ জীবনযাপনের নির্দেশনাটিও কিন্তু ওষুধ থেকে পেয়ে থাকি। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে ওষুধবিজ্ঞান ব্যাপক উন্নত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশে ওষুধবিজ্ঞান উন্নত করতে ডিপ্লোমা এবং গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টগণ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উন্নত বিশ্বের ওষুধ প্রস্তুত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সরবরাহের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তাদের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্রুত অগ্রগতি লাভ করছে।

বাংলাদেশে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টের অভাবে জাতীয় ওষুধ নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। বাস্তবায়ন হচ্ছে না 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' স্লোগান, এর মূল

www.pathagar.com

কারণ ওষুধনীতি নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের মূল ভূমিকা পালনকারী ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টদের প্রশিক্ষণ প্রদানে ফার্মেসি কাউন্সিলের ব্যর্থতা। একটি ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপকভাবে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে এ দেশের প্রতিটি নাগরিক আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পাবে। ওষুধ প্রযুক্তিবিদ্যায় ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশের জনগণের চিকিৎসাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে নিয়োজিত আছে একটি স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল স্কুল, নার্সিং ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিসহ ছোট বড় প্রায় ১০ হাজার হাসাপাতাল ও ক্লিনিক। এই হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে ৪০ হাজার গ্র্যাজুয়েট, ৪ হাজার ডিপ্লোমা চিকিৎসক, ২২ হাজার নার্স ও ৩ হাজার মেডিকেল টেকনোলজিস্ট। এতকিছু করেও দেশের সিংহভাগ মানুষের ন্যূনতম চিকিৎসা না পাওয়ার অন্যতম মূল কারণ যে পণ্যটির মাধ্যমে রোগ মুক্তি লাভ হয় সেই পণ্যটি নিয়ন্ত্রণ করছে ওষুধ প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রশিক্ষণবিহীন ওষুধের দোকানের নিম্নভূকর্মচারী। সরকার ফার্মেসি কাউন্সিলের উপর ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করে গত ৪৩ বছরে দেশে চাহিদার পর্যাপ্ত সংখ্যক ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সাথে তুলনায় না গিয়েও এ দেশের ডিপ্লোমা প্রদানকারী অন্য ৫টি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ফার্মেসি কাউন্সিল বহুগুণে পিছিয়ে আছে।

ফার্মেসি কাউন্সিল এখন পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারিভাবে ১টিও ফার্মাসিস্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। উপরন্তু আশির দশকের ১৩ শত কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল স্কুলে পরিচালিত ৫১টি ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে শুধু ঢাকা ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি ও রাজশাহী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ফার্মেসি কোর্সে প্রতি বছর ২০/৩০ করে ছাত্র ভর্তি করা হয়। ফার্মেসি কাউন্সিলের এই ব্যর্থতা স্বাস্থ্য ব্যব্যস্থা অবকাঠামো নিয়ে কলঙ্কজনক চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম ধীরস্থিরভাবে অগ্রগামী হচ্ছে।

বিশ্ব আজ একবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দী হলো প্রযুক্তি উৎকর্ষের যুগ। প্রযুক্তি উৎকর্ষের লক্ষ্যে বিশ্বের প্রতিটি দেশ ডিপ্লোমা শিক্ষার সনাতনী কারিকুলাম পরিবর্তন করে প্রবেশ করেছে বৃহত্তর আঙ্গিনায়।

www.pathagar.com

প্রাতিষ্ঠানিক ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্সকে ৪ বছরে উন্নীত করেছে। আমাদের দেশেও ৬টি বোর্ডের মধ্যে ৫টি বোর্ড তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল কোর্সের মেয়াদ ৪ বছরে উন্নীত করেছে। ফার্মেসি কাউন্সিল এক অজানা রহস্যের কারণে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট কোর্সের মেয়াদ মানবৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফার্মেসি কাউন্সিল এখন পর্যন্ত সমগ্র দেশে ওষুধের দোকান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, গবেষাণাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ওষুধ শিল্পে কত লক্ষ ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট প্রয়োজন তা নিরূপণ করতে পারেনি। যে বিশাল সংখ্যক ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট প্রয়োজন তাদের নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে জাতি অপচয় থেকে রক্ষা পাবে। এই পরিকল্পনাটুকু সরকারের কাছে পেশ করতে পারেনি কাউন্সিল।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী ঢাকা, বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, উপশহরের প্রতিটি গলি উপগলিতে এক বা একাধিক এবং দেশের প্রতিটি গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ওষুধের দোকানসহ প্রায় ৬ লক্ষ ৭০ হাজার ফার্মেসি বিদ্যমান। এই ফার্মেসিগুলো থেকেই এ দেশের ৯০ শতাংশ লোক চিকিৎসাব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এসব দোকানের কর্মচারীর কারোরই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ন্যূনতম প্রশিক্ষণ নেই। তারা এই পেশায় এসেছে উত্তরাধিকারসূত্রে, অথবা নিজ উদ্যোগে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভের আশায়। ড্রাগ লাইসেন্স এবং প্রশিক্ষণবিহীন তাদের এই অবৈধ ব্যবসা পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করছে ফার্মেসি কাউন্সিলের কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী। রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত ওষুধ ক্রয়বিক্রয় পৃথিবীর কোনো দেশেই হয় না। ব্যতিক্রম শুধু আমাদের সোনার বাংলায়। ওষুধের সঠিক ব্যবহার এবং চিকিৎসকের নির্দেশমতো নিয়ম পালনে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই একজন রোগি পূর্ণ সুস্থতা ফিরে পেতে পারে। এই নিয়মটুকু বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব যিনি ওষুধ বিক্রি করেন তারই। আমাদের দেশের ওষুধের দোকানদারগণের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত তা সঠিকভাবে পালন করছে না। উপরন্তু নকল, ভেজাল, নিম্নমানের ওষুধ এবং নেশাজাতীয় ওষুধের ক্রয়বিক্রয়ে জড়িয়ে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করে যাচ্ছেন। মাদকাশক্তি আমাদের জাতীয় সমস্যা। তা এখন রাজধানী শহর অতিক্রম করে গ্রামের পাড়ায়, মহল্লায়, প্রবেশ করেছে। এই দেশের তরুণ সমাজ ড্রাগ আসক্তি হয়ে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। এহেন কর্মকাণ্ডে পরিবারের কর্তা, সমাজসেবক, জাতীয় কর্ণধারগণকে ভাবিয়ে তুলছে। তরুণরা ড্রাগগুলো গ্রহণ করছে অসাধু ওষুধের

www.pathagar.com

দোকানদার থেকে, ওষুধবিজ্ঞানে তাদের প্রশিক্ষণ না থাকায় জাতির প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কমিটির সভায় ওষুধশিল্পে গুড ম্যানুফেকচারিং প্র্যাকটিসের উপর গৃহীত ৩২তম রিপোর্টে ওষুধ উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণের তত্ত্বাবধায়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টের সাথে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টদের নিয়োগদান বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ড্রাগ অ্যাক্ট ১৯৪০ ও ড্রাগ রুলস ১৯৪৫ অনুযায়ী ড্রাগ ম্যানুফেকচারিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ফার্মেসি প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টদের কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং এই নীতিমালাই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ওষুধ উৎপাদন, ক্রিয়া, বিক্রিয়া, ধর্ম, কর্ম, গুণাগুণ এবং ওষুধের মাননিয়ন্ত্রণের সূক্ষ্মজ্ঞান ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টদের মাধ্যমে সম্ভব। কারণ ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টদের শিক্ষাক্রমে ওষুধবিজ্ঞানের বিষয়ের সব সূক্ষ্ম জ্ঞান দেয়া হয়। অথচ ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টদের অভাবে এই সব ওষুধশিল্পে সাধারণ শিক্ষিতদের নিয়োগ দান করা হচ্ছে। বিগত সরকার অনুধাবন করতে পেরেছিলেন শুধু বড় বড় হাসপাতাল, উচ্চ ডিগ্রিধারী চিকিৎসক, নার্স ও মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মাধ্যমে এই দেশের জনগণকে আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব নয়। ওষুধের মতো সংবেদনশীল পণ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করা একটি স্বাধীন জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। হাসপাতাল, ক্লিনিক, ওষুধের দোকান পরিচালনা ও ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানাগুলোতে ওষুধ প্রস্তুতকরণে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টদের হাতে ন্যস্ত করার চিন্তা করেন। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপকভাবে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট কোর্স চালু করা। স্বল্প ব্যয়ে, কম সময়ে অধিক সংখ্যক ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ৮টি মেডিকেল কলেজ, ৩৬টি মেডিকেল স্কুলে ২টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট কোর্স চালু করেছিলেন। ভবিষ্যতে কোনো ফার্মেসি যাতে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট ব্যতীত প্রতিষ্ঠা করতে না পারে প্রশাসনকে সেই নির্দেশ প্রদান করেন। ওষুধ শিল্পে ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট নিয়োগ দানের পরিবেশ সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে ফার্মেসি কাউন্সিল ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এই কেন্দ্রগুলো বন্ধ করায় সবার জন্য স্বাস্থ্য বাস্তবায়নে অন্যতম বাধার সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

জাতি বঞ্চিত হয় আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ সুবিধা থেকে। জাতি আজ গভীরভাবে উপলব্ধি করছে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ও ওষুধনীতি বাস্তবায়নে একদল ডিপ্লোমা ফার্মাসিস্টের প্রয়োজন। যারা সরকারের স্বাস্থ্যসেবার সকল প্রকার আদেশ ও নির্দেশ পালন করবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফার্মেসি পরিচালনা প্রতিযোগিতা গ্রহণে এগিয়ে আসবে। চিকিৎসকের প্রেসিক্রপশন ছাড়া একটি ওষুধও রোগির হাতে দিবে না। দক্ষ জনশক্তির অভাবে বহুজাতিক কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ উৎপাদন ব্যাহত হবে না। সরকারি হাসপাতালের ওষুধ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ করবে, এই বিশাল গুরু দায়িত্ব পালন ফার্মেসি কাউন্সিলের পক্ষে সম্ভব না। এর জন্য প্রয়োজন সকল ডিপ্লোমা কোর্সের সাথে সমন্বয় করে একটি পৃথক ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা।

দৈনিক ইত্তেফাক : ৩০ আগস্ট ২০০৪

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ ও তাদের কর্মকাণ্ড

১৯ শতকের সূচনাতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়। এরই মধ্যে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি গ্রামে সমভাবে বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে গেছে। ১৯৭৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্লোগান ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে পৃথিবীর চিকিৎসাবিজ্ঞান আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সদস্য দেশসমূহে লিকেজ পয়েন্টগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো আধুনিক থেকে আধুনিকতম করা হয়। এর সুফলের কারণে আজ পৃথিবীর অনেক দেশেই মানুষ বিনা চিকিৎসা/অপচিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করছে না।

গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন প্রতিটি মহিলা বিজ্ঞানসম্মত উন্নত চিকিৎসা পাচ্ছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি শিশু পাচ্ছে স্বাস্থ্য পরিচর্যা। এই প্রক্রিয়া মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিক ভোগ করছে। বৃদ্ধরা গ্রহণ করছে বয়স্ক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সেবা। এতসব কিছু সম্ভব হচ্ছে সেই দেশেসমূহের ডিপ্লোমা চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক ও মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এই পরিকল্পনায় প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে ২ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ও একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্টকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এসব ডিপ্লোমা চিকিৎসক ও টেকনোলজিস্টগণ স্বল্প ব্যয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে দিবা-রাত্রি, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তে নিরলসভাবে আধুনিক শিক্ষা প্রদান করছে। যেসব জটিল রোগের চিকিৎসা প্রদান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না তা নিকটস্থ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও হাসপাতাল প্রেরণ করছে। এভাবে একটি জাতিকে সুস্থ ও সবল স্বাভাবিক গতিসঞ্চার করে উন্নতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা চিকিৎসক ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট প্রশিক্ষণ প্রদানে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয়ভাবে গালভরা বিশাল নাম বাংলাদেশ

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ এতবড় নামধারী প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম নামের বিশালতার সাথে একেবারেই বেমানান।

ব্রিটিশ সরকার আড়াইশো বছর ভারতবর্ষ শাসন কালে ৫৮টি মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। পক্ষান্তরে অনগ্রসর পূর্ববাংলার জনগণের চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ৮টি মেডিকেল স্কুল। এ দেশের জনগণের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল স্কুলে এলএমএফ কোর্স চালু করে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন শাসকগোষ্ঠী। ব্রিটিশ থেকে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এ দেশের গ্রামের জনগণের চিকিৎসা প্রদানে সুপরিকল্পিত স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উপরন্তু ব্রিটিশ সরকারের গড়ে তোলা ৮টি মেডিকেল স্কুলে এলএমএফ কোর্স বন্ধ করে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করে এমবিবিএস কোর্স চালু করে।

দারিদ্র্যপীড়িত আমাদের দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমানে সব জায়গায় শোনা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে সঠিক চিকিৎসা সম্ভব নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ বা বিদেশই হলো একমাত্র ভরসা। নানান সমস্যা ও অভিযোগের মধ্যে রোগের সঠিক পরীক্ষা ও গবেষণার জন্য দক্ষ জনশক্তির অভাবই অন্যতম। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ দেশের চাহিদা অনুযায়ী মেডিকেল টেকনোলজিস্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারছে না। ফলে অ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো শাখাই প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হচ্ছে না। আমাদের দেশের প্রতিটি রোগের জাতীয় ও আন্তর্জাতিকমানের অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিকমানের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট তৈরি করতে পারেনি একজনও। মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা, প্রকাশনার উপর ভিত্তি করে চিকিৎসকগণ জটিল রোগের চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন। এমন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট একজনও নেই যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেন। এ কারণে একদিকে যেমন সাধারণ রোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে না। অপরদিকে জটিল রোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা হচ্ছে না। ফলে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিদেশনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, যা একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতির জন্য লজ্জার বিষয়। এই করুণ অবস্থার মূল কারণ এ দেশে দক্ষ এবং পর্যাপ্ত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নেই।

www.pathagar.com

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্লোগান ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য বাস্তবায়নে গত শতকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি মাইল ফলক অতিক্রম করেছে। আর একটি মাইল ফলক অতিক্রম করতে যাচ্ছে ২০৫০ সালে সকল দেশে চিকিৎসাব্যবস্থার আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্তকরণের মাধ্যমে। বাংলাদেশও এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে লোকসংখ্যা ১৬ কোটি। তৃণমূলে জনসংখ্যা কঠোরহস্তে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ২০৫০ সালে লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৩০ কোটিতে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা প্রদান ও রোগ নির্ণয়ে সরকার ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ না করলে স্বাস্থ্যসেবা খাত পড়িমরি করে জর্জরিত হয়ে পড়বে।

সরকারি ও বেসরকারিভাবে একাধিক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানীতি সরকার গ্রহণ করছে। অর্ধশত বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও অনেক আধুনিক হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় তিন হাজার নতুন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পদ সৃষ্টি হয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে ৪৪ হাজার মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পদ পূরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বে ডিপ্লোমা শিক্ষার ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রতিটি ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাধিক বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। বাংলাদেশে মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু একটি নির্দিষ্ট কোর্স চালু আছে। অথচ মেডিকেল কলেজ ও স্কুলে চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা কোর্স চালু করলে চিকিৎসা ডিপ্লোমা শিক্ষার ব্যয় অনেক হ্রাস পাবে।

উন্নত দেশে চিকিৎসা শিক্ষাব্যবস্থার সনাতন ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করছে। ছাত্রছাত্রীরা ডিপ্লোমা অর্জনের পর যাতে জনগণের সঠিক চিকিৎসা প্রদান করতে পারে এজন্য ডিপ্লোমা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস নতুনভাবে সাজিয়ে ইন্টার্নিশিপ ট্রেনিং চালু করছে। ইন্টার্নি চিকিৎসক ও টেকনোলজিস্টদের কর্মচঞ্চলতায় হাসপাতালগুলোতে প্রাণের সঞ্চার করে থাকে। বাংলাদেশে এমবিবিএস ও বিডিএস পাস চিকিৎসকদের ১ বছর মেয়াদি ইন্টার্নিশিপ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ ডিপ্লোমা মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট, ডিপ্লোমা টেকনোলজিস্টদের পাস করার পর ইন্টার্নিশিপ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করেনি। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিধি চতুর্দিকে বিস্তারিত হচ্ছে। আবিষ্কার হচ্ছে নতুন নতুন রোগ। এই রোগগুলোর নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রসারিত করা যাচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা। এই শাখাগুলোকে পরিচালনা

www.pathagar.com

করার জন্য প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে নতুন ডিপ্লোমা কোর্স ও ইনস্টিটিউট। ১৯ শতকের সূচনাতে ইউরোপে দাঁতের পাথর পরিষ্কার করার জন্য ডেন্টাল হাইজিন, চুল কাটা ও শেভ করার জন্য হেয়ার কাটিং প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। উন্নত বিশ্বকে অনুসরণ করে সার্কভুক্ত দেশগুলো ডেন্টাল হাইজিন ও হেয়ার কাটিং ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ নতুন কোনো ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি, উপরন্তু হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ করার পায়তারা করছে।

বাংলাদেশে মেডিকেল ও ডেন্টাল ইনস্ট্রুমেন্ট সম্পূর্ণভাবে বিদেশে নির্ভরশীল। মেডিকেল ও ডেন্টাল ইনস্ট্রুমেটে প্রযুক্তিবিদ্যায় টেকনোলজিস্ট না থাকায় কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট শিল্প গড়ে ওঠেনি। সেলাই করার সুঁই, সুতা কাটার কেচি পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। প্রতি বছর সরকারি ও বেসরকারিভাবে ২ হাজার কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয়। এই মূল্যবান যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এ দেশে দক্ষ জনশক্তি নেই। শুধু মেডিকেল ও ডেন্টাল ইনস্ট্রুমেন্ট প্রযুক্তিবিদের অভাবে অনেক যন্ত্রপাতি স্বল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। এ অব্যবস্থা দূরীকরণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ১৯৮২ সালে স্মারক নং MEH/3-D-2/79/634 তারিখ ০৮/১১/৮২ মাধ্যমে ঢাকা ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল ইনস্ট্রুমেন্ট প্রযুক্তিবিদ্যায় একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার সুপারিশ করেছিল। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ দীর্ঘদিনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

আমাদের দেশে ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার ঢাকা ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে মেডিকেল টেকানোলজি (রেডিওথেরাপি) কোর্স চালু করে। ৮৬ সালে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ এ দেশে ক্যান্সার রোগীর স্বল্পতার অজুহাতে এই গুরুত্বপূর্ণ কোর্সটি বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশে আজ সকল ক্ষেত্রে পরিচালিত হচ্ছে মুক্ত চিন্তাচেতনার কর্মকাণ্ড। এই নীতি চিকিৎসা শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালিত হচ্ছে। যার সুবাদে এ দেশে অনেকগুলো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরো এক ধাপ এগিয়ে বেসরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করেছে।

দেশে প্রতিষ্ঠিত ৬৪টি জেলা সদর হাসপাতালকে মেডিকেল স্কুল হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হোক। প্রতিটি মেডিকেল স্কুলে কমপক্ষে ১০টি

www.pathagar.com

বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হোক। উপজেলা ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে মেডিকেল স্কুলের ইউনিটে পরিণত করে ছাত্রছাত্রী ও ইন্টার্নি চিকিৎকদের প্র্যাকটিকেল ক্লাসের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে আগামী ৫ বছরের মধ্যে সমগ্র দেশের স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নতি হবে। চিকিৎসক উপস্থিতি নিশ্চিত হবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এ দেশে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হবে। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের ব্যার্থতার গ্লানি মোচন হবে।

দৈনিক পূর্বকোণ : ১৩ মার্চ ২০০৫

www.pathagar.com

কারিগরি শিক্ষাবোর্ড প্রসঙ্গে

ডিপ্লোমা শিক্ষার সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণকারী কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের ব্যর্থতায় বাংলাদেশের ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার হার বিশ্বের সর্বনিম্নে অবস্থান করছে। ২ কোটি সাধারণ শিক্ষিত যুবক কর্মহীন জীবনযাপন করছে। প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছানো যাচ্ছে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করে চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। এ দেশের মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। একটি ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করে পরিকল্পিতভাবে ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা কোর্স চালু করলে স্বল্প ব্যয়ে স্বল্প সময়ে প্রযুক্তি-উন্নত জাতি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ড স্বাধীনতার ৪৩ বছরে স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারেনি। এই বোর্ডটি বর্তমানে হাতেগোনা কয়েকটি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করছে। এই কোর্সগুলোর মেয়াদ, মান ভিন্ন ভিন্ন। ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক, ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন সার্ভেইং, ডিপ্লোমা ইন মেরিন, ডিপ্লোমা ইন শিপ বিল্ডিং, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ২ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন কমার্স, এক বছর মেয়াদি কোর্স ডিপ্লোমা ইন টেকনিক্যাল অ্যাডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন, ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল আলট্রাসাউন্ড ইত্যাদি। ডিপ্লোমা শিক্ষার কারিকুলাম এত বেশি অনিয়ন্ত্রিত ও অগোছালা পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। আধুনিক কম্পিউটার যুগে যেখানে একটি কোর্সকে আইডিয়াল অন্য একটি কোর্সের সমমর্যাদায় আনতে ১০-১৫ মিনিট প্রয়োজন হয়, সেখানে আমাদের দেশে ৪৩ বছরে ভিন্নধারায় কোর্সকে একই নীতিমালার আনতে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের ডিপ্লোমা শিক্ষার মান জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। এর কুফল জাতি আজ বহন করছে উদ্বিগ্ন চিত্তে।

www.pathagar.com

তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অনগ্রসর পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা বাস্তবায়নে ১৯৬৭ সালের ১নং সংসদীয় কারিগরি শিক্ষা আইন বলে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এ দেশের মাটি, পানি, আলো, বাতাস ও মানবসম্পদকে লক্ষ্য রেখে ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থা সামনের দিকে অগ্রগামী হয়। মাত্র ৫ বছরের মধ্যে প্রফেশনাল কৃষি, মেরিন, বস্ত্র, গ্লাস অ্যান্ড গ্রাফিক্স, মৎস্য পশুপালন, লেদার, উড ও পাট প্রযুক্তিবিদ্যাসহ ১১১টি বিষয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন উড, জুট, মৎস্য, পশুপালন ও লেদার টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স পৃথিবীর ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন এবং অনুকরণীয়। এই কোর্সগুলোর সুফল বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদদের ভাবিয়ে তোলে। তারা আশির দশকে এসে বাংলাদেশকে অনুকরণ করে অনুরূপ ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স চালু করে। ১১১টি ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয় দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ফলে এ দেশটি একটি অঘোষিত কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষার চারণভূমি হিসেবে রূপ লাভ করে। ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদদের কর্মের মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি নীরব শিল্পবিপ্লব ঘটে। প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রায় ১২ হাজার ছোট বড় শিল্প-কারখানা। শিল্পপতিগণ প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলোতে নির্দ্বিধায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের নিয়োগ দান করেন। ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদরা তাদের মেধা, শ্রম ও একনিষ্ঠার মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলো শিল্প বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পে পরিণত করেন। নরসিংদীর জেবা টেক্সটাইল, টঙ্গীর মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি, খুলনা শিপইয়ার্ড, পতেঙ্গার স্টিল মিলস, ইস্টার্ন রিফাইনারি, ইস্টার্ন ক্যাবল, ছাতকের সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, আশুগঞ্জ সার-কারখানা, চন্দ্রঘোনা পেপার মিল, কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, আমদজী জুট মিলস, গাড়ি তৈরির কারখানা প্রভৃতি এর অন্যতম।

পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পগুলো ছিল পাকিস্তানের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প এশিয়ায় দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিয়েছিল। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও তাইওয়ানের অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল বাংলাদেশের নিচে। পূর্ব পাকিস্তান ছিল একটি রপ্তানিমুখী দেশ। প্রতিষ্ঠার ৩ বছরের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আদর্শ ও সৃষ্টির নীতি ত্যাগ করে ধ্বংসের নীতি গ্রহণ করে। ১৯৬৯ সালে কুমিল্লা ভেটেরিনারি ইনস্টিটিউট এবং ডিপ্লোমা মৎস্য ইনস্টিটিউট, ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেদার

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স বন্ধ করে দেয়। বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি দেশে শত কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তিনির্ভর ইনস্টিটিউট বন্ধ করে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি করে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, ভুটান, মালদ্বীপে মৎস্য পশুপালন, লেদার, জুট ইনস্টিটিউট শিক্ষার মান ও গুণগত অবস্থান কি এই তথ্য জানাতে পারেনি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান। এই সাধারণ তথ্য যদি চেয়ারম্যান সাহেবের জানা না থাকে তবেই তো বিদেশ থেকে কৃত্রিম দুধ, রুগ্ন গরু, ফরমালিন মিশ্রিত মাছ, বার্মিজ জুতা, আমদানি করার সুযোগ এসে যায়। দেশ এবং জাতি হয় কারিগরি শিক্ষা-সুযোগ বঞ্চিত।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। এই স্বপ্ন ছিল যুদ্ধ শেষে তারা প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ পাবে। প্রযুক্তিজ্ঞানের মাধ্যমে একটি কাজ পাবে। তাদের শ্রমের বিনিময়ে মাতৃভূমিকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতার ৪৩ বছরের মধ্যে একটি ডিপ্লোমা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে সরকারের নিকট সুপারিশ করতে পারেনি এই দীর্ঘ সময়ে। এ দেশের হাজার বছরে গড়ে ওঠা কুটিরশিল্পগুলোকে রক্ষা করার জন্য কোন কোন বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে পারেনি। অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীতে এসে বিশ্বের অন্যান্য দেশে নতুন কি কি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে তাও অনুসরণ করতে পারেনি। '৭১ সালের পূর্বে বন্ধকৃত মৎস্য, পশুপালন, লেদার প্রযুক্তিবিদ্যা ডিপ্লোমা কোর্স পুনঃচালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উপরন্তু এ দেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতার অহংকার জুট ডিপ্লোমা কোর্সটি বন্ধ করে দিয়ে মানবসভ্যতার আর এক কলঙ্কজনক অধ্যায় সৃষ্টি করে।

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ এবং ডিপ্লোমা শিক্ষার অভাবে একে একে ১৭৩টি জুট মিল বন্ধ হয়। ২য় শিফট শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ করে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করে। এশিয়া মহাদেশে ডিপ্লোমা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার উপর ১৯৭০ থেকে ২০১৪ সালের উপর তুলনা করতে গিয়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ব্যর্থতার এক করুণ চিত্র প্রকাশ পায়। প্রকাশ পায় এ দেশের বেকারত্বের জন্য দায়ী প্রযুক্তিহীন শিক্ষাব্যবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের কর্ণধারেরা উপলব্ধি করেছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানকে পুনর্গঠিত করতে হলে প্রযুক্তি

www.pathagar.com

শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। মাত্র ২ দশকের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা থেকে ডিপ্লোমা শিক্ষার হার ৭০% উন্নীত করে জাপানকে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে অতি উন্নত জাতিতে পরিণত করা হয়। জাপান ও পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, কৃষিবিপ্লব লক্ষ্য করে এশিয়ার অন্যান্য দেশে কর্মমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। ডিপ্লোমা শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রুনাই, চীন, কোরিয়া, ভারত আজ বিশ্ব অর্থনীতির নব্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকার উৎপাদন হচ্ছে কলেজগুলো থেকে। বিশ্বের শিক্ষা উন্নত দেশের কলেজে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। তরুণ শিক্ষার্থীরা মেধানুসারে কারিগরি শিক্ষা নাকি সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করবে তার অবাধ সুযোগ রয়েছে। আমাদের দেশে একটি কলেজেও ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা কোর্স চালু নেই। বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মহীন জীবনযাপন করে। কলেজগুলোতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা কোর্স চালু করা এখন সময়ের দাবি।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্সকে উপেক্ষা করে কলেজগুলোতে ২ বছর মেয়াদি এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্স চালু করেছে, যা প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতি প্রতারণা। এইচএসসি ভোকেশনাল পাস ছাত্রছাত্রীগণ প্রযুক্তিবিদ না সাধারণ শিক্ষিত এর সুনির্দিষ্ট নীতি নেই। উপরন্তু তাদেরকে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদের সাথে অশুভ প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে। ডিপ্লোমা শিক্ষার ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে অনুমোদনহীন অনিয়ন্ত্রিত কিছু প্রতিষ্ঠান রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজারে ডিপ্লোমা শিক্ষার নামে জনগণকে ভ্রান্তধারণা দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত আছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ভুয়া ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দেশ-বিদেশে পেশ করে জাতিকে প্রতারিত করছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা থেকে স্বল্পমেয়াদি ট্রেড কোর্স পরিচালনায় বেশি পারদর্শীতা দেখাচ্ছে। ফলে ডিপ্লোমা ও ট্রেড কোর্স কোনোটিই সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। জাতির এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা ব্যয় সংকোচন করা উচিত। প্রস্তাবিত ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড আমাদের হাজার বছরে গড়ে ওঠা হারানো প্রযুক্তিগুলো খুঁজে বের করবে। ঐসব বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করবে। বিশ্বের প্রতিনিয়ত যেসব প্রযুক্তি আবিষ্কার হচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশে এসব বিষয়ে

www.pathagar.com

ডিপ্লোমা কোর্স চালু হচ্ছে, দ্রুততম সময়ে আমাদের দেশে ঐসব কোর্স চালু করার ব্যবস্থা করবে। যেসব ডিপ্লোমা কোর্স এখনও ৪ বছরে উন্নীত করা হয় নাই সেই সব কোর্সগুলোর সিলেবাসকে আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করে ৪ বছরে পরিণত করে ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থার সুসমন্বয় ঘটাবে। কলেজগুলোতে ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সেসব বিদ্যুৎশাহী ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের উৎসাহ প্রদান করে প্রতিটি উপজেলায় একটি ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা করবে।

বর্তমান প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিন শিফট শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবে। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে এ দেশে ১ কোটি যুবককে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা অর্জনের সুযোগ করে দিবে। তাহলে এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল দ্রুততম সময়ে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে যাবে। দেশ দ্রুত শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, ক্রীড়া, চিকিৎসায় এগিয়ে যাবে। এ দেশের বিশাল জনশক্তি অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদে পরিণত হবে।

দৈনিক আমার দেশ : ১ এপ্রিল ২০০৫

www.pathagar.com

নারী-পুরুষ সমতা সূচক

নারী-পুরুষ সমতার সূচকে বিশ্বের ১৩৬টি দেশের মধ্যে এবার ৭৫তম অবস্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ২০১২ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৮৬তম। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) 'দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ' রিপোর্ট ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। নারী-পুরুষ সমতার সূচকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। গত ২৬ অক্টোবর এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ২০০৬ সাল থেকে এ তালিকা প্রকাশ করে আসছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংগঠন ডব্লিউইএফ।

প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী পঞ্চমবারের মতো এ তালিকার শীর্ষে রয়েছে আইসল্যান্ড। দেশটির নারীরা রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পুরুষদের পাশাপাশি সমানভাবে অংশ নেন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সমঅধিকার ভোগ করেন। দ্বিতীয় স্থানে ফিনল্যান্ড, তৃতীয় স্থানে নরওয়ে ও চতুর্থ স্থানে সুইডেন। এরপর যথাক্রমে ফিলিপাইন, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড ও নিকারাগুয়ার অবস্থান। তালিকায় ব্রিটেনের অবস্থান ১৮তম এবং যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ২৩তম।

সার্কভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। শ্রীলঙ্কা ৫৫তম স্থান নিয়ে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের শীর্ষে রয়েছে। নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যর্থ দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সার্কভুক্ত দেশ পাকিস্তান। এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চীনের অবস্থা খুবই নাজুক। তাদের অবস্থান ৬৯তম। অন্যদিকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপানের অবস্থান ১০৫তম। গত ২৩ সেপ্টেম্বর বুধবার প্রকাশিত জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০১৩ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ) প্রতিবেদনকে ম্লান করে দিয়েছে। এখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বড় বাধা কিশোরী মায়েরা। মোট প্রজনন হার কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সার্বিক সাফল্য আছে। কিন্তু

www.pathagar.com

কিশোরী মায়েদের ক্ষেত্রে প্রজনন হার কমছে না। জনসংখ্যার চাপ কমাতে হলে বাল্যবিবাহ কমাতে হবে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) বলছে, বিশ্বে বাল্যবিবাহের হার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে। ১৮ বছর হওয়ার আগে বাংলাদেশের ৬৪ শতাংশ নারীর বিয়ে হয়। গ্রামে এই হার ৭১ এবং শহরে ৫৪ শতাংশ। 'চাইল্ড ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে এ বছর প্রকাশিত ওই জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষার সঙ্গে বাল্যবিবাহের সম্পর্ক আছে। ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে হওয়া নারীদের ৮৬ শতাংশ নিরক্ষর। কারোরই কর্মবান্ধব শিক্ষা নেই।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা অতীব জরুরি। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে নারীদের অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার উদাহরণ হলো আইসল্যান্ড। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হোক নারী কখনোই ঘরে বসে থাকতে পারে না। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের অংশগ্রহণ অধিকার হয়েছে। সারা বিশ্বে চলছে বাস্তব ও উন্নয়নমুখী নতুন নতুন উদ্ভাবন। এই উদ্ভাবনে পিছিয়ে নেই আইসল্যান্ডের নারীসমাজও। ডব্লিউইএফ প্রতিবেদনের প্রথম স্থান অধিকারী আইসল্যান্ডের নারীদের পেশা নির্বাচনে রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা। আইসল্যান্ডের নারীদের পেশা নির্বাচনে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। দ্বিতীয় স্থানের ফিনল্যান্ড ও তৃতীয় স্থানে নরওয়ে নারী ও পুরুষের কর্মবান্ধব শিক্ষা গ্রহণের হার সমান সমান। সুইডেনে নার্স, ডেন্টাল হাইজিন, ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন কোর্সে শুধু নারীদের প্রবেশ অধিকার থাকাতে পুরুষদের চেয়ে নারীদের ডিপ্লোমা শিক্ষার হার বেশি। এই চারটি দেশ শুধু ডিপ্লোমা শিক্ষায় অগ্রগতির কারণে শীর্ষ দশে অবস্থান করছে।

রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান আমাদের আশান্বিত করলেও এতে আত্মসন্তুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীদের স্বাবলম্বী হতে দেয় না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নারীরা পুরুষের সমমর্যদার অধিকারী হতে পারেননি বা তাদের হতে দেয়া হচ্ছে না। আমাদের সামাজিক অবস্থা এখনও এমন পর্যায়ে রয়েছে যেখানে নারীরা পদে পদে লাঞ্ছিত হন। স্বাভাবিকভাবে সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সমাজে নারীদের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে সম্পূর্ণরূপে, আংশিকভাবে নয়। 'দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ-২০১৩'-এর প্রতিবেদন বাংলাদেশকে এই কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের প্রধান রপ্তানিমুখী গার্মেন্টসশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় ৯০ ভাগ। সস্তা শ্রমে ৮০ শতাংশ নারীকে কাজ করতে হচ্ছে শুধু বেঁচে থাকার জন্য। যাদের আয় ১ ডলালের সামান্য বেশি। উপরন্তু রয়েছে কাজের অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব; পাশাপাশি চরম শোষণ। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প সস্তা শ্রমের জন্য বিখ্যাত। গার্মেন্টস ম্যানুফেকচারিং, সুইং, ফিনিশিং, ডিজাইন ইত্যাদি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স অধ্যয়নের সুযোগ দিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেত অনেকগুণ। বেতনবৈষম্য দূর হতো। লিঙ্গ সমতা অর্জনে ভূমিকা রাখত। গ্রামীণ অর্থনীতির, কৃষি ও কৃষিসহায়ক শিল্পে নারীর ভূমিকা এবং অবদান এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ জনপদের নারীদের পশুপালন, পোল্ট্রি, মৎস্য, দুগ্ধখামার, লেদার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কোল্ডস্টোরেজ, বাজারজাতকরণ শিক্ষায় অধ্যয়নের সুযোগ সময়ের দাবি।

বাংলাদেশে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তা প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক এবং এ ধরনের শিক্ষা দ্বারা নারীরা সুশিক্ষা হতে স্বাবলম্বী হতে পারে না। শিক্ষার পরিধি না বাড়ালে এই গতানুগতিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী জনগোষ্ঠীর দ্বারা দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। পঞ্চাশ বছর আগে ওয়াশিংটন শহরে মার্কিন মানবতাকর্মী রেভারেন্ড ড. মার্টিন লুথার কিং অবহেলিত মার্কিন জনগোষ্ঠীকে আলোর ইশারা দেখিয়েছিলেন ও বলেছিলেন 'আই হ্যাভ এ ড্রিম।' স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের দেশ এই শতকে নারী-পুরুষ সমতায় শীর্ষ দশে অবস্থান করবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম নারীকে তার অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এ সত্য বলে যেতে হবে 'নারী তুমি মানুষ'। মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে হলে নিজেকে জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞায় সামর্থ্যবান করে তোলার জন্য কর্মবান্ধব শিক্ষার বিকল্প নেই।

নারীর পরনির্ভরশীলতা যে দেশ ও সমাজের সৃষ্টি এ সত্যকে উপলব্ধি করে নারীকে কাজের ভুবনে ডুবে যেতে সহযোগিতা করতে হবে। বর্ণিত সব প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হলে নারীদের ডিপ্লোমা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। কর্মবান্ধব ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রশিক্ষণে উদ্দীপ্ত নারীসমাজ লিঙ্গবৈষম্যহীন হবে। সমতাসূচক অগ্রগতিতে আত্মসন্তুষ্টির জন্ম দিবে। বাংলাদেশ সার্বিক সক্ষমতা অর্জনে শীর্ষ স্থান দখল করবে।

দৈনিক জনতা : ৯ ডিসেম্বর ২০১৩

www.pathagar.com

তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব

১৯৪০ সালে জি মনটাগো মরিস 'স্থানীয় সরকার' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দুই পদ্ধতির স্থানীয় সরকার সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগকৃত সংস্থা, যা সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, দায়িত্বাবলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে। 'স্থানীয় সরকার' কোনো এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার।

'ইউনিয়ন পরিষদ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল' এ উল্লেখ আছে, ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে এ দেশের অধিকাংশ গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮৭০ সালে চৌকিদারি আইন পাসের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের শাসন আইনগত ভিত্তি লাভ করে। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের প্রবর্তন করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। ইউনিয়ন কমিটির পাশাপাশি চৌকিদারি পঞ্চায়েতও কাজ করত। ফলে পল্লী অঞ্চলে দ্বৈতশাসন দেখা দেয়।

১৯১৯ সাল বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্তশাসনের অধীনে চৌকিদারি পঞ্চায়েত এবং ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। পাকিস্তান আমলে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৫৯ এর অধীন ইউনিয়ন বোর্ডের নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিল বাতিল করে নামকরণ হয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এবং একজন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৩ ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ হয় ইউনিয়ন পরিষদ। ১৯৮০ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে 'স্ব-নির্ভর গ্রাম সরকার' প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৮৩ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ প্রবর্তনের ফলে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ৯টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত

www.pathagar.com

জনগণের ভোটে ৯ জন সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া এই ৯টি ওয়ার্ডে প্রতি ৩টি ওয়ার্ড এলাকা থেকে ১ জন করে মোট ৩ জন (সংরক্ষিত) নারী সদস্য নির্বাচিত হন এবং সমগ্র ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই ১৩ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ।

১৯৯৬ সালে যে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রতিটি ইউনিয়নে তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একজন নারী সদস্য নির্বাচনের বিধান করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়নে নারী সদস্যদের জন্য রয়েছে তিনটি সংরক্ষিত আসন এবং সদস্য নারী-পুরুষ সবার ভোটে নির্বাচিত হচ্ছেন। ১৯৯৮ সালে নারী সদস্যদের জন্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয় কিছু কর্মপরিধি।

ইউনিয়ন পরিষদের একজন নির্বাচিত নারী নেত্রীর পাখপাখালির কলতানে ঘুম ভাঙতেই শুরু হয় নিত্যদিনের কর্মসূচি। সাংসারিক নানা দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় এলাকার জনমানুষের আনাগোনা। একজন গৃহিণী হিসেবে যেমন তাকে স্বামী-সন্তানসহ সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিবিড়ভাবে দেখতে হয় তেমনি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেখতে হয় তার নির্বাচনী এলাকার প্রতিটি মানুষের বিভিন্ন সমস্যা আর উন্নয়নের দিক। নির্ধারিত তিনটি ওয়ার্ডের বিস্তৃত এলাকার জনগণকে সেবা দেয়ার জন্য এবং নানা সমস্যা সমাধানের জন্য দিনভর ছুটে চলতে হয় এই নারী নেত্রীকে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক যোগাযোগ, সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচিতে অংশ নেয়াসহ নানা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অত্যাবশকীয়।

রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যেমন নারী-পুরুষের সক্রিয় সম-অংশগ্রহণ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্বের। যোগ্য নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন মেধা, দক্ষতা, জ্ঞান, সাহসিকতা এবং সততাসহ আরো অনেক বৈশিষ্ট্যর। তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় নেতৃত্ব বিকাশের এবং রাজনীতিচর্চার অন্যতম প্লাটফর্ম হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। এখান থেকেই হাতে-কলমে প্রশিক্ষিত হয়ে এবং মাটি ও মানুষের অনেক বেশি কাছাকাছি থেকে গড়ে ওঠে দক্ষ নেতৃত্ব।

২০১১ সালে ২৯ মার্চ থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত ৮ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল বিভাগের ২৪টি জেলায় ৫৫৩টি উপকূলীয় ইউনিয়ন, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩১ মে থেকে ৫ জুলাই ৩ হাজার ৮১৩টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন

www.pathagar.com

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে ৪৩৬৬ ইউনিয়ন পরিষদের ৪৩৬৬x৩= ১৩০৯৮ জন বৈধ নারী প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচিত হন।

ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ ৮ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করে নারী প্রার্থীদের প্রতি জাতি বিমাতাসুলভ আচরণ করেছে। ১ জন পুরুষ প্রার্থী ১টি ওয়ার্ডে নির্বাচন প্রচার অভিযান চালান। অন্য দিকে একজন নারী ৩টি ওয়ার্ডে রাত-দিন বিরামহীনভাবে নির্বাচন প্রচারণা করেন। নির্বাচনী ব্যয় পুরুষ প্রার্থীর তিনগুণ।

বাঙালি নির্বাচনপ্রিয় জাতি। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও পিছিয়ে নেই। ৮ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৪৩৬৬ টি ইউনিয়নে ১৩ হাজার ৯৮টি পদে ৫২ হাজার ৩৯২ জন প্রাপ্তবয়স্ক নারী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। পাহাড়সম বাধা পেরিয়ে আমাদের নারীরা ঘরে-বাইরে অবদান রাখছেন। তৈরি পোশাকশিল্প, চিংড়ি চাষ, চাতাল নির্মাণ, কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীশ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এরই প্রতিফলন দেখতে পাই ৮ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক নারী প্রার্থীর অংশগ্রহণে।

নারী সদস্য প্রার্থীরা ছিল অর্থনীতিতে এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এক হিসাবে দেখা যায়, মোট নারী প্রার্থীর মধ্যে ৪৭ হাজার ১২ জন ছিল স্বামীর উপর নির্ভরশীল। ৪ হাজার ১২ জন ছেলের উপর, বাকি ১৩৬৮ জন রাজনৈতিক বা এনজিওর উপর নির্ভরশীল। তাঁদের অধিকাংশেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ৫ম-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত। তাঁদের বৈধ পথে আয় উপার্জন ও পেশায় প্রবেশের কোনো প্রকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছিল না।

২০১১-১৫ পর্যন্ত কার্যকালের জন্য দেশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহ নিজ নিজ ইউনিয়নের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ, পয়ঃনিষ্কাশন, নিরাপদ পানীয় জল, আবাসন প্রভৃতি উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদকে ১০টি বাধ্যতামূলক ৩৮টি ঐচ্ছিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে প্রযুক্তিজ্ঞানহীন, স্বামীর উপর নির্ভরশীল স্বল্পযোগ্যতা সম্পন্ন নারী মেম্বারগণ নির্ধারিত বাধ্যতামূলক ও ঐচ্ছিক দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শিকার হতে হয় নানা প্রতিবন্ধকতার। এই প্রতিবন্ধকতা ঘরে-বাইরে সমানভাবে বিদ্যমান। প্রযুক্তিহীনতার কারণে নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাড়াটিয়া এনজিওদের কাছে নাস্তানাবুদ হচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

www.pathagar.com

নারীর সামজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে নারীমুক্তির মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে পারেন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যগণ। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যরা শিক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে হবে। স্বামী-ছেলের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেকে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। এর জন্য কৃষি, দুগ্ধ খামার, তাঁত, আমিনশিপ, সাংবাদিকতা, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, নার্সিং প্রযুক্তিবিদ্যার ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করতে হবে। নতুবা মুক্তির অখণ্ড বেড়াজালে আটকা থাকতেই হবে।

এ কূপমণ্ডূক সংকীর্ণমনা থেকে বাংলাদেশ ও বাঙালিকে তার মৌল চেতনার জায়গায় দাঁড় করাতে প্রয়োজন নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস। বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড উপর্যুক্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে।

দৈনিক বণিক বার্তা : ১৭ আগস্ট ২০১২

www.pathagar.com

উত্ত্যক্তকরণ প্রতিকারে কর্মসংস্থান

হাজার সমস্যাজর্জড়িত সোনার বাংলা। যত না প্রাকৃতিক তার চেয়ে বেশি মানবসৃষ্ট। মানবপাচার, হত্যা, এসিড নিক্ষেপের সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ইভটিজিং। ইংরেজি (ইভ) শব্দের অর্থ কবিতায় সন্ধ্যাকাল বুঝায়। কোনো ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব সময়কেও বুঝায়। ইংরেজি (টিজ) শব্দের অর্থ বিরক্ত করা, জ্বালাতন করা, ইত্যাদি বুঝায়। (ইভ টিজিং) এর অর্থ দাঁড়ায়—কোনো ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব সময়ে বিরক্ত করা, জ্বালাতন করা। ইভটিজিংয়ের সংজ্ঞা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কোনো নারীকে ধর্ষণ, উত্ত্যক্তকরণ এবং হত্যাকরণকে বোঝায়। ইভটিজিং হলো নারীদের প্রতি 'টিটকারি মারা' বা যৌন হয়রানি করা। বর্তমান সময়ে ভয়াবহ অপরাধগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি। আদালত ইভটিজিং শব্দটির নাম দিয়েছে উত্ত্যক্তকরণ।

ইভটিজিং যৌন নির্যাতন অথবা উত্ত্যক্তকরণ যা-ই বলা হোক না কেন প্রতিনিয়ত এর ভয়াল থাবায় থমকে যাচ্ছে অজস্র স্বপ্ন, নিভে যাচ্ছে জীবনপ্রদীপ, শঙ্কাগ্রস্ত হচ্ছে হাজারো পরিবার।

নির্মম এক বাস্তবতায় দিন কাটাচ্ছি আমরা। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেতা নারী, যে দেশের নারী এভারেস্ট জয় করতে পারে সে দেশের নারীরাই অবহেলিত। নারীরা ভালো নেই, নিরাপদে নেই। ঘরে, রাস্তায়, স্কুলে, অফিসে, বাসায়, রিকশায় সব জায়গাতেই শিকার হতে হয়ে ইভটিজিংয়ের। ছোট্ট মেয়েশিশু থেকে প্রৌঢ় মা—কেউই রেহাই পাচ্ছে না এ ভয়াবহতা থেকে। সব বয়সের পেশার, সব নারী হচ্ছে এর শিকার।

ইভটিজিং বিষয়ে আজকাল জেলা-উপজেলা সদর তো বটেই গ্রামের রাস্তাঘাটেও এখন বখাটেদের উৎপাত বেড়ে গেছে। এদের মুখে কোনো লাগাম থাকে না। চলনে-বলনে থাকে না সভ্য-ভদ্রতার চিহ্ন। তাদের চাল-চলন দেখে মনে হয়, এরা সুস্থ-সুন্দর ও সংযত আচার-ব্যবহার করে চলার কোনো দীক্ষা বা উপদেশ জীবনে কারো কাছ থেকে পায়নি। এরা উগ্র এবং

www.pathagar.com

অস্থির। এরা বয়েসী কিংবা নিজেদের চেয়ে কম বয়েসী পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের কোনো পাঠ যেন জীবনে নেয়নি। এই শ্রেণীর তরুণেরা প্রায় নানান সমাজবিরোধী কাজে নিজেদের যুক্ত রাখে। এরা শুধু অসহায় মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে তাদের নির্মল জীবনকে বিষিয়ে তুলছে না, চুরি ডাকাতি-সন্ত্রাসসহ নানা সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গেও এরা যুক্ত। এদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মানবিক গুণাবলির অধিষ্ঠান নেই। এরা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হলে নানান পাশবিক কায়দায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। পাড়া-মহল্লায় প্রভাব বিস্তারের জন্য এরা সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বাংলাদেশে ইভটিজিংয়ের যে পরিসংখ্যান ফুটে উঠেছে তা উদ্বেগজনক। সমাজের ৯১.৩ শতাংশ নারী জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে এক বা একাধিকবার ইভটিজিংয়ের শিকার হয়েছেন। এ হার সবচেয়ে বেশি ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে। ওই বয়সী ৮৭ শতাংশ বখাটেদের উৎপাতের শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে। ৬০ শতাংশ মেয়ে মোবাইল ফোনে ইচ্ছাকৃত মিসড কল এবং অশালীন মেসেজ প্রাপ্ত হয়। এছাড়াও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি ছড়িয়ে দেয়ার অবমাননাকর অবস্থার শিকার হয়েছে ১০.৮ শতাংশ।

ইভটিজিং আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অংশ নয়। এই যৌন অনাচারের সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের মূল্যবোধ, জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতির কোনো পরিচয় কিংবা মেলবন্ধন কখনো ছিল না। পাশ্চাত্যের নৈতিকতাবিহীন যৌনসংস্কৃতিতে এ আপদের সংস্কৃতায়ন শুরু হয় এবং তা ক্রমে আমাদের সমাজেও অনুপ্রবেশ করে। ক্রমপরিহারের কারণেই মূলত নারীসমাজ এই ইভটিজিং নামক যৌননিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

ইভটিজিং প্রতিরোধে সরকার, বিভিন্ন সংস্থা, সচেতন নাগরিকসমাজ এগিয়ে এলেও ইভটিজিংয়ের নামে যৌননিপীড়নের ঘটনা বেড়েই চলছে। ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় আমাদের দেশে শিক্ষকসহ অনেকেই প্রাণ দিয়েছেন বখাটেদের হাতে, যা আমাদের সবাইকে নাড়া দিয়েছে কঠিনভাবে। বর্তমানে ইভটিজিংয়ের ঘটনা বাড়ছে তাতে এ দেশের যে কোনো পিতামাতা, অভিভাবক সার্বক্ষণিক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনাতিপাত করেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সবচেয়ে নিরাপদ মনে করেন যে জায়গাটিকে, সে নিরাপদ স্থান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও মুক্ত নয় ইভটিজিং থেকে। ইভটিজিংয়ের শিকার ৮৭ শতাংশ মেয়েই স্কুল ও কলেজের ছাত্রী। তারা স্কুল কলেজে যাতায়াতের পথে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়।

www.pathagar.com

ইভটিজিং থেকে রক্ষা পেতে স্কুল কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে অনেক ছাত্রীই। কেউ কেউ নিজেই বন্ধ করছে। কাউকে বাধ্য করছেন তার পিতা মাতা। কারণ লেখাপড়ার চেয়ে মেয়ের জীবন বড়। পিতামাতা সার্বক্ষণিক উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন। কখন কি ঘটে। মেয়ের উত্ত্যক্ত হওয়ার ঘটনা জেনে বাবা হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। ছেলেমেয়ের সামনে মাও যখন টিজিংয়ের শিকার হন তখন তা মানসিক অশান্তি আরো বাড়িয়ে দেয়।

এক অশান্তি আরেক অশান্তি নিয়ে আসে। এক দুঃখের পর আরেক দুঃখ এটাই যেন নিয়তি। ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে যখন কোনো মেয়ে ঘটনাটি তার পরিবারকে জানায় তখন শুরু হয় অন্যরকম সমস্যা, যার নাম কলহ-বিবাদ। মেয়েটির সাথে পরিবারের সদস্যরাই বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। তাকে ভুল বুঝতে শুরু করেন।

২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০(২) ধারায় বলা হয়েছিল, কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীর শ্লীলতাহানি করলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন হয়রানি এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক ৭ বছর কিন্তু অন্যূন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ইভটিজিং এর ফলে কেউ আত্মহত্যা করলে ইভটিজিংকারী অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আত্মহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে লঘু শাস্তি প্রদান করা হয়। এভাবে নারীরা আইনগত নানা জটিলতার সম্মুখীন হয়ে আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং আইনের সুস্পষ্ট সংজ্ঞার অভাবে তাদের উপর সংঘটিত নির্যাতনের সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

যৌন হয়রানি বন্ধ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট এ ধারা প্রয়োগ করে অপরাধীকে ঘটনাস্থলে বিচার করে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডসহ উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারছেন। বখাটেদের উৎপাত বন্ধ করতে দেশব্যাপী মেয়েদের স্কুলের সামনে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা আছে। এর পরেও এহেন গর্হিত কাজ বন্ধ হয়নি। যুবকদের প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান, সামাজিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই ইভটিজিং প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

দৈনিক সংবাদ : ২৩ মার্চ ২০১৪

www.pathagar.com

প্রশিক্ষিত ও পর্যাপ্ত নার্সেস সেবা

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ নারী ছিলেন। তিনি আধুনিক নার্সিংয়ের অগ্রদূত। তিনি ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বহু সৈন্য আহত হয়। সেই আহত সৈন্যদের সেবা করার জন্য তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যান। সেখানে তিনি দৃষ্টান্তমূলক ও গঠনমূলক সেবা কর্মতৎপরতায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক সৈন্যদের আহত ও মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করেন। আহত সৈন্যদের সেবা করার সময় রাতে তিনি একটি বাতি নিয়ে রোগীর পাশে পাশে গিয়ে কুশলাদি বিনিময় করতেন। এই অদ্ভুত দৃশ্য আহত সৈন্যদের সহানুভূতিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল সাদা পোশাকে বাতি হাতে এক রোগী হতে অন্য রোগীর কাছে যাওয়ার সময় তাকে আন্তরিকভাবে সৈন্যরা শ্রদ্ধা জানাত। ফলে তাকে লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প উপাধিতে ভূষিত করে।

যুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডের রানী তাকে 'নাইট' উপাধিসহ অনেক অর্থ পুরস্কার হিসেবে প্রদান করেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সেই অর্থ দ্বারা ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে একটি নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিষ্ঠিত নার্সিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র/ছাত্রীদের শপথবাক্যগুলো এই রকম— আমি নিষ্ঠার সহিত সৃষ্টিকর্তার নিকট শপথ করিতেছি যে, আমি পবিত্রতার সহিত জীবনযাপন করিব এবং বিশ্বস্ততার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিব। আমি যাহা কিছু অন্যায় ও অশুভ তাহা হইতে বিরত থাকিব এবং জ্ঞাতসারে ক্ষতিকর কোনো ওষুধ নিজে গ্রহণ করিব না এবং অপরকে দিব না। আমি আমার সর্বশক্তি দ্বারা আমার পেশার মান উন্নত রাখিব এবং আমার কার্য উপলক্ষে যে সমস্ত ব্যক্তিগত বিষয় আমা জ্ঞাত হইবে তাহার গোপনীয়তা রক্ষা করিব। আমি সততার সহিত চিকিৎসককে তাহার চিকিৎসা কার্যে সহযোগিতা করিব এবং আমার সেবাধীন রোগীদের কল্যাণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিব।

www.pathagar.com

ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে তিনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নার্সিং পেশার উদ্ভাবন করেন। মানবতার সেবায় এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

প্রতি বছর সারা বিশ্বব্যাপী ১২ মে আধুনিক নার্সিং পেশার রূপকার ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মতারিখকে স্মরণীয় করে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস পালন করা হয়।

নার্সিং এমনই একটি পেশা, যেখানে কর্মরত সেবিকাদের ভূমিকা অত্যন্ত বিস্তৃত। শ্রম বিনিয়োগ, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা, জন্মহার হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, অন্যদিকে রোগ নিরাময়, রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পুনর্বাসন, হাই ডিপেনডেন্সি কেয়ার ও মৃত্যু পথযাত্রী রোগীদের সেবা প্রদানসহ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য টিমের অন্য সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসাবে নার্সগণ কাজ করে থাকেন।

অথচ বাংলাদেশের চিকিৎসাসেবায় বড় গলদ নার্স সংকট। প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় দুই লাখ নার্স কম, ঘাটতি পূরণে কোনো উদ্যোগ নেই। ফলে এখানকার হাসপাতাল বা ক্লিনিকে রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা না পাওয়াই স্বাভাবিক। অন্যদিকে বাংলাদেশের চিকিৎসাসেবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাতে বড় বাধা হয়ে আছে নার্সের ব্যাপক ঘাটতির বিষয়টি।

মানসম্পন্ন সেবা ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ করতে হলে অবশ্যই রোগী, ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যাগত সমন্বয় সাধন করা জরুরি। বিশেষ করে হাসপাতালে ডাক্তাররা যতই রোগীর চিকিৎসা দিক না কেন, নার্সদের সেবা ছাড়া ওই চিকিৎসা পূর্ণতা পাবে না। নার্সের অত্যধিক স্বল্পতার সুযোগে সাধারণ স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন গ্রামের সহজ সরল বেকার যুব ও যুব তরুণীদের ধরে এনে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে নার্স হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। একদিকে তাদের অনভিজ্ঞতা, অন্যদিকে অর্থ উপার্জনের প্রবণতা পুরো নার্স সম্প্রদায়ের কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত হচ্ছে। বাংলাদেশে নার্সিং কাউন্সিলের উপর ডিপ্লোমা নার্সিং প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত। নার্সিং কাউন্সিল বিগত দিনে দেশের চাহিদার পর্যাপ্ত সংখ্যক ও গুণগত মানের নার্স প্রশিক্ষণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। নার্সিং কাউন্সিল স্বাধীনতার ৪৪ বছরে নার্সিং ইনস্টিটিউটে ছাত্রী ভর্তির একটি বৈজ্ঞানিক নীতিমালা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতি বছর নার্সিং ভর্তির নীতিমালা পরিবর্তন করা হয়। অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদেরকে নার্সিং কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করে।

www.pathagar.com

চলমান ৬টি ব্যাচের ভর্তি নীতিমালা ভিন্নরকম। এক বছর এসএসসি বিজ্ঞান বিভাগ কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর, পরের বছর এসএসসি পাস বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য বিভাগে কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর, এর পরের বছর এসএসসি পাস কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর, এর পরের বছর এইচএসসি পাস কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর। গত বছর ভর্তি হয়েছে এইচএসসি পাসে কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর। ফলে দেশ বিদেশে বাংলাদেশের নার্সিং কাউন্সিল প্রদত্ত ডিপ্লোমা সনদের মান নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কর্মজীবনেও বেতন স্কেল, ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশন, পেনশন উচ্চশিক্ষা গ্রহণে নানাবিধ ঝামেলা পোহাতে হয়। পৃথিবীর সব দেশেই নার্সিং কাউন্সিল, নার্সিং সেবার 'প্রফেসনাল কোড অব কন্‌ডাক্ট' নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানটি একই সাথে প্রফেশনাল কোড অব কনডাক্ট ও নার্সিং ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার ফলে উভয়ক্ষেত্রে ব্যাপক গোঁজামিল ও অপচয় নিয়ে চলছে দেশের নার্সিং ও চিকিৎসাসেবা। নার্সদের 'জব ডেসক্রিপসন' তৈরি করতে পারেনি নার্সিং কাউন্সিল। শিক্ষাউন্নত সব দেশেই ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে নার্সিং কলেজে পরিচালিত নার্সিং কোর্স পরিচালনা করে বিশ্ববিদ্যালয় আর ডিপ্লোমা কোর্স নিয়ন্ত্রণ করে নার্সিং কাউন্সিল। নার্সিং সেবার অব্যবস্থাপনার কারণে চিকিৎসাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দর্শন আর স্বাস্থ্যসেবার কাঙ্ক্ষিত সূচক ও মানদণ্ড প্রচণ্ডভাবে নিম্নগামী হয়ে গেছে। চিকিৎসার মূলমন্ত্র ও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকথার সঙ্গে দেশের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য খাতের বিদ্যমান ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাচিত্রে তৈরি করেছে বিস্তর ফারাক। বাস্তবে মিলছে না চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য চাহিদার প্রচলিত স্লোগানের সঙ্গে মানুষের বাস্তব প্রত্যাশা।

বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির সাথে সাথে সেবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও সাধিত হয়েছে ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রগতি। জনস্বার্থে নার্সিং পেশার উন্নয়নে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। ঔপনিবেশিক আমলে প্রতিষ্ঠিত নার্সিং কাউন্সিল থেকে নার্সিং শিক্ষা কার্যক্রম পৃথক করে প্রস্তাবিত বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা জরুরি। যে বোর্ড স্বল্প সময়ের মধ্যে একদল সুদক্ষ নার্সেস বাহিনী উপহার দিবে। সুস্থ সবল জাতি গঠন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীলতা বাড়ার পদক্ষেপ হবে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস পালনের যথার্থতা।

প্রথম আলো : ১৩ মে ২০১৪

www.pathagar.com

অন্তত একটি হাসপাতাল হোক আন্তর্জাতিকমানের

চিকিৎসাক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং ভোগান্তির বিভিন্ন মাত্রার কাছে পর্যুদস্ত হয়ে সাধারণ মানুষ এখন রোগমুক্তি নিয়ে অন্তহীন দুর্ভাবনায় রয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে ছোটা সঙ্গতি, সীমাবদ্ধতা বলেই তারা সরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়। সামর্থ্য যাদের আছে তারা বেসরকারি হাসপাতালকেই ভরসা হিসেবে দেখে এবং প্রয়োজন হলেই বিদেশেও ছুটে যেতে পারে সুস্থতার সন্ধানে। দেশের ভিআইপিগণ চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা নেয়ার কথা ভাবেন না। স্বাস্থ্য চেকআপ বিষয়টিও হরহামেশায় বিমান নির্ভরতার গন্তব্যে সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে ২০ লাখ মানুষ চিকিৎসার জন্য বিদেশে গমন করেন। এতে বছরে ব্যয় হয় ৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থ বিবেচনা ছাড়াও জাতি হিসেবে এটি অবমাননার বিষয়। ভুক্তভোগী রোগী এবং তাদের অনেক পরিবারের অভিযোগ, দেশের অধিকাংশ হাসপাতালেই চিকিৎসার নামে রোগীর জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলে। বাংলাদেশের এই ব্যয়বহুল ও অনাদরের চিকিৎসার প্রতি মানুষের আস্থা নেই। সাধারণত সরকারি হাসপাতালে গরিব রোগীরা গিয়ে থাকে। গরিব রোগীদের অর্থবিত্ত নেই, ডাক্তার ও হাসপাতালের স্টাফদের/তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শিকার হতে হয় চরমভাবে। গ্রামগঞ্জে ও জেলা শহরের হাসপাতালের অবস্থা আরো ভয়াবহ। এ নিয়ে প্রতিদিন কোনো না কোনো পত্রিকার শিরোনাম হয়।

১৯৭৪ সালের ২৮ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনে পিত্তথলির অপারেশনের মাধ্যমে ভিভিআইপিদের বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণের যাত্রাপথ উন্মুক্ত করেন। এরপর থেকে যত দিন যাচ্ছে ততদিনই এই পথযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাক, কান, গলা নিয়মিত চেকআপ করেন আমেরিকায়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পায়ের ব্যথার চিকিৎসা করেন সৌদি আরবের কিং

www.pathagar.com

ফাহাদ হাসপাতালে। সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জন্য সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল নির্ধারণ করা আছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিচারপতি, উচ্চপদের আমলা এরা সবাই দেশের ভিআইপি ব্যক্তি। বাংলাদেশে এদের চিকিৎসা নেই, করাতেও চান না। বাংলাদেশের ১৯তম রাষ্ট্রপতি ৮৪ বছর বয়সী বর্ষীয়ান জননেতা মো. জিল্লুর রহমান। তার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ হতে কয়েক হাজার মাইল দূরে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ থাইল্যান্ডের ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিরবিদায় নেন। খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে মারা যান। প্রবীণ জননেতা আবদুল জলিলের মৃত্যু হয় বিদেশে। প্রখ্যাত রাজনীতিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক আবদুর রাজ্জাকের জীবনাবসান ঘটে লন্ডনে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কলকাতার হাসপাতালে। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বেলভিউ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক শিক্ষক ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এরশাদুল বারী মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। এই তালিকা আরো দীর্ঘ করা যায় অবলীলায় অনায়াসে। বিদেশে চিকিৎসার নামে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতারণারও শিকার হচ্ছেন দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষ। অথচ এ বিষয়ে উদাসীন সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীন ও ভারতের কিছু নামকরা হাসপাতালের নামে ঢাকা চট্টগ্রামে সাব অফিস খুলে অবাধে প্রতারণা করেছে হাসপাতালগুলো।

৫৬ হাজার বর্গমাইলের ক্ষুদ্র বাংলাদেশে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, ৩২টি সরকারি ও ৬৭টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৮টি বিশেষায়িত চিকিৎসা ইনস্টিটিউট, ৬৪ জেলায় জেনারেল হাসপাতাল, উপজেলা, ইউনিয়নে ছোট বড় ৪ হাজার হাসপাতাল ও ক্লিনিক বিদ্যমান এই সব হাসপাতালে ৬০ হাজার নিবন্ধিত চিকিৎসক রয়েছে। দেশসেরা মেধাবীরা চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। প্রতি বছর স্বাস্থ্য খাতে জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তারপরও কেন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এ দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখতে পারছেন না।

www.pathagar.com

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র পড়লে সহজেই অনুধাবন করা যায়, একটি দেশকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ডা. মাহাতির মোহাম্মদের ওপেন হার্ট সার্জারি প্রয়োজন পড়ে। বিদেশ একমাত্র ভরসা। তিনি তা করলেন না। দেশেই ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন। হলোও তাই। এরপর থেকে মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা বিশ্বের অনুপ্রেরণা ও মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাজে বসবাসকারী সকল স্তরের মানুষের জন্য বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোর শিক্ষাবঞ্চিত অসচেতন ও অর্থ-সামর্থ্যহীন জনগণের জন্য ক্যান্সার নামক রোগটি আজও ঘাতকব্যাধি হিসেবে বিবেচিত। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে জনগণের স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা, দ্রুত চিকিৎসার সুযোগ এবং আর্থিক সচ্ছলতা থাকার ফলে ঐসব দেশের বাসিন্দারা প্রাথমিক অবস্থাতেই ক্যান্সার সংক্রমণের প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ প্রক্রিয়ার আওতায় নিজেদের মুক্ত করতে পারে। ফলে, ঘাতকব্যাধি হলেও উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে রোগমুক্ত সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ক্যান্সার পরিস্থিতির যে চিত্র আছে তা থেকে দেখা যায়, এ দেশে প্রতিবছর ৭ হাজার শিশুসহ প্রায় ২ লক্ষেরও বেশি মানুষ ক্যান্সার আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে ৫০ হাজারেরও বেশি মারা যায় বিনা চিকিৎসায়। নতুন করে ক্যান্সার আক্রান্ত ২ লাখ রোগীর মধ্যে ১ লাখ ৮০ হাজার রোগীই চিকিৎসার বাইরে থেকে যাচ্ছে। আর চিকিৎসা পাচ্ছে বছরে মাত্র ২০ হাজার নতুন রোগী। অনকোলজি ক্লাব, ঢাকা আহছানিয়া মিশন হাসপাতাল, ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে। এই রোগ নির্ণয়ে প্রথম কাজ বায়োপসি পরীক্ষা। দেশে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট প্যাথলজির অভাবে সাধারণ মানুষ এ দেশে এখনো ক্যান্সার শনাক্তকরণ ব্যবস্থাদির সুযোগ সহজে ও স্বল্পব্যয়ে গ্রহণ করতে পারে না। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য মেডিকেল ফিজিসিস্ট, রেডিওথেরাপিস্ট ও মেডিকেল টেকনোলজিস্ট সমন্বয়ে টিম দরকার। এক্ষেত্রে মেডিকেল ফিজিসিস্ট রশ্মি প্রয়োগের জন্য টিপিএস ব্যবস্থায় ছক তৈরি করবেন, রেডিওথেরাপিস্ট সিটিস্ক্যানারের মাধ্যমে ক্যান্সার শনাক্ত করবেন এবং মেডিকেল ফিজিসিস্ট ও রেডিওথেরাপিস্টের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (রেডিওথেরাপি) রশ্মি প্রক্ষেপণ করবেন। এসব চিকিৎসার জন্য দেশে কমপক্ষে ৬০০ মেডিকেল ফিজিসিস্ট এবং এক হাজার রেডিওথেরাপিস্ট প্রয়োজন। কিন্তু আছে মাত্র ৬০-৭০ জন রেডিওথেরাপিস্ট

www.pathagar.com

আর ২০ জনের মতো মেডিকেল ফিজিসিস্ট। সরকারিভাবে একজনও নেই। বর্তমানে রোগ নির্ণয় সঠিক প্যাথলজি ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। আগে রোগীর নাড়ি দেখে, হাঁটাচলা দেখে রোগ নির্ণয় সম্ভব হলেও এমন এটা প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে যে কোনো রোগ নির্ণয়ের পূর্বশর্ত হলো রোগীর সঠিক রোগের ইতিহাস, ফিজিক্যাল পরীক্ষা এবং সর্বশেষে বিভিন্ন ডায়াগনোস্টিক পরীক্ষা। এ তিনটির সমন্বয় ছাড়া বর্তমানে কোনো রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং পরবর্তী ফলোআপ সম্ভব নয়।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্বে থাকা পর্যাপ্ত মেডিকেল টেকনোলজিস্টের অভাবে সারা দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে চিকিৎসাব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার বৃদ্ধি পেলেও মেডিকেল টেকনোলজিস্টের সংখ্যা বাড়ছে না। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ করে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টার নন-টেকনিক্যাল লোক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এতে চিকিৎসার মান যেমন কমে যাচ্ছে, তেমনি বাড়ছে, ভুল চিকিৎসার আশঙ্কা। ভুল রিপোর্টের কারণে প্রায়ই ঘটছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

এক্স-রে সংশ্লিষ্ট ও যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্বে থাকা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট রেডিওলজি। দেশে আন্তর্জাতিকমানের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট একজনও তৈরি করা হয়নি। দেশে নার্সের অভাব আরো প্রকট। মানসম্পন্ন চিকিৎসার জন্য ১ জন ডাক্তারের বিপরীতে নার্স থাকা উচিত ৩ জন। অথচ আমাদের দেশে উল্টো, ২ জন ডাক্তারের জন্য রয়েছে একজন নার্স। পৃথিবীর সবদেশে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে বোর্ড কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের দেশে নার্সিং ডিপ্লোমা নিয়ন্ত্রণ করে নার্সিং কাউন্সিল। জেলা উপজেলা নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হলে নার্সিং শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত করা অতি জরুরি। গুণগত মানের চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতাল, চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ওষুধের সাথে আনুষঙ্গিক হলো আধুনিক যন্ত্রপাতি। প্রায়ই শোনা যায় সরকারি হাসপাতালে মূল্যবান যন্ত্রপাতি আছে, তবে তা কাজ করছে না। অকেজো হয়ে বাক্সবন্দি পড়ে আছে। বাংলাদেশে ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রো মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার অভাবে কোনো মেডিকেল যন্ত্র কারখানা গড়ে ওঠেনি। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত মূল্যবান যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি।

সমস্ত বাধা দূর করে একটি রাষ্ট্র, একটি দেশ, একটি সরকার কি পারে

www.pathagar.com

না ভিআইপি ব্যক্তিদের চিকিৎসার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে? সিঙ্গাপুরের একটি প্রাইভেট হাসপাতাল যা পারছে, তা কি পুরো বাংলাদেশ করতে পারে না? দেশে একটি হাসপাতাল দাঁড় করানো যেতে পারে যেখানে রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমপি, বিরোধীদলীয় নেত্রী, উচ্চপদের আমলা এবং অন্য রাজনীতিবিদদের চিকিৎসার পূর্ণ ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসের প্রাক্কালে জাতির প্রত্যাশা অন্তত একটি হাসপাতাল হোক আন্তর্জাতিকমানের। দেশের চিকিৎসা আশা আকাঙ্ক্ষা ও নির্ভরতার প্রতীক।

দৈনিক সংবাদ : ৭ এপ্রিল ২০১৪

www.pathagar.com

আমাদের শিশু মুক্তিযোদ্ধা

একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ বাঙালিদের ওপর অমানুষিক বর্বর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। সেই হত্যার যজ্ঞ চলেছিল গোটা নয় মাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ২৬ মার্চ। স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় ২৫ মার্চ গভীর রাত থেকে। সশস্ত্র ও গেরিলাযুদ্ধ শুরু হয় হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ সাত কোটি মানুষ। রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ শহীদ হয়।

আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশের প্রতিটি পত্রপত্রিকা বিশেষ প্রকাশনার আয়োজন করে। এসব সংখ্যায় দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিজেদের মতো করে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ আকুতি প্রকাশ করে থাকেন।

১৯৭১ সালে আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা নিয়ে মুক্তিপাগল মানুষ এ দেশকে শত্রুমুক্ত করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে যার যার অবস্থান থেকে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীকে হত্যা, আহত ও বন্দি করে। পাকহানাদার বাহিনীর গুলিতে দেশমাতৃকার সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে। মুক্তিযোদ্ধারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। আগামী প্রজন্ম সশ্রদ্ধচিত্তে তাদের অবদান স্মরণ রাখবে। মা-বোনেরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, নিরাপদ স্থানে আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদান করে। সাংস্কৃতিককর্মীরা রণসংগীত গেয়ে এবং ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যোগায়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান আপনজনকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে। সাংবাদিক বন্ধুরা যুদ্ধের ময়দানে মুক্তিযোদ্ধাদের জয়, হানাদার বাহিনীর নরহত্যা, নারী নির্যাতন বিশ্ববাসীকে জানিয়ে পাকসেনাদের মনোবল ভেঙে ফেলে।

২৬ মার্চ ২০১২ প্রথম আলো ১৩ পৃষ্ঠায় 'সেন্টার ফর বাংলাদেশ

www.pathagar.com

লিবারেল ওয়ার স্টাডিজ' চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভূঁইয়া 'আমাদের শিশু মুক্তিযোদ্ধারা' শিরোনামে তীরধার লেখনী লেখেন। এর মাধ্যমে শিশু মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের ইতিকথা তুলে ধরেছেন। ৪১ বছর পরও তা শুনলে শরীর শিহরে ওঠে। সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরি হতে পেরে আমরা অহংকার বোধ করি। মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার প্রবন্ধটি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড ও যতনে সংরক্ষণ করে দু'কলম লেখার প্রয়োজন বোধ করছি।

সেইসব শিশুর অকৃত্রিম দেশপ্রেম, মাতৃভূমির প্রতি স্বার্থহীন জীবনত্যাগ দেশকে করেছে হানাদারমুক্ত। ১৬ ডিসেম্বর পড়ন্ত বিকালে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম যুদ্ধে পরাজিত সেনাপতি উন্মুক্ত আকাশের নিচে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মুক্তিযুদ্ধে শাণিত বীরশিশুদের বিজয় লাভের পর সঠিক পরিকল্পনায় পেশাভিত্তিক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা প্রয়োজন ছিল। বিমান তৈরি, বিমান চালনা, জাহাজ তৈরি, জাহাজ চালনা, সাবমেরিন তৈরি, সাবমেরিন পরিচালনা, রকেট তৈরি, অ্যাটমিক এনার্জি, মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল ইনস্ট্রুমেন্ট টেকনোলজি, রেডিওথেরাপি, ক্যান্সার প্রযুক্তিবিদ, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, দাবা, অ্যাথলেটিক, সাঁতার শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টি করে পেশা নির্বাচনে স্বাধীনতা দেয়া হলে শিশু মুক্তিযুদ্ধাদের মাধ্যমে বিশ্বজয় করা অসম্ভব কিছু ছিল না।

আমাদের দেশে শিশুউন্নয়নে অবলীলায় অনেক কর্মসূচি পালন করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিন ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস। ১২ জুন বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। নানাভাবে উচ্চারিত হয় শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজকের শিশু আগামী দিনের হবু নাগরিক 'ঘুমিয়ে আছে জাতির পিতা সব শিশুরই অন্তরে' ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর স্লোগান, নীতিবাক্য আওড়ানো হয় দিবসগুলোতে।

বাংলাদেশ জতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ স্বাক্ষর করেছে, ফলে রাষ্ট্র শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ বর্তমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিটি শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য চাহিদা পুরণের মাধ্যমে তাদের সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে তোলা রাষ্ট্রের কর্তব্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্যি যে, আমাদের দেশের লাখ লাখ ভাগ্যহত শিশু এখনো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, প্রয়োজনীয় শিক্ষা-স্বাস্থ্য সুবিধা পেতে অক্ষম এবং এদের অনেকেই নানবিধ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত। ফলে তারা সম্ভাবনাময় জীবন গড়ে তোলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই শিশুরা নামমাত্র

www.pathagar.com

বেতনে কিংবা বিনাবেতনে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অমানবিক কাজ করছে।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় মেয়েশিশুরাও ইট ভাঙা থেকে শুরু করে চা, ভাত, পিঠা, ফুলের মালা, তরিতরকারি বিক্রি, দোকানপাট, ঘরদোর ঝাড় দেয়া, ফুট-ফরমাশ খাটা, পরের বাসাবাড়িতে গৃহপরিচারিকার মতো কঠিন কাজগুলো বিনাবেতনে, কমবেতনে করে চলেছে। অনেকক্ষেত্রে গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রীর নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবন পর্যন্ত দিতে হচ্ছে। বিভিন্ন সময় পত্রিকায় দেখা যায় এই রিনা, পারুল, আমেনারা পুরুষ গৃহকর্তা কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভদ্রবেশী লোভী শয়তানের দ্বারা লাঞ্ছিত-নির্যাতিত হয়—হারায় শিশু-কিশোরী বয়সেই মানসম্মান। যৌন নির্যাতনের শিকার ছেলেশিশুরাও। কর্মস্থলে বয়স্ক পুরুষ মালিক কিংবা লোভী পুরুষ কর্মচারীর যৌন হয়রানির শিকার হয়।

এই শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মলিন, অসহায় মুখের দিকে ভালো করে লক্ষ করলে নিশ্চয় কিছুটা অনুমান করা যায়, কি কঠিন করুণ অবস্থায় পড়ে শিশু বয়সেই নির্মম-নিষ্ঠুর বাস্তবতায় ঝুঁকিপূর্ণ, বিপদসঙ্কুল কর্মে নিয়োজিত হয়। নিজেদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মধ্যে জড়িয়ে জীবনকে বিপদসঙ্কুল ও বিপন্ন করে তুলেছে।

অর্থনৈতিক, বেকারত্ব, সামাজিক ও পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত কারণে অস্থিরতার ফলে শিশুরা নেশার অন্ধকার জগতে দ্রুত ছুটছে। যার প্রভাব পড়ছে সমাজের শান্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশে। এসব নেশাগ্রস্ত শিশুর সদম্ভ পদচারণা শহরের অলিগলিতে আপত্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে পরীক্ষিত তৎপরবর্তিতে অসাধারণ সব শিশুকে নিয়ে অসম্ভব সব গর্ব করার ক্ষেত্র তৈরির সুযোগ ছিল। হতভাগা বর্তমান শিশুদের জন্য আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই? সবাই মিলে ভালোবাসা ও সহানুভূতিশীল হৃদয়ে এই অসহায় শিশুদের ভবিষ্যৎ পেশাজীবী হিসেবে গড়তে পেশাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শিশুপ্রতিভা বিকাশে স্বাধীনতা অর্জনের মুহূর্তে জাতি ভ্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। যে শিশুরা অস্ত্র হাতে জীবনবাজি রেখে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যুদ্ধ করেছে, তাদের নিয়ন্ত্রণে সহস্র বছরের পরীক্ষিত রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম নীতি গ্রহণ উচিত ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় জাতি গত ৪১ বছর নতুন নতুন অভিনব ফর্মুলা আবিষ্কার করে। সামরিক আইন, ক্লিন

www.pathagar.com

হার্ট অপারেশন, র‍্যাব, কোবরা গঠন করা হয়। শিশু, তরুণ, যুবক হত্যা, গুম, জেল হাজতে প্রেরণ, লিমনের মতো মেধাবীকে পঙ্গু করা হয়। জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ অর্থ ব্যয় করা হয় শিশু সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে।

এসবের পিছনে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার অর্ধেক অর্থ যদি নিম্ন প্রযুক্তি-ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, পুলিশ, লেদার, জার্নালিজম, লাইব্রেরি বিজ্ঞান, ডেন্টাল হাইজিন, পর্যটন, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, উচ্চ প্রযুক্তি খনিজ সম্পদ উত্তোলন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ইত্যাদি বিষয়ে ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা সম্ভব ছিল। তাহলে সেই সব অসম্ভব শিশুকে নিয়ে মেজর কামরুলের মতো বুদ্ধিজীবীরা নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারতেন।

জাতি ইতোমধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে যেসব বন্ধু আমাদের পাশে ছিলেন তাঁদেরকে সম্মাননা প্রদান শুরু করছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অগণিত অক্সিলারি ফোর্সকেও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি ও সম্মাননা দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রগতিশীল গবেষণা সংগঠন 'ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ'র পক্ষ থেকে 'আমাদের শিশু মুক্তিযোদ্ধারা' প্রবন্ধের জন্য লেখক বীরমুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভূঁইয়া এবং প্রথম আলো কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

দৈনিক ইনকিলাব : ২৬ ডিসেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

প্রকৃত বিজয়ের অপেক্ষায় জাতি

স্বাধীনতার মাস আসলেই মনে পড়ে '৭১-এর রক্তঝরা দিনগুলোর কথা। লাখো শহীদের রক্তে রাঙানো দিনের কথা। স্বাধীনতার ভেতর লুকানো রয়েছে প্রচণ্ড এক আবেগ, রয়েছে লাখো মানুষের আত্মত্যাগের ইতিহাস, অনেক অশ্রু, বেদনা ও একটি শক্তি। স্বাধীনতা সূর্যের আলোর মতো, বাতাসে অক্সিজেনের মতো, নদীর পানির মতো। যার যতটুকু প্রয়োজন, যে যতটুকু চায়, সে ততটুকু পায়। একটি জাতি যখন স্বাধীন হয়, তখন সেই স্বাধীনতা সবারই স্বাধীনতা : দলবিশেষের নয়, গোষ্ঠীবিশেষের নয়, বিশেষ মতাবলম্বীর নয়। অর্জিত হওয়ার পরে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁরা ভোগ করেন; যাঁরা স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য কিছুই করেননি, এমনকি স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন, তাঁরাও স্বাধীনতার সুফল ভোগ করেন। সে জন্যই যে কোনো জাতির জীবনে স্বাধীনতার চেয়ে বড় ও মহৎ কিছু নেই। স্বাধীনতার বিকল্প শুধু স্বাধীনতাই।

বাংলার স্বাধীনতা কারো একটি হুংকারে আসেনি, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লাখ শহীদের পবিত্র রক্ত, ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম, অনেক অশ্রু ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে মহত্তম ও গৌরবময় ঘটনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একদিকে যেমন করুণ, শোকাবহ, লোমহর্ষক, তেমনি ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ও বীরত্বপূর্ণ।

১৯৭১-এর মহান সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসের প্রতিটি দিনই কোনো না কোনোভাবে তাৎপর্যবহ। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির আনন্দ ও বেদনার এক সংমিশ্রিত ইতিহাস। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঝাঁপিয়ে পড়া, ২৬ মার্চ বাঙালির সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু এবং সর্বশেষ ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের আনন্দ। মাত্র ৯ মাসের

www.pathagar.com

ব্যবধানে বিজয় ছিনিয়ে এনে এ দেশের বীর জনতা বুঝিয়ে দিয়েছিল ঐক্য ও ত্যাগ থাকলে বুলেট আর কামান দিয়ে কোনো জাতিকে দমিয়ে রাখা যায় না।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল চারটা ৩২ মিনিটে রমনা রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মুক্ত আকাশের নিচে যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।

আজ বিজয়ের বিয়াল্লিশ বছর। মানবসভ্যতার জন্য ক্ষণকাল। একটা স্বাধীন দেশের জন্য কিছু সময়। একজন মানুষের জন্য গোটা একটি জীবন। এক লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এ দেশের প্রায় ১৬ কোটি মানুষের জন্য গোটা একটি জীবন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ মানুষ, যাদের বয়স ৩৫ এর নিচে তাদের জন্য, আজকের শিশু-কিশোর তথা আগামী প্রজন্মের জন্য ৪২ বছর অনেক সময়। এ ৪২ বছরে আমরা শোষণহীন সমাজ নির্মাণ করতে পারিনি। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন-স্বপ্নাহত পাখির মতো ডানা ঝাপটায়। এখনো আমরা বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর একটি। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা এখনো পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিতকরণ করতে না পারার কারণে মানবতা, বঞ্চিত মানুষের অন্তর আত্মা হাহাকার করছে।

বাংলার যেসব অকুতোভয় সাহসী সন্তানেরা জীবন-মরণ যুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশকে হানাদারমুক্ত করেছেন, বর্তমানে তাঁদের অনেকে হতদরিদ্র, অতিকষ্টে দিনাতিপাত করছেন। স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনার যুদ্ধে জয়ী হলেও জীবনযুদ্ধে হেরে গিয়ে কেউ হয়েছেন দিনমজুর, কেউ রিকশাচালক, ফেরিওয়ালা, কেউ বা ভিক্ষাবৃত্তি করে সংসার চালাচ্ছেন। তাঁদের কারো কারো স্ত্রী বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঝিয়ের কাজ করছেন, রোগে শোকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। অথচ এমন হওয়ার কথা ছিল না। অপার সম্ভাবনার দেশ আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক, ভূকৌশলগত অবস্থানে। দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেতুবন্ধন রচনা করছে বাংলাদেশ। আগামী পরাশক্তি চীন আর ভারতের মাঝামাঝি অর্থনীতির সাফল্যের দেশগুলো—মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার অনতিদূরে, পূর্ব ও পশ্চিমের সন্ধিস্থলে আমাদের অবস্থান। আমাদের আছে প্রাকৃতিক সম্পদ। আছে সবচেয়ে উর্বরা মাটি যাতে সোনা ফলে। আছে বিশাল সুপেয় পানির

www.pathagar.com

অপার বিস্তার, আছে মাটির নিচে তেল-গ্যাস-কয়লা সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। পুরো দক্ষিণাংশজুড়ে সুদীর্ঘ উপকূল ঘিরে আছে ঐশ্বর্যখচিত বঙ্গোপসাগরের সীমাহীন বিস্তৃতি। আছে ১৬ কোটি মানুষের ৩২ কোটি সৃজনশীল হাতের এক বিশাল সম্পদ।

দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের। পরাধীনতার গ্লানি মোচন হয়েও স্বশাসিত স্বাধীন বাংলাদেশ আজ বিশ্বে দারিদ্র্যপীড়িতি, দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্বৃত্তায়িত, পক্ষাঘাতক্লিষ্ট, গণতন্ত্রের অবক্ষয়িত জাগরণ আর নিবারণের এক দেশ। ১৯৮১ সালে ডা. মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। নেতা হিসেবে তিনি নির্ভুলভাবে সম্পদের ছড়াছড়িই যে শুধু একটি দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি এমন বিশ্বাস করেননি। তাঁর চোখের সামনেই ছিল অনেক সম্পদশালী দেশের নিঃস্ব হওয়ার উদাহরণ।

মাহাথির পেয়েছিলেন অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত একটি কৃষিনির্ভর দেশ। যা ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা বহু বছর লুণ্ঠনের কেন্দ্রভূমি। ১৯৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত মালয়েশিয়া ছিল দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। তখন তাদের উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা পর্যন্ত ছিল না। অফিসে চিঠিপত্র টাইপ করার জন্য টাইপিস্ট, বৈদ্যুতিক কেন্দ্রগুলো দেখ-ভাল করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার, হাসপাতালে রোগী সেবার জন্য নার্স, প্যাথলজি ও এক্সরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, বিমান ও শিপ চালাতে পাইলট ও নাবিক ছিল না। মাহাথির মোহাম্মদ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করে কেন্দ্র থেকে তৃণমূলে ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট নির্মাণ করলেন। বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক নিয়োগ দিলেন। ১৯৮৫ সালের মধ্যে পেশা ও পণ্যভিত্তিক ৩ হাজার ৪১২টি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে এসএসসি পাস তরুণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি ও অধ্যয়নের বয়সনীতি ৫ বছরের জন্য রহিত করলেন। যেসব যুবক অলিতে গলিতে বসে আড্ডা দিত, হিরোইন, প্যাথডিন, মরফিন, আফিম, মদের আসক্তিতে আচ্ছন্ন ছিল, তারা ডিপ্লোমা শিক্ষা গ্রহণ করে রাতারাতি মানবসম্পদে পরিণত হলো। ডিপ্লোমাধারীদের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে শিল্প কারখানা, খামার ও হাসপাতালগুলোর মান ইউরোপ, আমেরিকার সমপর্যায়ে উন্নীত হলো। মালয়েশিয়া থেকে বেকার শব্দ নির্বাসিত হলো।

১৯৮১ সালে মালয়েশিয়া যে অবস্থায় ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ তার চেয়ে ভালো অবস্থার থেকে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু স্বাধীনতার ৪২ বছর অতিক্রম করার পরও আমরা লক্ষ্যস্থানের ধারে কাছে যেতে পারলাম না। ১৭৫৭

www.pathagar.com

সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে মীর জাফরদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর, থেকেই একদিকে চলতে থাকে বিজাতীয় শাসনশোষণ, অন্যদিকে চলতে থাকে ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। আজও আমরা ইংরেজদের ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থা বাতিল করে বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি।

একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে হলে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হয়। জাতি ধ্বংসের নীলনকশা অনুযায়ীই স্বাধীনতার পর শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের সূত্রপাত করা হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ডিপ্লোমা শিক্ষার মান নেমে গেছে। ষড়যন্ত্রকারীরা হাতে কলমের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসে কিছুটা হলেও সফল হয়েছে।

বাংলাদেশের ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি রেখে মালয়েশিয়ার মতো পরিকল্পনামাফিক এগুতে হবে। ডিপ্লোমা শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থা বহাল রেখে কখনোই শিক্ষার মান ও শিক্ষা প্রসার করা যাবে না। ডিপ্লোমা শিক্ষার প্রসার না ঘটিয়ে দেশকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

'দেশ তোমাকে কী দিয়েছে সেটি বড় কথা নয়, দেশকে তুমি কী দিতে পার সেটাই বড় কথা'-মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির এ বিখ্যাত উক্তি হৃদয়ে ধারণ করে দেশের তরুণ প্রজন্মসহ সবাইকে আজ ডিপ্লোমা শিক্ষা বিপ্লব শুরু করতে হবে। এ শিক্ষা বিপ্লব হবে দেশের উন্নয়নের, দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য রক্ষার, মানবাধিকার বাস্তবায়নের, সুশাসন প্রতিষ্ঠার, কর্মসংস্থান সৃষ্টির, বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা বাংলাদেশকে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে শিক্ষাবান্ধব বিজয়ী বেশে উপস্থাপনে বিশ্বাসী।

অর্থনীতি প্রতিদিন : ২৬ মার্চ ২০১৩

www.pathagar.com

বিজয় চেতনার সূর্যশিখা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধ উদাস পথিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন নয়; নয় গ্রামোফোনের স্মৃতি জাগানিয়া পুরনো কোনো গান। '৭১-এ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জাতির আবির্ভাব। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় অকুণ্ঠ আত্মদানের ইতিহাস। বীরের মতো গ্রীবা উঁচু করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল জাতি। সৃষ্টি করেছিল নক্ষত্রপুঞ্জের মতো অসংখ্য ঘটনা-কাহিনী। যার পূর্ণতা পায় একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। বাঙালির আরাধ্য বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্ববহ একটি দিন। আত্মপরিচয়ের রক্তলাল বৃত্তখচিত সবুজাভ পতাকা অর্জনে সোনালি সূর্যোদয়ের দিন। আমাদের জাতিসত্তার অহংকার এবং অঙ্গীকারের দিন মহান ১৬ ডিসেম্বর।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে উঠে আসা প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই সুফলা জনপদটির জনগণ সুপ্রাচীন কাল থেকেই স্বাধীনতাপ্রিয়। তারা সকল শোষণ, নির্যাতন এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে কালে কালে। আমাদের স্বাধীনতা স্পৃহা আরো শাণিত হয়ে সংগ্রামমুখররূপ পরিগ্রহ করে বাংলার শেষ স্বাধীন শাসক নবাব সিরাজুদ্দৌলার এক প্রহসনমূলক যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। এই উপলব্ধি থেকে এ দেশের মানুষ ষড়যন্ত্রের সকল জাল ছিন্ন করতে স্বাধীনতার লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংগ্রামে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশ বিভাগের পরপরই বাঙালিরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, এ স্বাধীনতা আসলে স্বাধীনতা নয়; ক্ষমতার হাত বদল মাত্র। ব্রিটিশ বেনিয়াদের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসনের খপ্পরে গিয়ে পড়ে বাঙালিরা। বিষয়টি খুব স্বল্প সময়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে। পাক শাসকরা সর্বপ্রথম আঘাত হানে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। মায়ের ভাষা এবং সংস্কৃতির উপর আঘাত আসার সাথে সাথে গর্জে ওঠে।

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা প্রথম বিজয় অর্জন করে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে।

এরপর নানান ঘটনা পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ হয়। ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তির যুদ্ধে। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সকল অর্থেই দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। ছিল খেটে-খাওয়া মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার যুদ্ধ। নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশায় সাধরণ মানুষের সন্তানরা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাঁদের স্বপ্ন ছিল আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার মতো সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ার।

দীর্ঘদিনের আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা থেকে মুক্তির আশায় প্রধানত অবহেলিত, অপমানিত সাধারণ মানুষের সন্তানেরা একাত্তরে মরণপণ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন পূরণ হবে বলে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল। আমরা আশেপাশের দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে সেই উপলব্ধি করতে পারি। আমরা কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি।

৪২তম বিজয় দিবসে দাঁড়িয়ে জাতীয় উন্নয়ন উৎপাদন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উন্নয়নের ভৌত অবকাঠামোর দিকে তাকালে জাতি হিসেবে ব্যর্থতার দায় আমরা কোনোভাবেই এড়াতে পারি না। আমাদের শিল্প কারখানা বন্ধ হয়েছে, শিক্ষাজীবন সন্ত্রাসের কবলে, বেকারের পদভারে দেশ ভারাক্রান্ত।

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে আমরা জেগে উঠছি। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪২ বছর পর্যন্ত দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আমরা সফল হইনি। ব্রিটিশদের প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে আজও আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছি। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা কার্যকর করতে পারিনি। সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধূর্ত ব্রিটিশ বেনিয়াদের কুক্ষিগত শিক্ষার আদলে চলছে। দেশ ও বিদেশের যুগোপযোগী চাহিদা নিরূপণ করে শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, ইউনানি ও আয়ুর্বেদীয় বোর্ড, নার্সিং কাউন্সিল, ফার্মেসি কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি থেকে ডিপ্লোমা শিক্ষা কার্যক্রম পৃথক করে স্বাধীন ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ঘটাতে পারিনি।

প্রতি বছর ১০টি মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে গড়ে ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। পৃথিবীর সব দেশে স্বল্প-কম মেধাবী ও দরিদ্র ছেলেমেয়েরা ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ভর্তির সুযোগ পায়। ডিপ্লোমা শিক্ষা গ্রহণ

www.pathagar.com

করে নিজ এলাকায় স্বকর্মসংস্থানমুখী হয়। একটি অংশ উচ্চ বেতনে বিদেশে গমন করে। কেন্দ্রীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড তৃণমূলে ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সকল প্রকার প্রশাসনিক ও একাডেমিক সহযোগিতা প্রদান করে।

বাংলাদেশ ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের গড়া ভিন্ন মতাবলম্বী ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী ৭টি প্রতিষ্ঠান শিক্ষা উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রতিবছর ১৪ লক্ষ এসএসসি পাস শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্ধেক ছেলেমেয়েকে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার সুযোগ সৃষ্টি করা ছিল উচিত। তাহলে বিজয়ের ৪২তম দিবসে বাংলাদেশের শিল্প শিক্ষা সাহিত্য অর্থনৈতিক ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো।

সকল জাতির জীবনেই আবেগ অনুভূতির গুরুত্ব অনেক। আবেগ অনুভূতির উপর ভর করে প্রত্যেক জাতিই তাদের বিজয় দিবসকে নবরূপে উদযাপন করে থাকে। জাতির বিজয় দিবস বয়সের মানদণ্ডে যত পুরনো হতে থাকে ঐ জাতির রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের দেশের উন্নতি অগ্রগতির ব্যাপারে সাধারণ জনগণের কাছে জবাবদিহিতার দায়ভার তত বাড়ে।

পৃথিবীতে সেই সব জাতি উন্নতি ও অগ্রগতির শিখরে উঠতে পেরেছে যাঁদের সকল পেশাজীবী, সচেতন জনগণ দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য একযোগে কাজ করেছে। ৪২তম বিজয় দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে আমাদের প্রত্যাশা ঔপনিবেশিক আমলের ডিপ্লোমা শিক্ষানীতি পরিবর্তন করে সমাজকে প্রযুক্তিমুখী করা।

দৈনিক কালের কণ্ঠ : ১৫ ডিসেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

স্বাধীনতার অস্তিত্ব দুর্গমে পৌঁছাতে

স্বাধীনতা শব্দটি অতি ছোট। মাত্র ৫টি অক্ষর। কিন্তু তার অর্থ, তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাপক। স্বাধীনতা একটি দেশের অমূল্য সম্পদ। কোনো মানুষ বা দেশই পরাধীন থাকতে চায় না। বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় দিতে হলে দরকার সেই জাতির স্বাধীনতা। একটি দেশ তখন আত্মগৌরবে বলিয়ান হতে পারে যখন সে দেশটি সার্বভৌম স্বাধীনতায় বলিয়ান হতে পারে। মানুষ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে, যুদ্ধ করে কারণ স্বার্থমগ্ন বেনিয়া দখলদার শাসকেরা কোনো জাতিকে সহজে স্বাধীনতা দান করে না। বহু কষ্ট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তা ছিনিয়ে আনতে হয়। আমাদের স্বাধীনতাও ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও ৩ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়।

জন্ম নিল প্রিয় জন্মভূমি 'বাংলাদেশ'। স্বাধীনতা বলতে শুধু এতটুকু ভূখণ্ড, একটি পতাকা আর নির্দিষ্ট ভাষাকেই বুঝায় না। স্বাধীনতা বলতে একটি সুশাসিত রাষ্ট্র, ব্যক্তির স্বাধীনতা, জনগণের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বুঝায়। সবকিছু মিলেই একটি দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

রাজনৈতিকভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করেছি এই শ্রুতিমধুর ভাষা। নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ড লাল সবুজের পতাকা। অথচ আমাদের ত্রুটিপূর্ণ রাজনীতির জন্য প্রতিদিন হারাতে হচ্ছে নিরীহ প্রাণ, এই রাজনীতি নিত্য নৈমত্তিক হরতাল ডেকে জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি স্তরকে করছে বাধাগ্রস্ত। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শান্তিশৃঙ্খলা করছে বিঘ্নিত।

স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে প্রতিটি নাগরিকের। আজকের বিংশ শতাব্দীতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ের আগে বা পরে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেনে নিতে হয় বাবা,

www.pathagar.com

ভাই, শ্বশুর কিংবা স্বামীর অনেক আদেশ নির্দেশ। আমাদের এই স্বাধীনতা শুধু বড় বড় নেতা ও ধনীদের মধ্যেই আবদ্ধ। নবজাতকের কাছে সুকান্তের অঙ্গীকার আজ ব্যর্থ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলার রূপের কালিমা লেপে দিচ্ছে 'দুর্নীতি' চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীর ভয়াল থাবায়। নজরুলের সাম্যের কবিতা আজ ব্যর্থ, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা স্বাধীন হয়েও অর্থনৈতিক পরাধীনতার শিকল পরে বসে থাকতে হচ্ছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক দিয়ে পরাধীন হয়ে আছি। অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মানুষের মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকারগুলো হতে বঞ্চিত হচ্ছি। আমরা বাহ্যিক স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছি সত্যি কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজও আমাদের নাগালের বাইরে।

প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীনতার ধারক, বাহক হলো যুবসমাজ। এই দেশের তরুণ সমাজ বিশেষ করে ছাত্রসমাজ মহান স্বাধীনতা অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবিলা করে যুদ্ধ করেছে। অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছে। শহীদদের উদ্দেশ্য ছিল নিজে না হোক ছেলে মেয়ে নাতি নাতনিরা স্বাধীনতার সুফল ভোগ করবে। এ দেশে থাকবে না কোনো অভাব অনটন, ৪৩তম বিজয় দিবসের দ্বারপ্রান্তে আমরা অন্যরকম চিত্র দেখছি। সারা দেশে হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি নিত্যনৈমত্তিক ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। এদের ভয় ও অত্যাচারে কখনো কখনো মানুষ দিশেহারা ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

দেশের সন্ত্রাসীদের লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক কিছুতেই যোগ বিয়োগ মিলানো যাচ্ছে না। এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মাটির এই পৃথিবী মানুষের জন্যই দানবের জন্য নয়। মানুষ যখন অন্যায়-অত্যাচারের মাধ্যমে দানব চরিত্র অর্জন করে তখন তার বিরুদ্ধে চলে মানুষের মুক্তি সংগ্রাম। মানবজাতির ইতিহাস আসলে এই মুক্তি সংগ্রামেরই ইতিহাস। বাংলাদেশের বিবেকবান মানুষ মাত্রই চান আমাদের এই সমাজ মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠুক। লক্ষ তরুণের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার অস্তিত্ব প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌছে যাক।

পৃথিবীর সব দেশেই তরুণ সমাজ জাতির সম্পদ। তাদের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। উন্নত বিশ্বে তরুণদের ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করা হয়। প্রতিষ্ঠা করা হয় হাইস্কুলের পার্শ্বে ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে হাতে গোনা কয়েকটি ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজধানী শহর ঢাকা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থিত। ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলায় কোনো ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে তরুণ সমাজের মেধা ও মননকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন দেশের প্রত্যেক স্তরের প্রতিটি মানুষের ইচ্ছা, সচেতনতা, সততা এবং সর্বোপরি ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। যেদিন এই প্রতিটি গুণের সমাবেশ ঘটবে, সেইদিনই আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাব আর এর জন্য করতে হবে আমাদের কঠোর পরিশ্রম।

ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশদের গড়া ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেশউপযোগী ডিপ্লোমা শিক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে। তরুণ যুবাদের কর্মসৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীনতার অস্তিত্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছাবে।

দৈনিক সকালের খবর : ৩ এপ্রিল ২০১৪

www.pathagar.com

দক্ষ জনশক্তির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা

২৩ এপ্রিল ২০১৪ ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশে (আইডিইবি) ২০তম জাতীয় সম্মেলন ও ৩৮তম কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সরকার দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারিত করতে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তিনি বলেছেন, ছেলেমেয়েদের এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হবে, যাতে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে তারা নিজেরাই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় বলতেন 'সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ চাই'। কিন্তু বাংলাদেশে সোনার মানুষের বড়ই অভাব। এ ধরনের মানুষ তৈরিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা হতাশাপূর্ণ। স্বাধীনতার ৪৪টি বছর পরও আমাদের ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থা সবার জন্য উন্মুক্ত হতে পারেনি। শিক্ষা খাতে রয়েছে বিস্তর বৈষম্য। এরই মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্লোগান ৭টি বছর পেরিয়ে গেলেও ডিজিটাল জনবলের অভাবে হাবুডুবু খাচ্ছে এনালগ প্রশাসন।

ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ গত তিন দশক ধরে প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভেটেরিনারি ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট স্কুল, প্রাইমারি টিচার্স ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান, সভা, সেমিনার, সম্মেলন, টকশো, সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশ করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে আসছে। আইডিইবি'র ২০তম জাতীয় সম্মেলনে জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিটি উপজেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আমাদের দীর্ঘ আন্দোলন এক ধাপ অতিক্রম করল। এই ঐতিহাসিক ঘোষণার জন্য ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা

www.pathagar.com

কাউন্সিল, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই ঐতিহাসিক ঘোষণার পরই এ দেশে ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে অতীত ও বর্তমান ইতিহাস পর্যালোচনা গবেষণার প্রয়োজন পড়েছে। ভবিষ্যতের জন্য একটি স্বল্প, মধ্যম, দীর্ঘমেয়াদি জনশক্তি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশে প্রতিবছর ৮টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, ১টি কারিগরি, ১টি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে গড়ে ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং এর মধ্যে থেকে ৭ লক্ষ শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পরও এ সার্টিফিকেট দিয়ে কোনো চাকরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। অর্থাৎ বেকারের উৎপত্তিস্থল হলো স্কুল, কলেজ। দেশের তরুণদের সংখ্যা জনসমষ্টির অর্ধেকের বেশি। বলা হয়ে থাকে যে, তারুণ্যই শক্তি। তরুণদের মাঝে সেই তারুণ্য রয়েছে। দেশের উন্নয়নের জন্য তরুণদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। সেই তরুণরা কিনা আজ হতাশাগ্রস্ত বেকার।

অধিকাংশ হতাশাগ্রস্ত তরুণ ও যুবকেরা মাদকাসক্ত। এ রকম পরিস্থিতিতে তরুণরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ফলে তরুণরা সমাজে চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই, খুন-খারারি, ইভটিজিং প্রভৃতি সামাজিক অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। এছাড়াও তারা নানা রকম নৈতিকতাবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ছে। তারা মাদক ব্যবসা, চোরাচালন, নারী ও শিশু পাচারের মতো অত্যন্ত গর্হিত কাজে লিপ্ত হচ্ছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কে ভালো কাজের জন্য ব্যয় করতে হলে প্রয়োজন কর্মসংস্থানভিত্তিক শিক্ষা। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত উপজেলা কেন্দ্রিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট দক্ষ প্রশিক্ষিত তরুণ যুব তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

ডিপ্লোমা নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্টের অভাবে হাসপাতালগুলো অদক্ষ জনবল দিয়ে পরিচালনা করে বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা বিদেশমুখী করে রাখা হয়েছে। উন্নত বিশ্বে মোট শিক্ষিতের চারভাগের তিনভাগ ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। সার্কভুক্ত দেশগুলোতেও গড় ডিপ্লোমা শিক্ষা হার ৫৬ শতাংশ, বাংলাদেশে এই হার তিন শতাংশ মাত্র।

ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তিনশো বছর বাংলাকে শাসন করে। সাদা সাহেবরা এ দেশে তাদের শাসনব্যবস্থা দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে বিভক্তি নীতি

www.pathagar.com

গ্রহণ করে। হিন্দুর সাথে মুসলমান, মৌলভীর সাথে ঠাকুর, ধনীর সাথে গরিবের, সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যম বিভাজন সৃষ্টি করে একে অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি করে। একইভাবে ডিপ্লোমা শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, হোমিওপ্যাথিক বোর্ড, ইউনানি ও আয়ুর্বেদীয় বোর্ড, নার্সিং কাউন্সিল, ফার্মেসি কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি একাধিক ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান একে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্বন্দ্ব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। মেধা ও শ্রমের অপচয়ে সৃষ্ট সংঘাত এখনো চলমান। ঔপনিবেশিকতা একটি দুরারোগ্য ব্যাধির মতো, যা কোনো দেশের মানুষকে একবার পেয়ে বসলে তা সহজে দূর করা যায় না। বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও তিন শতাব্দীর প্রাচীন কলোনি যুগের মনোভাব ও আচরণ ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশের প্রস্তাবিত ৮টি ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে হলে ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তৃণমূলমুখী করতে হবে।

যিনি রাঁধেন, তিনি নাকি চুলও বাঁধেন। বাঙালি নারীদের সাথে রান্নাবান্নার একটি দুর্দান্ত যুগলবন্দি আমাদের ঐতিহ্যগত প্রথা হয়ে আছে। শেখ পরিবার জাতিকে বড় বড় স্বপ্ন দেখান। আবার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণতও করেন। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ রায় প্রদান করেন। তিনি জনগণকে একটি স্বাধীন দেশ উপহার দিয়েছেন। ২০০৮ এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এ দেশের জনগণ দুবার নিরঙ্কুশ রায় প্রদান করেছেন।

আমরা আশা করছি ব্রিটিশদের গড়া ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কবল থেকে জাতিকে পরিত্রাণ দিবেন। বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার আইন মহান জাতীয় সংসদে পাস করবেন। তাহলেই দক্ষজনশক্তি নীতির পথ প্রশস্থ হবে। জাতি হিসেবে আমরা কলোনি নীতির কলুষমুক্ত হব। দক্ষতা, সৃজনশীলতায়, পরিপূর্ণ শিক্ষায় দেশের অর্থনীতি বিকশিত হবে।

প্রথম আলো : ৫ জুন ২০১৪

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ : নরসিংদীতে খালেদা জিয়ার মহাসমাবেশ

নরসিংদী একটি অদ্ভুত জেলা। এ রকম প্রশাসনিক কাঠামোর জেলা বিশ্বে অন্য কোনো স্থানে আছে বলে জানা যায় না।। সুবর্ণবীথি, সমতট যে নামেই নরসিংদীর অতীত পরিচিতি থাকুক না কেন বর্তমানে (১৯৮৪) এটি জেলা হিসেবেই পরিচিত। এর দুই-তৃতীয়াংশ 'ভূমি পলিময়' কালোমাটিতে গড়া। বাকি এক-তৃতীয়াংশ লালমাটি। এটি পাহাড়ি এলাকা হিসেবে পরিচিত। এ এলাকার বসতি ৫০০০ বছর পূর্বে বলে ধারণা করা হয়। এ পলল গঠিত কালোমাটি অঞ্চল নবগঠিত বলে বিশেজ্ঞগণ মত পোষণ করেন। এক সময় বঙ্গোপসাগর বর্তমানের গারো পাহাড়ের পাদদেশে আছড়িয়ে পড়ত। পরে ধীরে ধীরে ভূমি জেগে ওঠে। ভৌগোলিকভাবে নরসিংদী জেলা বাংলাদেশের মাঝখানে অবস্থিত।

নরসিংদী জেলায় জন্ম নিয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকমানের সৃজনশীল ব্যক্তি। প্রয়াত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (পবিত্র কুরআন শরিফের বাংলায় অনুবাদকারী), কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত (কেজি গুপ্ত) (নিখিল ভারতের প্রথম আইসিএস), অতুল প্রসাদ সেন (পঞ্চগীতিকারের অন্যতম), অক্রুর চন্দ্র ধর (কবি ও নাট্যকার), জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবন্ধকার), মরহুম কবি বেনজির আহমদ, কবি শামসুর রাহমান, সুরুজকুমার নাথ অধিকারী (শিক্ষাবিদ), সৌমেন চন্দ (মার্কসবাদী বিপ্লবী লেখক), ফণি মজুমদার (কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি), মোহাম্মদ হানিফ পাঠান (প্রত্ন সংগ্রাহক), ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (অধ্যাপক, কবি ও সাহিত্যিক), ড. মনিরুজ্জামান (অধ্যাপক, কবি-সাহিত্যিক ও ভাষা গবেষক), ড. সফিউদ্দীন আহমেদ (বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও প্রাবন্ধিক), মরমী কবি সাবির আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ পাঠান (প্রত্ন সংগ্রাহক), হরিপদ দত্ত (লেখক, কথাসাহিত্যিক), ভূপতি মোহন সেন (গণিতবিদ), রবীন্দ্রনাথ সেন (শিশুসাহিত্যিক) প্রমুখের পদভারে নরসিংদীর মাটি ধন্য।

www.pathagar.com

নরসিংদীর কৃতী সন্তানরা শিক্ষার প্রতিটি ধাপে সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। দেশে প্রথম প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় মনোহরদী মডেল প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী সাদিয়া সারা দেশে প্রথম স্থান দখল করেছে। দেশবাসীকে তাক লাগিয়ে আব্দুল কাদের মোল্লা সিটি কলেজ ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় পর পর দুইবার দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিয়েছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দায়িত্বে ড. আ. আ. ম. স আরেফিন সিদ্দিক, বাংলাদেশের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবক্তা ড. এম. আসাদুজ্জামান (সাবেক চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন), প্রফেসর জসীম উদ্দীন আহম্মদ (সাবেক ভিসি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রফেসর আবদুল মান্নান (বর্তমান ভিসি পিপলস্ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ও সাবেক ভিসি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) নরসিংদীর অহংকার।

যোগাযোগেও রয়েছে বৈচিত্র্য। ব্রিটিশ সরকার নরসিংদী জেলার উঁচু নিচু পাহাড় কেটে নির্মাণ করে ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট রেলপথ। নরসিংদীর বুক চিরে চলমান ঢাকা-সিলেট সড়কপথ। জননেত্রী শেখ হাসিনা আরো একধাপ এগিয়ে রেলপথ দুই লেন ও সড়কপথ চার লেনে উন্নীত করে এশিয়ান হাইওয়ে ও রেলওয়ের পথ প্রশস্থ করেছেন। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

মোগল বাদশাহের মন জয় করেছিল নরসিংদীর ঐতিহ্যবাহী মসলিন কাপড়। নরসিংদীর তাঁতীদের উৎপাদিত কাপড় দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করছে একমাত্র নরসিংদী জেলার তাঁতশিল্প। ফরমালিনমুক্ত নরসিংদীর সুস্বাদু ও ভিটামিন যুক্ত সাগর কলা দেশের মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করছে।

নরসিংদী ক্ষুদে জনপদ হলেও এর রয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ-পরিক্রমণের ইতিহাস। রয়েছে উন্নত সমাজ-বিনির্মাণের উজ্জ্বল নজির। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেও নরসিংদী এলাকা যথেষ্ট সরব ছিল। জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল গভীর। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যানারে নিরলস শ্রম দিয়েছেন। সাটিরপাড়ার জমিদার লম্বিতমোহন রায়, সুন্দর আলী গান্ধী, আলগী মাধবদীর শরৎ চক্রবর্তী (প্রখ্যাত লাঠিয়াল), সুলতান সাহাদীর সারদা ভট্টাচার্য, মানিকদির মধুনাথ সরকার, বালুসাইর এর আনসর খাঁ, আবদুল ওহাব, রায়পুরার আবদুস ছোবহান মোল্লা, আফতাব উদ্দিন খন্দকার, আবদুল হামিদ প্রমুখ।

www.pathagar.com

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে স্থপতি নরসিংদীর সন্তান আসাদুজ্জামান শহীদ আসাদ। একই সাথে নরসিংদীকে আত্মমর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ ফারুক ইকবাল মনোহরদীর সন্তান। শুধু ব্যক্তি নয় কিছু ঘটনাপ্রবাহও নরসিংদীকে গর্বিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে সারা দেশের যে কয়েকটি স্থান হতে প্রথম প্রতিরোধ এসেছে তার মধ্যে নরসিংদী অন্যতম। ২, ৪, ৯ ও ১৩ এপ্রিল একাত্তর নরসিংদীতে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

নরসিংদী জেলায় সংসদীয় আসন ৫টি, জেলার উত্তরে কিশোরগঞ্জে-৭, দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জে-৫, পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬, পশ্চিমে গাজীপুরে-৪ মোট ২৭টি আসনের নির্বাচনে নরসিংদীবাসী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জয়-পরাজয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে। এ কারণেই হয়তো ৭০-এর নির্বাচনে শেষ নির্বাচনী সভা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান করেছিলেন মেঘনা নদীর তীরে ঐতিহ্যবাহী ঈদগাঁ ময়দানে।

ঐতিহ্যবাহী নরসিংদী জেলার শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কারণে ১৮ দলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রায় ২০ বছর পর গত ৮ সেপ্টেম্বর নরসিংদীতে জনসভায় যোগ দিয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুসহ সরকারবিরোধী আন্দোলনে গতি আনতে বিএনপি-ঘোষিত আট মহাসমাবেশের প্রথমটি নরসিংদী থেকে শুরু করেন। উক্ত সমাবেশে বেগম খালেদা জিয়া ১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ৩২ সেকেন্ড বক্তব্য প্রদান করেন। প্রযুক্তির কল্যাণে দেশ বিদেশের ৪ কোটি লোক দীর্ঘ বক্তৃতার বয়ান শুনতে পায়। ক্ষমতায় গেলে কি করবেন তার একটি ফিরিস্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, ক্ষমতায় গেলে ব্যাপক উন্নয়ন করব। যুবকদের চাকরির ব্যবস্থা করব। বেকারত্বের অবসানে কাজ করব। দ্রুতগতির ট্রেন চালু করব। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করব। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন করব। দুর্নীতি বন্ধ করব। দলের এমপি-মন্ত্রীরাও দুর্নীতি করলে তাদের ছাড় দেয়া হবে না। যে দুর্নীতি করবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। দুর্নীতিকে আমরা সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করি। পদ্মা সেতু করব। আমরা দুইটা সেতু করব। সর্বশেষ ক্ষমতায় গেলে জনপ্রিয় মেয়র লোকমান হত্যার বিচার করার প্রতিশ্রুতি দেন।

নরসিংদী জেলাকে গুম-হত্যা মাদকামুক্ত করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিপথগামী তরুণদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া থেকে

www.pathagar.com

নরসিংদীবাসী আরো দায়িত্বশীল প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা করেছিল। নরসিংদীবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি একটি আন্তর্জাতিকমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এই সভাটি নরসিংদীবাসীর হৃদয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রবাহমান হতো যদি বিশ্ববিদ্যালয় বঞ্চিত জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হতো।

দৈনিক সংবাদ : ৭ অক্টোবর ২০১৩

www.pathagar.com

নবনির্বাচিত নগরপিতাদের প্রতি প্রত্যাশা

নগরকেন্দ্রিক জীবনকে কেন্দ্র করে আজ হতে বহু বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রিসে গণতন্ত্রের জন্ম। প্রাচীন গ্রিসে জনসংখ্যা কম ছিল বলে প্রত্যেকে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতেন এবং তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত, পরামর্শ ও উপদেশের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো নগরজীবন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে তাদের প্রত্যেকের পক্ষে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা দুরূহ ও জটিল হয়ে পড়ে। তাই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শুরু হয় গণতান্ত্রিক শাসনের যাত্রা। গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় গত ১৫ জুন ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। ৬ জুলাই হয় নবগঠিত দেশের ১১তম সিটি কর্পোরেশন গাজীপুরে। চার সিটিতে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১২ লাখ ২৯ হাজার ৭৮৬ জন। আর গাজীপুরে ছিল ১০লাখ ২৬ হাজার ৯৩৮ ভোট।

নির্বাচনে জয় পরাজয় ছাপিয়ে যে দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে তা হলো গণতান্ত্রিক চরিত্র। সবদিক থেকেই এ নির্বাচন ছিল গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রথমত, নির্বাচনের আগে পরে কোনো ধরনের সহিংসতা ঘটেনি। পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেই বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট সমর্থিত মেয়র প্রার্থীরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট সমর্থিত মেয়র প্রার্থীদের পরাজিত করেছেন। বিএনপি সমর্থিত বিজয়ী পাঁচ মেয়রপ্রার্থী ভোট পেয়েছেন মোট আট ৬৮ হাজার ৩৮৭ আওয়ামী লীগ সমর্থিত পাঁচ মেয়র প্রার্থী পেয়েছেন মোট ৬ লাখ ৬২০। বিজয়ী প্রার্থী পরাজিত প্রার্থীদের চেয়ে দেড় গুণের বেশি ভোট পেয়েছেন। ৫ সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলর পদের মধ্যে ৯০টি পেয়েছে বিএনপি, ৫৬টি আওয়ামী লীগ, ৬টি জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী শাসনতন্ত্র ১ এবং স্বতন্ত্র ১৪টি।

www.pathagar.com

দৈনিক কালের কণ্ঠের অনুসন্ধানে দেখা যায় ৫ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যে ১৭৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন তাদের মধ্যে ৮৭ জনের বিরুদ্ধেই হত্যা, হত্যাচেষ্টা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্রসহ নানা অভিযোগে মামলা ছিল বা আছে। এলাকাবাসীর ভাষ্য মতে, তাদের অনেকেই ভয়ংকর প্রকৃতির। গুরুতর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অনেকেই জড়িত। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেছেন, এ ধরনের ব্যক্তির জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিজয়ী হওয়া শুভ লক্ষণ নয়।

নির্বাচনী প্রচার অভিযানে মেয়র প্রার্থীদের ইশতেহারে আরো আধুনিক নগর প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি ছিল। নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়। কোনো পূর্বপ্রস্তুতি কিংবা পূর্ব ধারণা ছাড়াই প্রার্থীরা একের পর এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়। নির্বাচনের পর সেসব প্রতিশ্রুতি পালন করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে কিনা তা ভাবেন না। এই নির্বাচনে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় ছিল ৫টি সিটি কর্পোরেশনের ১৯ জন মেয়র প্রার্থীর নির্বাচনী ইশতেহারে একই রকম সম্মিলিত দফা ছিল ৬টি

একক দফাসমূহ হলো :

ক. নগরবাসীকে আধুনিক চিকিৎসা প্রদান করা।

খ. শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

গ. আধুনিক শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা।

ঘ. বেকারত্ব দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঙ. নগরকে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত করা

চ. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা।

উল্লিখিত ৬টি দফার সাথে ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষার রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। দফাসমূহ বাস্তবায়নে বিগত নির্বাচিত মেয়রগণ ব্যর্থ হওয়ার মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিক আমলের গড়ে ওঠা ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থা। নগরবাসীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে পারেননি গেল নগর পিতাগণ।

ব্যর্থতার খতিয়ান খুলতে গিয়ে অবতারণা করতে হয় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তথ্যউপাত্ত। ২০১০ সালের ১৭ জুন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চট্টগ্রামের উন্নয়নে ৫৬ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছিল নির্বাচিত মেয়র এম মনজুর আলম। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে

www.pathagar.com

আনিত প্লান্ট শুধু প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবে ভেস্তে যাচ্ছে। দীর্ঘ তিন বছরে এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

বর্তমান বাংলাদেশের নগরগুলোর চিকিৎসাব্যবস্থার উপর কোনো মহল আস্থা রাখতে পারছে না। চিকিৎসার প্রথম ও প্রধান শর্ত সঠিক রোগ নির্ণয়। প্রশিক্ষিত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এর অভাবে রোগনির্ণয় ও সঠিক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে না। ক্লিনিকগুলোতে ডিপ্লোমা নার্সের অভাবে আয়াদের সাদা কাপড় পরিয়ে নার্স বানানো হয়। প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলো মৃত্যুবরণ করছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়তে গিয়ে দক্ষ জনবলের অভাব উপলব্ধি করছেন।

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গোঁজামিল ও অপচয় হয়। প্রতি বছর ৭টি বিভাগীয় শহর তথা সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে ৬ লক্ষ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে দিক নির্দেশনাহীন হয়ে পড়ে। উন্নত বিশ্বে নগরগুলোতে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে ডিপ্লোমা শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলে। তাদের দেশে যেখানে হাইস্কুল আছে তারই পাশে নির্মাণ করা হয়েছে ডিপ্লোমা শিক্ষা ইনস্টিটিউট।

উন্নত বিশ্বের মতো এ দেশের এসএসসি পাস তরুণদের পেশা ও পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। তাহলে হাসপাতল, ক্লিনিক, শিল্পে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ডিপ্লোমাধারীদের নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে। নবনির্বাচিত নগরপিতারা তাদের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করতে হলে ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট নির্মাণের সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটাতে হবে। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে শক্তিশালী হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করবে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদগণ। জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত মেয়রদের ব্যর্থতা আমরা আর দেখতে চাই না। একক নির্বাচনী ইশতেহারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সকল প্রার্থীর প্রতি রইল আন্তরিক অভিনন্দন।

আলোকিত বাংলাদেশ : ২৩ জুলাই ২০১৩

www.pathagar.com

ডিপ্লোমা শিক্ষার বেহাল দশা : শিক্ষামন্ত্রীর আক্ষেপ

ড. মুহাম্মদ কুদরাত এ খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ডিপ্লোমা শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করে ডিপ্লোমা স্তরের নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো এমন এক শ্রেণীর দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা যাঁরা নিজ হাতে দক্ষতার সাথে কাজ করার যোগ্যতার অধিকারী হবে, শিল্পপদ্ধতি এবং বিষয়ের মৌলিক নিয়মাবলি সম্বন্ধে পুরোপুরি অবহিত থাকবে এবং সুচারুরূপে শিল্পশ্রমিক পরিচালনায় সক্ষম হবেন। তাঁদের শিক্ষা কার্যক্রম এমন হবে যে পুঁথিগত জ্ঞানের দ্বারা তাঁরা ডিগ্রি প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের চিন্তাধারা হৃদয়ঙ্গম করে দক্ষ শ্রমিকের নিকট ব্যক্ত করতে সক্ষম হবেন এবং নিজেদের বাস্তব দক্ষতার দ্বারা শ্রমিকদের কাজের কার্যকরী তদারক ও পরিচালনা করে শিল্প কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত মানের দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। তাঁরা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ, পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ডিগ্রি প্রযুক্তিবিদদের সহকারী হিসেবেও কাজ করতে পারেন। প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের পর অনেক ক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েট প্রযুক্তিবিদ হিসেবেও কাজ করতে সক্ষম হবেন।

আমাদের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা; বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশসাধন প্রযুক্তিনির্ভর অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে উন্নত জীবনযাপনে আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াসই শিক্ষা মূল ভিত্তি।

ডিপ্লোমা শিক্ষাকে দক্ষ জনশক্তি তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে বার বার। ঘোষণা দেয়া হচ্ছে এ শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধিরও। তবে বাস্তবতা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অবহেলা আর সঙ্কটের মুখে পড়ে আছে এ শিক্ষাই। ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর শিক্ষার্থী আর শিক্ষা গ্রহণ শেষে প্রতিটি ক্ষেত্রই কেবল উপেক্ষা আর বৈষম্য। সরকারি পলিটেকনিকগুলোতে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ পদে কোন শিক্ষকই নেই। অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষও নেই অধিকাংশতেই। শিক্ষক ছাড়াই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে

www.pathagar.com

চলছে অসংখ্য বিভাগ, যেখানে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর চার বছরের ডিপ্লোমা পাসের পর নেই উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থা।

বর্তমানে দেশের ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে নতুন করে চালুকৃত দ্বিতীয় শিফটের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে নিভুনিভু হয়ে। ৮০ ভাগ শিক্ষক সঙ্কট নিয়েই ওই শিফট চালু করা হয়েছে। এরপর রয়েছে বেসরকারি ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেধরক দৌরাত্ম্য। এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার আড়ালে দেশজুড়ে চলছে শিক্ষাবাণিজ্য। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের বড় কর্তাদের ম্যানেজ করে নেয়া হচ্ছে একের পর এক বেসরকারি ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন অথচ এতে ক্যাম্পাস শিক্ষক, লাইব্রেরি বলতে গেলে কিছুই নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা আর প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অসহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত পূরণ হচ্ছে না দেশের লাখ লাখ ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন। উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেয়ার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরেও বাস্তবায়ন করেনি দেশের কোনো প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান কার্যক্রম শুরু করতে ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বরে চিঠি দিলেও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত নিম্নমানের ডিপ্লোমা সনদের কারণে তা কার্যকর করেনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়।

স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আক্ষেপ করে বলেছেন অনেক অভিভাবকই সন্তানকে ডিপ্লোমা শিক্ষার মান ও মর্যাদার কারণে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে চান না। ডিপ্লোমা শিক্ষাকে দক্ষ জনশক্তি তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে অভিহিত করা হলেও এ খাতই সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার। জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে ২০২১ সালের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর ২০ ভাগ ডিপ্লোমা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ শিক্ষায় শিক্ষিতের হার মাত্র ৩ শতাংশ অথচ উন্নত দেশগুলোতে এ হার ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যুক্তরাজ্য, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুরে ১৭ থেকে ৫৮ শতাংশ মধ্যম স্তরের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়। ফলে এসব দেশের মানুষের বার্ষিক আয় সাত হাজার থেকে ৪২ হাজার মার্কিন ডলারের বেশি।

ডিপ্লোমা প্রাপ্ত জনশক্তির কর্মের মাধ্যমে প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে। ডিপ্লোমা শিক্ষাকে প্রতিযোগিতাময় করতে সব দেশেই

www.pathagar.com

ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদেশি শিক্ষক ও ছাত্র ভর্তি করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সরকারি /বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বিদেশি শিক্ষক ও ছাত্র ভর্তিতে চরম ব্যর্থ হয়েছে।

উন্নত দেশে জাতীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা দিবস পালন করে মেধাবী/উচ্চ বংশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পেরিয়ে গেলেও কারিগরি শিক্ষাবোর্ড জাতীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা দিবস পালনে উদ্যোগী হয়নি।

ডিপ্লোমা শিক্ষা হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। এসএসসি বিজ্ঞান বিভাগে পাস করার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকরি যোগদানের বয়স পাবলিক সার্ভিস কমিশন পিএসসির মাধ্যমে জাতীয়ভাবে নির্ধারণ করা হয়। ভর্তির সাথে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। দীর্ঘ ৪ বছর পূর্ব-নির্দিষ্ট সিলেবাসের অধীনে অধ্যয়নের পর সমাপনী পরীক্ষার মাধ্যমে কোর্স সমাপ্তি ঘটে। ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করে জাতির প্রতি থাকে অবিচল আস্থা ও সৃষ্টি হয় নিষ্ঠা ও কর্তব্য পরায়ণতা।

কারিগরি/ভোনেশনাল/টেকনিক্যাল/বৃত্তিমূলক/কর্মমুখী শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে কোনো বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই। পূর্ব শিক্ষাগত যোগ্যতা বা বয়স নির্ধারণ করা হয় না। ১ ঘণ্টা থেকে ২ বছর যে কোনো মেয়াদে কোর্স সম্পন্নের সুযোগ থাকে। এই সমস্ত অনিয়ন্ত্রিত ডিপ্লোমাধারীর জাতির প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ড জাতীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা ও ভোকেশনাল বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে একাকার করে জাতিকে চরম বিভ্রান্তির মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, মালেয়েশীয়া, ভারত প্রাতিষ্ঠানিক ডিপ্লোমাধারীদের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে উন্নতির শীর্ষ শিখরে উপনীত হয়েছে। আমরা গত ৪৪ বছরে ৪৪টি জেনারেশনকে গলাটিপে হত্যা করেছি। মধ্যম আয়ের দেশ, ইমাজিং টাইগার, ডিজিটাল বাংলাদেশ নীতি বাক্য আওড়াচ্ছি। প্রতিনিয়ত একটি জাতি দীর্ঘদিন কর্মহীন/শ্রমহীন/প্রযুক্তি জ্ঞানহীন থাকলে তার পতন অনিবার্য। এরই মধ্যে গত ৭ মে ২০১৪ তারিখে একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে শিক্ষামন্ত্রী আক্ষেপ ও হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন মেধাবী ও উচ্চবংশের ছেলেমেয়েরা ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় না/পড়তে চায় না। শিক্ষামন্ত্রী দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে

www.pathagar.com

এই মন্তব্য আমরা হতভম্ব হয়েছি। প্রতি বছর ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তার অর্ধেক অর্থাৎ ৭ লক্ষ তরুণকে ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার জন্য সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকতা শিক্ষামন্ত্রীকেই দূর করতে হবে। আমরা সেই দিনটির অপেক্ষায় রইলাম।

দৈনিক কালের কণ্ঠ : ২৩ জুলাই ২০১৪

www.pathagar.com

সড়ক দুর্ঘটনা : বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে

সড়ক দুর্ঘটনার মতো একটি স্পর্শকতার বিষয় আমাদের দেশে নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পত্রিকা খুললে এবং টিভির পর্দায় চোখ রাখলে দেখা যায় অনাকাঙ্ক্ষিত মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর! প্রতিদিনই গড়ে ১৮ থেকে ২০ জন লোক মারা যাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনায়। বিআরটিএ'র হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছরে ১২ থেকে ১৫ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করছে। দেশের ক্ষতিসাধিত হচ্ছে ৮ হাজার কোটি টাকা।

১৪ আগস্ট ২০১২ মিরশরাই-এ সড়ক দুর্ঘটনার আহত হয় উদীয়মান সাংবাদিক ভালোবাসার মানুষ ফখরুল ইসলাম রিয়াজ। জাতীয় শোক দিবসের দিন উন্নত যন্ত্রপাতি, চিকিৎসক, নার্স, অসহায় হাজারো শোকার্ত স্বজনের সামনে মর্মস্পর্শী মৃত্যুদৃশ্যের কাউন্টডাউন অবলোকন সকলকে বেদনাহতের পাশাপাশি বিক্ষুব্ধ করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় দায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল জনমত। আর এই জনমতকে দেশের সর্বস্তরের মানুষ জনসমর্থন দিয়ে একটাই স্লোগান ও দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়েছে। এভাবে অকাল মৃত্যু নয়—চাই নিরাপদ সড়ক, চাই স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা। কিন্তু কেন এই ভয়াবহ মৃত্যু ফাঁদ! যা কিনা প্রতিনিয়ত জনজীবনকে নিয়ে যাচ্ছে জীবনের শেষ ঠিকানায়? এর কি কোনো প্রতিকার নেই।

অন্য সব ক্ষেত্রের মতো যোগাযোগ ক্ষেত্রেও কায়েমি ক্ষমতার দাপট চরম হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের তালিকা ধরে যোগ্যতার পরীক্ষা ছাড়া গত ১৮ বছরে এক লাখ ৮৯ হাজার ব্যক্তিকে পেশাদার চালকের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। সকল সরকারের আমলে এই ফেডারেশনের দেয়া তালিকা অনুযায়ী এসব লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা ছাড়া আরো ২৭ হাজার ড্রাইভিং লাইসেন্স পাইয়ে দিতে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নগুলো নানান বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

চালক যদি গাড়ি চালানোতে অদক্ষ হয়, ট্রাফিক আইন-কানুন যদি সে না বোঝে, বুঝলেও যদি সে না মানে, রাস্তায় যেসব নির্দেশনা সিগন্যাল আছে সেসব যদি সে না বোঝে, বুঝলেও যদি সে অবজ্ঞা করে, যদি তার ভেতরে শাস্তির ভয় না থাকে, কঠোর আইন না থাকে, থাকলেও যদি সে উপেক্ষা করে, আইনের প্রয়োগ না থাকে তাহলে দুর্ঘটনার পরিমাণ বা সংখ্যা বেড়ে যেতে বাধ্য। অসংখ্য এবং অস্বাভাবিক দুর্ঘটনার পেছনে গাড়ির অদক্ষ চালক, এটি অস্বীকার করা অন্যায়।

বর্তমানে গাড়ি পরিচালনায় দুটি পক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। একপক্ষ দেশবাসী; অন্যদিকে সরকার ও প্রশাসন। দেশবাসীর দাবি হলো প্রশিক্ষণবিহীন ব্যক্তিকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া বন্ধ করা। সরকার ও প্রশাসনের নীতি হলো গরু-ছাগল চিনতে পারলে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা। অনন্তকাল থেকে নিপীড়িত, নির্যাতিত, অবহেলিত, বঞ্চিতদের সহায়তার শেষ আশ্রয়স্থল বিচারালয় বা আদালত পাড়া। দেশবাসীদের পক্ষের সংগঠন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সড়ক নিরাপত্তা ও যাত্রীদের সুরক্ষা প্রদানে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি আবেদন করে। আইনজীবীরা শুনানিতে মাননীয় আদালতকে জানান সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অথচ রাষ্ট্র নাগরিকদের সে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছে। দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে এ ধরনের ঘটনা বারবার ঘটছে।

এর প্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়া গাড়ি চালানোর পেশাদার লাইসেন্স না দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে মহামান্য হাইকোর্ট। অন্যদিকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি কারো চাপের মুখে লাইসেন্স না দেয়ার সুপারিশ করেছে। ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ দীর্ঘ দু'দশক ধরে প্রতিটি উপজেলায় সরকারি/বেসরকারিভাবে ড্রাইভিং প্রযুক্তিবিদ্যায় একাধিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, সভা-সেমিনার, দৈনিকগুলোতে নিবন্ধ প্রকাশ, আকাশ মিডিয়া টক-শো আয়োজন করে জনমত সৃষ্টি করছে। প্রবল জনচাপের মুখে ৩ জানুয়ারি ২০১১ তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে ড্রাইভিং প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার জন্য অনুরোধ করে পত্র লেখেন। দু'মন্ত্রীর চিঠি আদান-প্রদান ফলপ্রসূ না

www.pathagar.com

হওয়ায় এপ্রিল মাসে বিআরটিএ চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে শিক্ষা সচিবকে পুনরায় তাগিদাপত্র প্রেরণ করা হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এই ক্ষেত্রেও মন্ত্রী-মন্ত্রী, আমলা-আমলা, পত্র-চিঠি, আদান-প্রদান খেলায় জাতি হবে বঞ্চনার শিকার।

২০০৫ সালে ড্রাইভিং প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার ব্যাপারে তৎকালীন বিআরটিএ চেয়ারম্যান ও ডিপ্রশিগকা'র নেতৃবৃন্দের সাথে কয়েক দফা মতবিনিময় সভা হয়েছিল। বিআরটিএ'র অধীনে জরুরিভাবে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোরের কর্নেল, মেজর পদবির বেশ কয়েকজন তরুণ অফিসার প্রেষণে বিআরটিএ-তে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। বিআরটিএ ব্রিটিশ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এই তিন আমলের ৭৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ড্রাইভিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার মতো ভূমি ও জনবল বিদ্যমান। সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শুধু ড্রাইভিং প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করার বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায় এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবে রূপ দেয়া যায়নি। তাহলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা কে বাঁধিবে?

জাতি অধির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায় এবং এর কার্যকারীতার বদৌলতে এ দেশের সড়ক দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যু চিরতরে বন্ধ হবে। সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও সমস্যা সমাধানের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করবেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ দেশের বিচারব্যবস্থার অনেকগুলো নির্দেশ/রায় মাইল ফলক হিসেবে অনন্তকাল বিশ্ব বিচারব্যবস্থায় আলোচিত ও অনুকরণীয় হয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের সুবিচেনায় নিম্নোক্ত ৬ দফা নির্দেশনা প্রদান করলে সড়ক ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। শিক্ষিত তরুণদের ড্রাইভিংয়ের মতো মহৎ পেশায় আগমন ঘটবে। বিদেশে উচ্চ বেতনে ড্রাইভিং পদে জনশক্তি রপ্তানি হবে। দেশে উন্নতমানের গাড়িশিল্প গড়ে উঠবে। বাংলাদেশে দ্রুত গাড়ি রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হবে। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমিছিল থমকে যাবে।

* সরকারি, আধা-সরকারি, পুলিশ, সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনীতে ড্রাইভার পদে নিয়োগের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণীর পরিবর্তে এসএসসি পাসের পর ৪ (চার) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ড্রাইভিং প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা বাধ্যতামূলক নিয়োগনীতি সংশোধন করা। (ড্রাইভার পদে বিদ্যমান সরকারি বেতন কাঠামো স্নাতক ডিগ্রিধারী অফিস সহকারী থেকে উপরের স্কেলে নির্ধারিত রয়েছে)

www.pathagar.com

* বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থাকে (বিআরটিএ) একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে দেশ বিদেশের সর্বশেষ আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি সংযোজন করা।
* ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ড্রাইভিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি শিক্ষা কোর্স চালু করা।
* বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা পরিচালিত ড্রাইভিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোর নাম পরিবর্তন করে ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি করা।
* সরকারি/বেসরকারিভাবে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নে একাধিক ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করা।
* তৃণমূলে ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা নীতি সহজ ও সরলকরণের লক্ষ্যে ব্রিটিশ, পাকিস্তানিদের গড়া বিচ্ছিন্ন মতাদর্শের ডিপ্লোমা নিয়ন্ত্রণকারী ৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা শিক্ষা কার্যক্রম পৃথক করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক বিভাগে স্বাধীন/স্বতন্ত্র ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠার নির্দেশ প্রদান করা।

এই সমস্ত গঠনমূলক নির্দেশনার আলোকে সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার সহজ সরল সমাধান ঘটবে। সম্ভাবনাময় তরুণ রিয়াজের মৃত্যুদৃশ্যের যবনিকাপাত হবে। সড়ক হবে নিরাপদ যাত্রার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

দৈনিক সংবাদ : ১৬ নভেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

বেওয়ারিশ লাশের মিছিল

গত শতাব্দী ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নয়নে জয়জয়কার। বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উত্থান সকল বিজ্ঞানকে ছাড়িয়েছে। এর সুফল মানবজাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ভোগ করবে। বিগত শতাব্দীতে চিকিৎসাবিজ্ঞান সাফল্যের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বার্লিনে জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটির সভায় ম্যাক্স প্লাংক 'কোমাস্টাম থিওরি' সেটি ১৯০০ সালে। অস্ট্রেলিয়ান চিকিৎসক কার্ল ল্যান্ড স্টেইনার ১৯০১ সালে প্রমাণ করেন মানব রক্ত মূলত তিন ধরনের। তিনি রক্তকে 'এ', 'বি, এবং 'ও' গ্রুপে ভাগ করেন। এই বিভাজনের ফলেই এক দেহের রক্ত আরেক দেহে দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। পরে ল্যান্ড স্টেইনার আর-এইচ গ্রুপের রক্তও আবিষ্কার করেন।

স্কটিশ কার্ডিওলজিস্ট জেমস ম্যাকেনজি ১৯০২ সালে 'লাই ডিরেক্টর' নামে পলিগ্রাফ মেশিন উদ্ভাবন করেন। তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কিত গবেষণার জন্য মেরি কুরি ১৯০৩ সালে হেনরি বেকিউকেল এবং পিয়েরে কুরির সাথে যৌথভাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মেরি কুরি তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম পৃথকীকরণের জন্য ১৯১১ সালে রসায়নে দ্বিতীয়বারের মতো নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ব্রিটেনের বায়োকেমিস্ট ফ্রেডরিক হপকিন্স ১৯০৬ সালে মানবদেহের জন্য ভিটামিন শব্দটির উৎপত্তি ঘটান। একই বছর জার্মানির নিউরোলজিস্ট অ্যালাইস আলইনার মস্তিষ্কের কার্যকারিতার একটি বিশেষ ত্রুটি শনাক্ত করেন। এই ত্রুটির জন্যই স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

বেলজিয়াম, আমেরিকান রসায়নবিদ লিও বাকল্যান্ড ১৯০৭ সালে প্রথম প্লাস্টিক উপাদান ব্যাকেলাইট তৈরি করেন। জার্মানির ব্যাকটেরিওলজিস্ট পল আরসিচ ১৯১০ সালে সিফিলিস প্রতিরোধে আর্সেনিক ব্যবহার করেন। তার এই কাজের মধ্য দিয়ে সূচনা ঘটে আধুনিক কেমোথেরাপির। ১৯২০ সালে কানাডার চিকিৎসক ফ্রেডিরিক বানাটিং এবং তার সহযোগীরা

www.pathagar.com

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা উদ্ভাবন করেন। ১৯২৮ সালে স্কটিস ব্যাকটেরিওলজিস্ট আলোকজান্ডার ফ্লেমিং আবিষ্কার করেন 'পেনিসিলিন'। হাঙ্গেরিতে জন্ম নেয়া বায়োকেমিস্ট আলবার্ট সেন্ট গিয়র্গি একই বছর তৈরি করেন 'ভিটামিন সি'।

সিনথেটিক এলএসডি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সুইজারল্যান্ডের রসায়ন বিজ্ঞানী আলবার্ট হফম্যান ওষুধের হ্যালুসিনোজেনিক ইফেক্ট-এর বিষয়টি শনাক্ত করেন ১৯৪৩ সালে।

১৯৫২ সালে মার্কিন ভাইরোলজিস্ট জোনাস সলক প্রথম কার্যকরী পোলিও টিকা তৈরি করেন। একই বছর ব্রিটিশ রসায়নবিদ রোজালিন্ড ফ্রাংকলিন ডিএনএ'র এক্সরে ছবি তুলে দেখালেন যে, ডিএনএ অণুর গঠন ক্রুর মতো প্যাঁচানো। লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রথম অপারেশনটিও সম্পন্ন হয় এ বছরই। পুরুষ জর্জ জর্জেনসন অপারেশনের পর রূপান্তরিত হন নারী ক্রিস্টিন জর্জেনসন।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার গ্রেট ব্যাক ১৯৫৮ সালে প্রথম স্থাপনযোগ্য কার্ডিয়াক 'পেসমেকার' তৈরি করেন। ১৯৫৯ সালে ওল্ডুভাই জর্জ এবং মেরিনিকি তানজিনিয়ার ফসিলকৃত মনুষ্য মস্তিষ্ক খুঁজে পান। খুলিটি ১৮ লাখ বছর আগের মানুষের। মার্কিন সার্জন জেনারেল ১৯৬৪ সালে প্রথম সর্তক করে দেন যে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। একই বছর মার্কিন সার্জন মাইকেল ডিবাকি প্রথম সফল করোনারি-আর্টারি বাইপাস অপারেশন করেন। মার্কিন রেডিও অ্যাস্ট্রেনোমার আর্নোপেনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসন ১৯৫৫ সালে আবিষ্কার করেন কসমিক ব্যাকগাউন্ড রেডিয়েশন। এর ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিগ ব্যাং থিওরি ব্যাখ্যা করা সহজ হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকান সার্জন ক্রিস্টিয়ান বার্নার্ড ১৯৬৭ সালে প্রথম সাফল্যের সঙ্গে মানুষের হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করেন। ইথিওপিয়ার হাডরে ডোনাল্ড জনসন এবং তার সহকর্মীরা ১৯৭৪ সালে খুঁজে পান ৩২ লাখ বছর আগের কংকাল। 'লুসি' নামের এই কংকালটি মানুষের পূর্বপুরুষ 'অস্ট্রোলেপিথেকাস অ্যাফলবেনসিস' গোত্রভুক্ত। ১৯৭৫ সালে বিজ্ঞানীরা মানব মস্তিষ্কে 'অ্যান্ডেরফিন' (অ্যান্ডোজেনাস মরফিন) নামক প্রাকৃতিক চেতনানাশক উপাদান শনাক্ত করেন। করোনারি আর্টারির জমে যাওয়া রক্তপ্রবাহ সচল করতে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ১৯৭৭ সালে বেলুন এনজিয়োপ্লাস্টি ব্যবহার করেন। ১৯৭৮ সালে লুইস ব্রাউন নামক বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেবী জন্ম নেয় ইংল্যান্ডে।

www.pathagar.com

১৯৮০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করে যে, পৃথিবী থেকে গুটিবসন্ত নির্মূল করা হয়েছে। মার্কিন ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রথম জেনেটিক উপায়ে তৈরি ওষুধ ব্যাকটেরিয়াজাত ইনসুলিনকে অনুমোদন দেয়, যা ডায়াবেটিস চিকিৎসায় ব্যবহার্য।

১৯৮২ সালে ইউনিভার্সিটি অব উটাহ মেডিক্যাল সেন্টারের সার্জনরা ডা. উইলিয়াম ডেবরিজ-এর নেতৃত্বে বার্নি ক্লার্ক এর অকোজো হৃৎপিণ্ড অপসারণের পর কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড স্থাপন করেন। ইংল্যান্ডের লিচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে অ্যালেক জেফ্রিস এবং তার সঙ্গীরা উদ্ভাবন করেন 'জেনেটিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট' ডিএনএভিত্তিক এর পরীক্ষার মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তিকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা সম্ভব।

মানব ডিএনএ'র গোপন সংকেত পাঠোদ্ধারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে জেনোম প্রজেক্ট শুরু হয় ১৯৯০ সালে। এই উদ্ভাবনগুলোর সুফল বিশ্ববাসীর সাথে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক উপকৃত হচ্ছে। শারীরিক, মানসিক, দৈহিক সুস্থতার পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের জীবনকাল বাড়ছে। গত ৬২ বছরে মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৩৩.০৬ বছর বেড়ে গেছে। ১৯৫০ সালে মানুষের গড় আয়ু যেখানে ছিল ৩৭ বছর, সেখানে বর্তমানে ২০১২ সালে গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০.০৬ বছরে।

উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ মানবসভ্যতার সকল অর্জনকে ধূলিসাৎ করেছে সড়ক দুর্ঘটনায়-অপমৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতি। এর পরিমাণ বছরে সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা। চালকের প্রশিক্ষণ, দুর্বল আইন, পরিকল্পনা ছাড়া মহাসড়কের নকশা তৈরি ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং যথাযথ তদারকি না থাকায় দেশে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনা। প্রতি বছর দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় ১২ হাজার মানুষ। হতাহতদের চিকিৎসা বাবদ বছরে দেশের মোট চিকিৎসা বাজেটের ৩০ শতাংশ ব্যয় হয়। এ ছাড়া হাসপাতালের ৩৩ ভাগ সিট সারা বছর দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

আমরা সবাই সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকিতে আছি। দেখা গেছে অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতরা বেওয়ারিশ লাশে পরিণত হয়। গত তিন বছরে ঢাকায় ৫ হাজার ৫৭৬টি বেওয়ারিশ লাশ উদ্ধার হয়েছে। রাজধানীর বাইরের জেলাগুলোতে উদ্ধার হয়েছে আরো প্রায় ৫ হাজার বেওয়ারিশ লাশ। আজুমান মফিদুল ইসলাম ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এই লাশের দাফনকাজ সম্পন্ন করে। উদ্ধার করা লাশের অধিকাংশই সড়ক দুর্ঘটনার শিকার। দেখা গেছে

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার একটি অন্যতম কারণ ড্রাইভারদের ঝুঁকি উপলব্ধি করার অক্ষমতা।

সেজন্য পথেঘাটে দুর্ঘটনা আর প্রাণহানি নিত্যদিনের। আমাদের স্মৃতিতে যতগুলো ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির দুঃস্বপ্ন জমা হয়ে আছে সেসবের অধিকাংশ ঘটিয়েছে 'হেলপার' ড্রাইভাররা। মূল্যবান গাড়িগুলো চালনা এবং দুর্ঘটনা কমাতে ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে না। দ্রুততম সময়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪ বছর মেয়াদি আন্তর্জাতিক মানের ডিপ্লোমা ইন ড্রাইভিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কোর্স চালু করা প্রয়োজন। ডিপ্লোমা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ বিকেন্দ্রীকরণে প্রয়োজন বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড। জাতিকে অপমৃত্যু ও বেওয়ারিশ লাশে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষার অনন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন প্রশিক্ষিত পেশাদার ড্রাইভারগণ।

দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ : ৩১ অক্টোবর ২০১২

www.pathagar.com

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি

আওয়ামী লীগের গেল নির্বাচনী ইশতেহারে ১৩.৪ অনুচ্ছেদে প্রতি পরিবার থেকে একজনকে চাকরি দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। দেশে বেকার সমস্যা বেড়ে চললেও এ সমস্যা সমাধানে এখনো পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কয়েক হাজার চাকরির সুযোগ আছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবে জটিলতা সৃষ্টি করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যাচ্ছে না। ফলে বেকার সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠেছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে প্রবাসী শ্রমিকদের ফেরত আসা, প্রবাসী আয় কমে যাওয়া, শিল্প বিনিয়োগ স্থবিরতা এবং মূলধনী যন্ত্রের আমদানি কমে যাওয়ায় শ্রম বাজার এখন মারাত্মক সংকটের মুখে। সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীরগতির কারণে গ্রামাঞ্চলে কাজ নেই। একদিকে বছরপ্রতি গড়ে ২০ লাখ নতুন মুখ শ্রমবাজারে যোগ হচ্ছে, তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে আরো নতুন বেকার। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারি খাতে আরো বেশি বিনিয়োগ, জনশক্তি রপ্তানির নতুন বাজার সন্ধান, অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিল্প ও প্রযুক্তিজ্ঞান, বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত।

ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশের হিসাব মতে, দেশে বেকার ও ছদ্ম বেকারের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। বিশাল এ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে চুরি ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা আরো বাড়তে থাকবে। সেইসঙ্গে বাড়তে থাকবে খুনের ঘটনাও। কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে সকল মহলের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কর্ম হলো জীবিকার নামান্তর। সুষ্ঠু ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট কর্মসংস্থানের বা জীবিকা থাকা অপরিহার্য।

পরিবারের বেকার সদস্যরা বোঝাস্বরূপ। তারা পরিবারে উপার্জনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ওপর নির্ভরশীল। তাদের ভরণ-পোষণ করতে গিয়ে

www.pathagar.com

পরিবারকে যেমন সব সময় আর্থিক চাপের মধ্যে থাকতে হয় তেমনি তারা নিজেরাও মানসিকভাবে পীড়িত থাকে। এই পীড়ন অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিপথগামী করে। দেশব্যাপী সন্ত্রাসের যে ব্যাপক বিস্তার, অপরাধের যে সয়লাব এবং অপকর্মের যে সংখ্যাধিক্য আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার পেছনে বেকারত্বের ভূমিকা প্রধান। অপরাধ ও সমাজ বিশ্লেষকদের ধারণা, বেকারত্বের উপশম হলে, প্রত্যেক বেকারকে যোগ্যতা মতো কর্মে নিয়োজিত করতে পারলে সন্ত্রাস, অপরাধ ও অপকর্মের ঘটনা দ্রুত হ্রাস পাবে।

এ ধরনের কল্যাণকামী উদ্দেশ্য ভ্রান্তধারণা সামনে রেখে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। আমাদের চোখের সামনে সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, জাপান যাদের লোকসংখ্যা ছাড়া আর কোনো সম্পদ ছিল না সে দেশগুলো তাদের জনগণকে একমাত্র উৎপাদনমুখী ডিপ্লোমা শিক্ষার মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করে তাদের দেশকে উন্নত, সুখী ও মর্যাদাশীল দেশে পরিণত করেছে। বিদেশ থেকে প্রশিক্ষিত শ্রমিক নিয়েও কাজে লাগাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে বেকারত্বের হার সারা দুনিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। অবনত জীবনমান, মাথাপিছু আয়ের স্বল্প হার, অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের জন্য বেকারত্ব বিশেষভাবে দায়ী।

জনগণকে বলা হয় জনসম্পদ। কর্মমুখী শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশে তা জনদায়ে পরিণত হয়েছে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত ও বিলম্বিত হচ্ছে। সংকট কমছে না, বরং দিনকে দিন সংকটের গভীর আবর্তে আমরা হারিয়ে যাচ্ছি। পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদের অভাবে বিত্তশালীরা শিল্পে বিনিয়োগ করছে না। জেলা উপজেলার বিসিক শিল্পনগরীগুলো পরিত্যক্ত হয়ে গোচারণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

জনবহুল আমাদের দেশে জনশক্তি রপ্তানি বেকারত্ব কমানোর আরেকটি বড় পথ। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করতে হয় অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ঝাড়ুদার, রাজমিস্ত্রি, মালী, গাড়িচালক। সম্প্রতি যোগ হয়েছে ১৪-২৫ বছরের সুন্দরী তরুণীদের হাউজ কিপার (আয়া) পদে বিদেশ প্রেরণ। যাদের বেতন ৫-১৫ হাজার টাকা মাত্র। অন্যদিকে মিশর, পাকিস্তান ফিলিপাইন, ভারত, শ্রীলংকা থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দেয়া হয়। তাদের বেতন ৫০ হাজার থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মতো ন্যাশনাল সার্ভিস ও কর্মসূচিতে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় নিয়োগ করা হয়েছে ৬৪ হাজার ৭৪৮ জন বোকার যুবশক্তি। নিয়মানুযায়ী সরকারি ভাতা

www.pathagar.com

পেলেও নিয়োগপ্রাপ্তরা প্রযুক্তি শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবে কর্মহীন অলস সময় কাটাচ্ছে। চুক্তিভিত্তিক চাকরির মেয়াদ শেষে কোথায় যাবেন, কোথায় কাজ পাবেন, পরিবার পরিজন নিয়ে কীভাবে চলবেন, এই ভেবে চরম মানসিক যন্ত্রণায় আছেন ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্পের কর্মীরা। এর মধ্যে চুক্তির মেয়াদ শেষে অনেকেরই নতুন চাকরিতে যোগ দেয়ার বয়স থাকবে না।

সাতটি বিভাগে স্বতন্ত্র ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করে—গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলায় পেশা ও পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা উচিত। সেখানে এসএসসি পাস তরুণদের ব্যাপক হারে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ করে দিলে কর্মহীনতা দূর হবে। ন্যাশনাল সার্ভিসে নিয়োগপ্রাপ্তরা কর্মহীন অলস না হয়ে সুনির্দিষ্ট কাজে মনোযোগী হবে।

কর্মমুখী ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদদের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনায় ন্যাশনাল সার্ভিস চালু করা হলে মহাজোট নেত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী উদ্যোগের সুফল দেশবাসী ভোগ করবে।

আলোকিত বাংলাদেশ : ১৮ জুন ২০১৩

www.pathagar.com

যোগ্য শিক্ষক নিয়োগে ব্যর্থ নেপ

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষার কর্ণধার। যথার্থ শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতিসাধন করতে পারে না। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাই সকল শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। তাই এই স্তরের শিক্ষকমণ্ডলীকে অধিকতর সহনশীল, উদার ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য তাঁর ছাত্রের মনে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলা, জ্ঞানের স্পৃহা সঞ্চারিত করা। এই জন্য শিক্ষককে হতে হয় সৃজনশীল ও নিবেদিতপ্রাণ। প্রতিটি ছাত্রের মানসিক প্রবণতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁকে জ্ঞাত হতে হয়। প্রতিটি ছাত্রের প্রয়োজন তাঁকে উপলব্ধি করতে হয়, আবিষ্কার করতে হয় প্রতিটি ছাত্রের পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনানুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতি।

শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলেন, তখন তিনি কার্যত একটি সমাজ ও একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন জাতি গঠনের মহানব্রতে নিয়োজিত থাকেন। বার্ট্রান্ড রাসেল শিক্ষকদের অভিহিত করেন—Guardian of the Nation Civilizan—'সভ্যতার অভিভাবক' হিসেবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজমান। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার প্রতি অমনোযোগিতা। উচ্ছৃঙ্খলতা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, হিংসাত্মক মনোভাব, ভিন্নমত সহিষ্ণুতার অভাব ইত্যাদি বেশ প্রকট। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব আজকের দিনে প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সরবরাহ ও শিক্ষকের মোট চাহিদার মধ্যে বড় রকমের ব্যবধান রয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে চালু রয়েছে ৫৩টি পিটিআই। প্রয়োজনের তুলনায় যা অত্যন্ত নগণ্য। এর মধ্যে ৫০টি স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠা করে। স্বাধীন বাংলাদেশ গত ৪৪ বছরে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মাত্র ৩টি। ৫৩টি পিটিআই'র মধ্যে ২০টিতে ১৮ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন এবং ৩৩টিতে ১ বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড) কোর্স চালু আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ৫৩টি পিটিআই'র দেখভালের দায়িত্বে আছে ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিক (নেপ)। নেপ-এর গোঁজামিল অপচয় দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশ-বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে। পঞ্চম, অষ্টম শ্রেণীর প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত হয়ে ডিজিটাল সরকারের শিক্ষাব্যবস্থাকে হুমকির মধ্যে ফেলেছে নেপ সংশ্লিষ্টরা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর আট বছর মেয়াদি হওয়ায় কথা। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একাডেমিক সিলেবাসবিহীন সার্টিফিকেট ইন এডুকেশনধারীদের মাধ্যমে এই ভিশন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

সরকার তার ডিজিটাল বাংলাদেশের অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপসহ আধুনিক মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ ক্লাসরুম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এই উপকরণগুলো কাজে লাগানোর জন্য দক্ষ জনশক্তি বা কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত শিক্ষক স্কুলগুলোয় না থাকায় সরকারের সরবরাহকৃত উপকরণ হয় অব্যবহৃত থাকবে, না হয় বেহাত হয়ে যাবে। তদুপরি দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত এক লাখ তিন হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকদের পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে; এই শর্তে তাঁদের সরকারিকরণ করা হয়। নেপ পরিকল্পনায় এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল এক বিশ্বব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করছি। আমাদের সামনে আসছে প্রযুক্তি প্রতিযোগিতার কঠিন চ্যালেঞ্জ। দ্রুত পরিবর্তনের ধারা আমাদের সামনে চলে এসেছে কম্পিউটার-ইন্টারনেট-রোবট প্রযুক্তির বিস্ময়কর প্রয়োগ এবং বিস্ফোরণ। এসব পরিবর্তন ও বিবর্তনের ঢেউ অনিবার্যভাবে উপলব্ধি করতে হবে আমাদের

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থাতেও। বাংলাদেশে ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী ৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬টির ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ ৪ বছর। আন্তর্জাতিকমানের কোর্স কারিকুলাম হওয়ায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সব দেশে উচ্চ বেতনে চাকরি করছেন। নেপ পরিচালিত ১৮ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন এবং ১ বছর মেয়াদি সিইনএড কোথাও গ্রহণযোগ্যতা নেই। উন্নত বিশ্বে শিক্ষাব্যবস্থায় এসেছে গুণগত ও মানগত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে শিক্ষকদেরই। শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষার শিক্ষাক্রমে এই পরিবর্তন ও বিবর্তন শিক্ষকসমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আলোকিত করছে।

আমাদের দেশে এখন থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় আরো একটি শ্রেণী যুক্ত হচ্ছে। এর নাম দেয়া হয়েছে শিশুশ্রেণী (প্রাক-প্রাথমিক)। এর মধ্য দিয়ে সরকারি স্কুলে চালু হচ্ছে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ৩৬ হাজার ৬৭২টি এবং ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতীয়করণ ২৬ হাজার ১৯৩টিসহ মোট ৬২ হাজার ৮৬৫ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সরকার প্রতিটি স্কুলে ১ জন করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ উদ্যোগ নিয়েছেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণের বর্তমান গতি অব্যাহত থাকলে তাদের প্রশিক্ষণ দিতে ১৬৪ বছর সময় প্রয়োজন হবে। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিকমানের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের অভাবে ডিজিটাল সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে। এছাড়াও ৬৭ হাজার ৩১৪টি প্রতিষ্ঠানে কিন্ডার গার্টেন, মাদ্রাসা, হাইস্কুল সংলগ্ন স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ৬০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। বিপুল সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নেপ কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। গত বছর প্রশিক্ষণবিহীন ১৩ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিতে গিয়ে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেছে মাত্র ৭ হাজার ৮ দশ ৭৬ জন। যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যাশিত ৪০ শতাংশ নম্বর পাওয়া প্রার্থীর আকাল এই প্রকটতার কারণ। এসএসসি পাস মেধাবী তরুণদের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত। তাহলে অন্যান্য ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদাও বেতন স্কেলে উন্নীত হওয়ায় সুযোগ হবে শিক্ষকদের। মেধাবীদের এ পেশায় আগমনের পথ উন্মুক্ত হবে। দুর্নীতিমুক্ত, মানসম্মত ও টেকসই শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের সম্মিলন ঘটাতে হবে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ, ও বিচক্ষণ শিক্ষক না হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে না। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অতি দ্রুত পিটিআই'র নাম পরিবর্তন করা উচিত। নতুন নাম হবে ইনস্টিটিউট অব প্রাইমারি এডুকেশন। এখানে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন কোর্স চালু করতে হবে। প্রতিটি জেলায় উপজেলায় সরকারি/বেসরকারিভাবে একাধিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষককে প্রাথমিক শিক্ষকতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ব্যর্থ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) থেকে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন কোর্স পৃথক করতে হবে। শিক্ষক হওয়ার পরিকল্পিত শিক্ষা পরিচালনা ন্যস্ত করতে হবে—প্রস্তাবিত বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ডের উপর।

দৈনিক নয়া দিগন্ত : ২১ এপ্রিল ২০১৪

www.pathagar.com

এসএসসি উত্তীর্ণদের ভর্তি উৎকণ্ঠা

গত ১৭ মে ২০১৪ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। ৮টি সাধারণ এবং মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ মোট ১০টি শিক্ষাবোর্ডে এবার গড় পাসের হার ৯১.৩৪ ভাগ। ৮টি সাধারণ বোর্ডে গড় পাসের হার ৯২.৬৭ ভাগ। পার্শ্ববর্তী ভারতে এসএসসির সমতুল্য পরীক্ষায় গত বছর হার ছিল শতকরা ৯৩.৬৪ ভাগ। আর এ বছর তা ৯৪.১৭ ভাগ। এককভাবে ৯৯.২৮ শতাংশ পাসের হার নিয়ে দেশের আটটি শিক্ষাবোর্ডের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। গতবারের দেশসেরা হওয়া আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। শহর ছাড়াও এবার মফস্বলের স্কুলগুলোও অতীতের চেয়ে ভালো ফল করেছে। শুধু পাসের হারই নয়, বেড়েছে জিপিএ-৫ সহ সব ধরনের সূচকও। পাশাপাশি বেড়েছে শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, কমেছে শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও।

ফল প্রকাশের পর প্রতিদিনই আমরা সংবাদপত্রে অদম্য মেধাবীদের খবর দেখতে পাই, যারা উঠে এসেছে হতদরিদ্র পরিবার থেকে। দিনমজুর, কাজের বুয়া, পোশাক কারখানার কর্মী—সবার ঘরেই এখন শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে।

গত পাঁচ বছরের মতো এবারও পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশিত হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। সময়মতো পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। এটি পরবর্তী ধাপের শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

পৃথিবীর উন্নত পদ্ধতির বলয়ে প্রবেশ করেছে পরীক্ষাপদ্ধতির এই ব্যবস্থাপনা। এজন্য আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা বাড়ছে। পিতামাতারাও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াতে যত্ন নিচ্ছেন। আমরা এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানাই। ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৯২

www.pathagar.com

জন অর্থাৎ ৮ শতাংশের মতো শিক্ষার্থী এবার কৃতকার্য হতে পারেনি তাদের বলব ব্যর্থতা জীবনের প্রথম ধাপে বাধাগ্রস্ত হয়েছে মাত্র। তাদের পরবর্তী শিক্ষাধাপগুলো আরো মসৃণ করার গুরুদায়িত্ব এখন সরকারের। আমাদের দেশে চাটার কিংবা লুটেপুটে খাওয়ার দল কিন্তু সব সময়ই ওঁৎপেতে থাকে সম্ভাবনার গলা টিপে ধরতে। সব গিলে ফেলতে তারা থাকে অধিক তৎপর। জ্ঞানপাপী অতি উৎসাহী ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে হতাশাগ্রস্ত হয়েছে। তারা দৈনিক ও মিডিয়াগুলোতে অনবরতঃ উষ্মা প্রকাশ করছে। শিক্ষার্থীদের অবজ্ঞা অবহেলা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে। এ দেশের মানুষ ভালো কিছু করুক এইটা তারা মনে প্রাণে চায় না। তাদের ধারণা সাদা চামড়ার লোকজন সবকিছু করতে পারে। দাদা বাবুরা কিছু করলে ছাতা নিয়ে এগিয়ে যায়।

ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশের ভিশন, মিশন, পরিকল্পনা আন্দোলন ভিন্নতর। প্রতি বছর মোট জনসংখ্যর সাথে ২৮ লাখ নতুন মুখ প্রবেশ করছে। কর্মক্ষম নতুন সদস্য যোগ হচ্ছে ২০ লক্ষ। তারা সবাই এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং সবাই সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবে এই প্রত্যাশা আমাদের। এর মধ্য থেকে অর্ধেক শিক্ষার্থী তরুণ ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে দেশব্যাপী কর্মে জড়িয়ে দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীর উত্তরীয় গলায় জড়াবে।

বিপুল সংখ্যক ডিপ্লোমাধারীদের কর্মে এ দেশে মানসম্মত শিল্প, কারখানা, হাসপাতাল গড়ে উঠবে। বাকিদের উচ্চ বেতনে বিদেশে কর্মসংস্থান হবে। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় আয় ৩০ হাজার ডলারে উন্নীত হবে। বিনা চিকিৎসায় কোনো লোক মারা যাবে না। গড় আয়ু ৯০ বছরে উন্নীত হবে। এ দেশের নাগরিক হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা হবে এসএসসি পাস বা ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

এই উচ্চবিলাসী ভিশন বাস্তবায়ন করতে হলে এ দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনীতির ধ্যান ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে 'গ্রহণ কর এবং উপার্জন কর, লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং' নীতি গ্রহণ করতে হবে। যেখানে হাইস্কুল আছে তারই পাশে ডিপ্লোমা শিক্ষা ইনস্টিটিউট নির্মাণ করতে হবে।

পরীক্ষার ফলাফল ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমের সঙ্গে শুধু শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎই নয়, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎও জড়িত। আজকের মেধাবীরাই আগামী

www.pathagar.com

দিনে বাংলাদেশের সম্পদে পরিণত হবে। ফলে শহর ও প্রান্তিক এলাকার সব শিক্ষার্থী যাতে প্রতিবন্ধকতাহীনভাবে শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সাধারণতই এসএসসি উত্তীর্ণরাই কলেজে একাদশ শ্রেণী বা ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়। এর বাইরে মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ড থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের অনেককেও কলেজে ভর্তি হতে দেখা যায়। এবার এসএসসিতে পাস করেছে ১০ লাখ ৮ হাজার ১৭৪ জন শিক্ষার্থী। এর বাইরে মাদ্রাসায় দাখিল পাস করেছে ২ লাখ ১১ হাজার ২০৩ জন। কারিগরি বোর্ড থেকে এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল) পাস করেছে ৮৩ হাজার ৯৫৪ জন। গত বছর ড্রপ দেয়া ভর্তি হতে ব্যর্থ হওয়া ৪ লাখ ১৩ হাজার ১১ জনসহ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু সংখ্যা ১৭ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

সরকারি হিসাবে এ মুহূর্তে সারা দেশে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য আসন রয়েছে ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৫৬৯টি। মাদ্রাসায় আলিম স্তরে আসন রয়েছে দুই লাখের বেশি। ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসন রয়েছে ৬০ হাজার। মোট আসন আছে ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫ শত ৫৯, ঘাটতি আছে ১০ লাখের বেশি। আসন সংখ্যার এই পরিসংখ্যান থেকে নিশ্চিত করে বলা যায়, কলেজে একাদশ শ্রেণী ও ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে বড় সংকট দেখা দিতে পারে। সংকট দেখা দেবে মানসম্পন্ন ও পছন্দের কলেজে ভর্তি নিয়ে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে জিপিএ-৫ এবং জিপিএ-৪.৮৮ থেকে জিপিএ-৩.৫ পর্যন্ত পাওয়া শিক্ষার্থীদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের অবস্থা আরো চ্যালেঞ্জের। বিজ্ঞানে মানসম্মত পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও হাতেগোনা কয়েক হাজার।

প্রতি বছর যে হারে শিক্ষার্থী মাধ্যমিকে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছে, মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, কিংবা প্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে না পেরে তাদের মেধা বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা নিশ্চিত করতে দেশে প্রয়োজনমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। যারা কৃতকার্য হয়েছে, তাদের অগ্রগতি ও পরবর্তী ধাপ সাফল্যজনকভাবে অতিক্রমের সবরকম ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

উন্নত বিশ্বে এসএসসি পাস ৭৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। সার্কভুক্ত দেশগুলোতে ৫৬ শতাংশ এসএসসি পাস শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। শিক্ষা গ্রহণ করে কোনো

www.pathagar.com

লোকই বেকার থাকে না। আমাদের দেশের এই হার মাত্র ৩ শতাংশ। আমাদের দেশে শিক্ষার সাথে কর্মের বাস্তব কোনো সম্পর্ক না থাকতে প্রতিটি জেনারেশনের প্রায় ১০ লাখ তরুণ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মের আলো থেকে বঞ্চিত থাকে। বলা হয়ে থাকে, শিক্ষার অল্প বিনিয়োগ থেকে ফল মেলে বহু গুণ। আমাদের সামনে এখন দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার হাতছানি। সর্বত্রই দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তির চাহিদা বাড়ছে। শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে এর গুরুত্বপূর্ণ বাহন। আমরা নিশ্চয়ই এ সুযোগ হেলায় হারাব না।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা নিয়ে আসে এবং তার সমাধান যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে করা না হলে জট বাঁধে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে এবারের এসএসসি ১৩ লক্ষ ৩৩১ জন এবং গত বছর ভর্তি হতে ব্যর্থ ৪ লক্ষ ১ হাজার ৩ শত ১২ জনের জন্য ভর্তির নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। অতিরিক্ত ১০ লক্ষ শিক্ষার্থীর আসন সৃষ্টি করতে হবে।

এক্ষেত্রে অবধারিতভাবে ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুযোগ অবধারিত করার মোক্ষম সময়। বর্তমান বিশ্বের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন প্রজন্মকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ডিপ্লোমা শিক্ষার বিকল্প নেই। এজন্য পর্যাপ্তসংখ্যক মানসম্পন্ন ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উপর কালো বিড়ালের ছায়াকে নীলে পরিণত করতে হবে।

দৈনিক সংবাদ : ২৪ জুন ২০১৪

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যহীনতা

লন্ডনভিত্তিক ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশেই স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষিত বেকারের হার সবচেয়ে বেশি, ৪৭ শতাংশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিবছর ২২ লাখ মানুষ শ্রম বাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু কাজ পায় মাত্র সাত লাখ। বাকি ১৫ লাখ মানুষ নিয়ে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের সর্বাধুনিক কোনো চিন্তাভাবনা নেই। একজন লেখাপড়া না-জানা মানুষ বেকার থাকা আর শিক্ষিত মানুষের বেকার থাকা অনেক পার্থক্য।

শিক্ষা নিয়ে প্রকাশিত একাধিক প্রতিবেদনে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ব্রিটিশ আমলের কেরানি তৈরি করার শিক্ষারও যে উপযোগিতা ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের সেটুকু উপযোগিতা না থাকা কেবল দুর্ভাগ্যজনক নয়, লজ্জাজনকও। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কাজের বাজারের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। বিশেষায়িত দক্ষতার ঘাটতির কারণে উচ্চশিক্ষার পরও ভালো কাজ পাচ্ছেন না স্নাতকেরা। স্নাতকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আর কাজের বাজারের চাহিদার মধ্যে বিশাল ফারাক থাকায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে।

গত এক দশকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান বাড়েনি। শ্রমবাজার ও শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের মধ্যে সমন্বয় নেই। স্থানীয় ও বিশ্ববাজারের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতদের কারিগরি জ্ঞান ও কাজ করার মতো দক্ষতা কম। বেকারত্ব বাড়ছে এমন ২০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ১২তম। প্রতিবছর শ্রমবাজারে ঢুকছে ১৩ থেকে ২২ লাখ মানুষ। ২০০৪-১১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় যুক্ত হওয়ার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের উচ্চশিক্ষায় যুক্ত হওয়ার হার ২০০৪ সালে ছিল ৫.৭%, ২০১১ সালে যুক্ত হয়েছে ১৩.২%। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের হার দুই শতাংশ বাড়ানো গেলে প্রবৃদ্ধির হার হবে

www.pathagar.com

৮%। ৮% প্রবৃদ্ধি হলে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ হওয়া সম্ভব।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও উচ্চশিক্ষায় পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুসারে এখানকার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো হলো তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষিজাত, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, চামড়া ও চামড়াজাতপণ্য, জাহাজনির্মাণ এবং তৈরি পোশাক খাত, পর্যটন ও পর্যটন সেবা, হালকা কারিগরি, নির্মাণ খাত। কিন্তু এসব খাতের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত যথাযথ কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের পোশাক কারখানা ও বায়িং হাউসে বিদেশি কর্মীর সংখ্যা কয়েক হাজার, যাঁরা প্রত্যেকে মোটা অঙ্কের বেতন পান। মার্চেন্ডাইজার, প্যাটার্ন মাস্টার ও ডায়িংয়ে অনেক বিদেশি কাজ করেন। বায়িং হাউসে মার্কেটিংয়ের দায়িত্বে আছেন বেশিরভাগ ভারতীয়। নির্বাহী পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক পর্যায়ে আছেন অনেক ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কান। আর ডায়িংয়ে ফিলিপাইনের কর্মী রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। কিন্তু বাংলাদেশের উচ্চ ও ডিপ্লোমা শিক্ষায় পোশাক খাতের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরির বিষয়টি তেমনভাবে গুরুত্ব পায়নি।

বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনায় গলদের কারণে মানসম্পন্ন কর্মী তৈরি সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা নিজের আগ্রহ ও পছন্দের বিষয়ে পড়তে পারেন না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে বিষয়ে সুযোগ পান, সেটা পড়তে বাধ্য হন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (আইএলও) তথ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। বেকারত্বের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালে মোট বেকারের সংখ্যা ছয় কোটিতে দাঁড়াবে।

শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মানবসম্পদের উন্নয়ন ও বিকাশ। কিন্তু বাংলাদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, তা কোনোভাবেই সময়ের চাহিদা মেটাতে পারছে না, মননের তো নয়ই, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা অগ্রগতির নির্দেশক না হয়ে সমাজের জন্য অনেকটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে স্বল্প দক্ষতা-অল্প মজুরি-কম উৎপাদনশীলতা-নিম্ন প্রবৃদ্ধির ফাঁদে আটকে গেছে বাংলাদেশ। কারণ এখানে শ্রমিকেরা কম শিক্ষিত ও অদক্ষ, ফলে উৎপাদনশীলতা কম, আর দক্ষতার অভাবে মজুরি পান কম। এ কারণে অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধিও কম।

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিক ডিপ্লোমা শিক্ষাই চাকরির বাজারের পদ-পদবি নির্ধারণ করে। শিক্ষাই শ্রমিকের দক্ষতাসহ যোগ্যতা নিশ্চিত করে। শ্রমশক্তিতে শিক্ষিত শ্রমিক থাকলে এর প্রতিদান আসে বেশি। উদীয়মান অর্থনীতিতে পরিণত হতে হলে বাংলাদেশকে মাধ্যমিক, কারিগরি, ডিপ্লোমা, বৃত্তিমূলক, উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর বিকল্প কিছু নেই।

রণসম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছেন 'একটি জয় হাজার জয়কে সামনে এগিয়ে নেয়, একটি পরাজয় লক্ষ পরাজয়কে পিছু টানে'। বাংলাদেশ একটি নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ। এ দেশে একটা সন্তানকে নার্সারি থেকে মাধ্যমিক ডিগ্রি পর্যন্ত লেখাপড়ার খরচ জোগাতে অনেক অভিভাবক বাড়ি-ঘর, চাষি জমি, হালের বলদ, মা-বোনের স্বর্ণালংকার বিক্রি করে পিতামাতার পেনসনের টাকা ব্যয় করে সর্বস্বান্ত হয়। উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা প্রত্যাশিত চাকরি ও কাজ না পেয়ে বেকার জীবন কাটায়। ফলে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। পরিবার হয় নিঃস্ব। এক সময় জৈবিক চাহিদার কারণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সন্তান জন্মদান করেন। সন্তানদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ঠিকমতো যোগান দিতে ব্যর্থ হয়। এভাবে বাংলাদেশের নাগরিকরা বীজগণিতের সমীকরণের ন্যায় (অভিভাবক, যুবক, সন্তান) গরিবি দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। জাতির এই অপচয় মেনে নেয়া যায় না।

বিশ্বখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন 'প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক শিক্ষা একটি জাতির শিক্ষার পরিমাণগত সংখ্যা নির্দেশ করে আর ডিপ্লোমা শিক্ষা কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধি করে।' বাংলাদেশে ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী বিচ্ছিন্ন মতাদর্শের ৭টি প্রতিষ্ঠান ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রসারে চরম ব্যর্থ হয়েছে। ভিন্ন মতাদর্শী ৭টি বোর্ড থেকে ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ পৃথক করে বিভাগীয় শহরভিত্তিক স্বতন্ত্র ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। বোর্ড যেখানে হাইস্কুল আছে তারই পার্শ্বে ডিপ্লোমা শিক্ষা ইনস্টিটিউট নির্মাণের উদ্যোগ নিবে। ডিপ্লোমা শিক্ষা গ্রহণ করে দক্ষকর্মী বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটাবে। মানহীন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ডিগ্রিকে লক্ষ্যহীনতার বেড়াজাল থেকে ছিন্ন করে জনকল্যাণের শিক্ষায় শিক্ষিত হবে।

দৈনিক সংগ্রাম : ২৪ মে ২০১৪

www.pathagar.com

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম : প্রতিভাদীপ্ত উত্তরণ

বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি বড় চ্যালেঞ্জ শিশুশ্রম সমস্যা। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম একটি বড় ধরনের সমস্যা। যে বয়সে শিশু বই নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা, সে বয়সে তাকে করতে হচ্ছে কঠোর শ্রম। দেশে শিশুশ্রমিক রয়েছে ৪৭ লাখ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রয়েছে ১৩ লাখ। ৫ থেকে ১৪ বছরের কোনো শিশু যখন সপ্তাহে ১৪ থেকে ৪৩ ঘণ্টা কাজ করে তখন তাকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বলে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

শিশুশ্রম নিয়ে অনেক লেখা হলেও দেশে শিশুশ্রম বন্ধ হচ্ছে না। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত প্রতিবছরই শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। আইএলও'র ১৩৮ এবং ১৮২ নম্বর কনভেনশন অনুযায়ী শিশুশ্রমিকের সংজ্ঞা হচ্ছে '৫-১১ বছর বয়সের যেসব শিশু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে; ১২-১৪ বছর বয়সের শিশু যারা হালকা কাজ ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে; এবং ১৫-১৭ বছর বয়সের শিশুদের শিশুশ্রম প্রাক্কলন করতে যে মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ পরিচালনা করে। এ ধরনের সর্বশেষ জরিপ করা হয় ২০০২-২০০৩ সালে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শিশুশ্রম সংক্রান্ত তথ্য ও পরিবীক্ষণ কর্মসূচি কর্তৃক প্রণীত ধারণা এবং সংজ্ঞা অনুসারে এই জরিপ করা হয়। এই জরিপ অনুযায়ী ২০০২-০৩ অর্থবছরে সমগ্র বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় ১৫ বছরের কম বয়সের শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫০ লাখ। আর একই সময় ১৮ বছরের নিচে শিশুশ্রমিক ছিল ৭০ লাখ ৯০ হাজার।

১৫-১৭ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে প্রায় ৭ লাখ শিশুশ্রমিক। শিশুশ্রমিকরা শ্রমিকের অধিকার, শিশুদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতন। দুর্বল

www.pathagar.com

এবং অসংগঠিত হওয়ার কারণে শিশুরা সহজেই শোষিত। এই পরিস্থিতির সুবিধা নিয়ে একশ্রেণীর কারখানার মালিক অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের নিয়োগ দেয় এবং তাদের ওপর অত্যাচার চালায়। কিছু কিছু কারখানার মালিক শ্রম আইনের তোয়াক্কা না করে শিশু শ্রমিককে শোষণ করে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছে। সাধারণত, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর শ্রমিকরা তাদের আইনসঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশের শ্রম আইন দ্বারা শিশুদের অধিকার স্বীকৃত তবে মালিকরা তা খুব কমই অনুসরণ করে থাকে। আইনত বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ।

এরপরও বাংলাদেশের শিশুশ্রমের বর্তমানে পরিসংখ্যানটি অত্যন্ত ভয়াবহ। এখনও এ দেশে শিশুর সংখ্যা ৭ কোটি। এদের শতকরা ৯০ জনই প্রাথমিক স্কুলে যায়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার আগেই অর্ধেকের বেশি ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। পরে এসব শিশুর অধিকাংশই শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদশের শ্রমবাজারে শিশুশ্রম একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইএলও'র মতে প্রায় ৩৪৭ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিশুরা জড়িত। তারে মধ্যে ৪৭ ধরনের কাজকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত খারাপ কাজগুলো হলো : (১) যৌনকর্ম, ২) চোরাচালানি কাজে শিশুর ব্যবহার, (৩) বিড়ি, ব্যাটারিসহ রাসায়নিক কারখানায় শিশুশ্রম, (৪) গ্লাস ফ্যাক্টরি, (৫) ট্যানারি, (৬) লবণ কারখানা, (৭) পরিবহন ক্ষেত্রে (টেম্পো ও মিনিবাসের হেলপার ও চালক, রিকশাচালক, ভ্যান চালক ইত্যাদি), (৮) ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহের কাজ, (৯) উটের জকি হিসেবে ব্যবহার, (১০) মাদকদ্রব্য ও অস্ত্রবহন কাজে ব্যবহার, (১১) ওয়েল্ডিংয়ের কাজ, (১২) গৃহকর্ম, (১৩) পথশিশু।

২০১০ সালের ৩০ জানুয়ারি দেশের সংবাদ মাধ্যমে রাজধানী ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকায় নিয়ামুল নামক এক শিশুকে অঙ্গহানি করে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করার খবর প্রকাশিত হয়। তখন সুশীলসমাজের পক্ষ থেকে এ ধরনের নিষ্ঠুর ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি ওঠে। কোর্ট কাচারি আদালত, কমিটি, সুপারিশ, প্রস্তাবনা অনেক কিছু হয়েছিল। কিন্তু ঘটনা ওখানেই। চলছে অবাধে শিশুশ্রম। সাধারণভাবে শিশুশ্রমের ফলে যে ধরনের ক্ষতিকর পরিণাম সৃষ্টি হয়;

* শিশুদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে;
* স্বাভাবিক শৈশব ও পারিবারিক জীবন নষ্ট হয়;

www.pathagar.com

* সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল হয়;
* শিশুদের শিক্ষা বিঘ্নিত হয়;
* শিশুরা উৎপাদন ক্ষমতার সর্বনিম্ন পর্যায়ের শ্রম উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। ফলে বয়স্ক অবস্থায় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে করে দেশ ও সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষতি বৃদ্ধি পায়;
* সংক্রামক ব্যাধি/যক্ষ্মার প্রসার ঘটে;
* কার্পেট ও সূচিশিল্পে দৈহিক ক্ষতি সৃষ্টি হয়;
* দীর্ঘশ্রম সময়ের কারণে দুর্ঘটনা বাড়ে;
* নিয়ন্ত্রণ ও আবদ্ধ কর্মপরিবেশের কারণে মানসিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়;
* দেশ ও জাতি উপযুক্ত নাগরিক থেকে বঞ্চিত হয়। শিশুশ্রম ও দারিদ্র্যতা একটি দুষ্টচক্রে পরিণত করে।

গত বছর মন্ত্রিসভায় 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন' নীতি অনুমোদন করে যেখানে বলা হয় ১৪ বছরের শিশুকে কোনো কাজে নিয়োজিত করা যাবে না, ১৮ বছরের নিচে হলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো যাবে না ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) শিশুশ্রম বন্ধ করতে এক কর্মসূচি হাতে নেয়। বর্তমানে বাংলাদেশসহ ৮০টি দেশ শিশুশ্রম বন্ধের জন্য একসঙ্গে কাজ করছে। আইএলও এর হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে প্রায় ২৪ কোটি ৬০ লাখ শিশু নানাভাবে শ্রম বিক্রি করছে। এর মাঝে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে ১৮ কোটি।

এক্ষেত্রে দারিদ্র্যের কাছে উপেক্ষিত শিশুশ্রমের আইন কানুন ও বিধিবিধান। আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘে ঘোষিত সনদের বিধান অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে প্রত্যেকে শিশু। শিশুদের বয়স যত কম, শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে তারা ততবেশি নাজুক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুরা নিজেদের রক্ষা করতে অসমর্থ। শৈশবের বয়সসীমা হচ্ছে শিশুর সামর্থ্য এবং দায়িত্ববোধের পরিবর্তন সম্পর্কে সমাজের ধারণার আনুষ্ঠানিক প্রতিফলন। প্রতিটি দেশে এ বয়সসীমা শিশুদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শিশুরা অভাবের তাড়নায় শ্রম দিতে শুরু করে। আর নিয়োগকারীরা এই দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে থাকে মানবিক বিবেচনার উর্ধ্বে থেকে। সুন্দর পৃথিবীতে আধুনিক শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিকতাবোধসম্পন্ন শিশুরাই ভবিষ্যৎ বিশ্বের কর্ণধার হবে। তাই শিশুদের নির্মল এবং বসবাসযোগ্য পরিবেশসহ খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সমতাপূর্ণ পরিবেশের পাশাপাশি আদর্শ

www.pathagar.com

নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। অসহায় ও প্রতিবন্ধী শিশুদের ওপর বিশেষ যত্নশীল হতে হবে দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের।

আমাদের দেশের শিশুশ্রম নিরসনে মধ্যম মেয়াদি ১টি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আজকে যারা ১৪-১৮ বছর বয়সী শিশু তারা অধিকাংশই এসএসসি পর্যন্ত লেখাপড়ায় শিক্ষিত। তাদেরকে কর্মপরিবেশ উপযোগী ডিপ্লোমা শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। ডিপ্লোমা শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সম্ভাবনাময়ী করে। পরিপূর্ণতা পায় জীবনধারণ চেতনায়। ক্ষীণ শীর্ণ কর্মে নিয়োজিত না হয়ে প্রতিভামুখী কর্মে আত্মনিয়োগের সফল স্বপ্ন বাস্তবায়ন হোক বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধের দিবসের প্রধান লক্ষ্য।

দৈনিক সংবাদ : ১৮ জুন ২০১৪

www.pathagar.com

উপেক্ষিত মাতৃভাষা শিক্ষার ইনস্টিটিউট

প্রত্যেকটি জাতির জীবনে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন থাকে। যে দিনটি জাতীয় জীবনে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এরূপ একটি দিন ২১ ফেব্রুয়ারি—মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাঙালির এক মহাকাব্যের নাম, শোক, শক্তি ও প্রেরণার উৎস। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, সালামসহ নাম না-জানা অগণিত অকুতোভয় সৈনিকের আত্মোৎসর্গে রচিত হয় এই মহাকাব্য। মহান একুশের বিশ্ব ইতিহাসে এক বিরল বীরত্বগাথার নাম, যা আজ শুধু বাঙালিদের ঐতিহ্যে ও চেতনার অংশ নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ের অনন্ত প্রেরণার উৎস।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এর উত্তরণ আমাদের অর্জনকে করেছে আরো মহান আরো গৌরবসিক্ত। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে ঘোষণা করেছে, যার ফলে প্রতি বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি 'মাতৃভাষা দিবস' রূপে পালিত হচ্ছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি তার মাতৃভাষা বাংলার মান রক্ষার জন্য প্রথম রক্ত দেয়, সে ঘটনার সাতচল্লিশ বছর পরে দিবসটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এজন্য আমরা গৌরবান্বিত। আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষা আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষার হাত ধরে যে এ রকম একটি বিপুল গৌরবদীপ্ত ঘটনা ঘটল তা আমাদের শিহরিত করে। যারা জাতীয় ভাষা বাংলার দাবি আন্দোলনের বিরোধিতা করে গুলি ছুঁড়েছিল সেই পাকিস্তানও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে ২১ ফেব্রুয়ারিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে।

মাতৃভাষা একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। জনগোষ্ঠীর ভাষার মৃত্যু হলে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক

www.pathagar.com

মৃত্যু ঘটে। যে জাতির মাতৃভাষা স্বীকৃত তার আত্মপরিচয় স্বীকৃত। বাংলাদেশে আমাদের বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতিসত্তার যেসব ভাষা রয়েছে সেসব আদিবাসী যেমন—চাকমা, মারমা, গারো, খাসি, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, ওরাওঁ প্রভৃতি ভাষার প্রতি বাংলাভাষীদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। বাংলা ভাষাভাষীদের জাতীয় কর্তব্য প্রতিবেশী আদিবাসী ভাষাসমূহ বিকাশে সহায়তা করা। যুগ যুগ ধরে এখানে বাংলা ও অন্য যেসব ভাষা সহাবস্থান করেছে, বাংলা ভাষা এ দেশের যেসব আদিবাসী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখা বাংলা ভাষাভাষীদের দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শিক্ষা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া; আপন আপন মাতৃভাষার প্রতি যত্নবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর মাতৃভাষার প্রতি যত্নশীল হওয়া। অন্য কোনো ভাষা যেন আমার ভাষাকে গ্রাস করতে না পারে। আমার ভাষাও যেন অপর কোনো ভাষাকে গ্রাস না করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আমাদের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে গিরি নির্ঝরী, ঝিড়ি ঝর্ণা ও অরণ্য বেষ্টিত প্রকৃতির লীলানিকেতন পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ অঞ্চলে বসবাস করে জনসংখ্যায় ছোট বড় ১৪টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী। এসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যায় বৃহৎ হচ্ছে চাকমা—প্রায় পাঁচ লাখ। অন্যান্য জাতিসত্তা হলো—মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, খিয়াং, পাংখোয়া, লুসাই, চাক, খুমি, বম, গুখট, অহমিয়া ও সাঁতওাল। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বহু জাতি, সংস্কৃতি এবং বহু ভাষাভাষীর মিলনক্ষেত্র। প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদত্ত না হলে ওই ভাষাগুলো শুধু যে বিকশিত হতে পারবে না তাই নয়, কালের কঠিন নিষ্পেষণে এক সময় হয়তো বিলুপ্ত হবে। তা হলে সেটা হবে একটা চরম ট্র্যাডেজি। প্রতিটি ভাষার উপর পৃথক পুস্তক প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষা কোর্স চালু করে এগুলোকে জীবন্ত রাখতে হবে।

দেশের অন্যান্য এলাকায় সংখ্যালঘুরা তাদের মাতৃভাষা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের আইনি অধিকার অদ্যাবধি না থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণ এই অধিকারটি ১৯৯৭ সালে পাবর্ত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে অর্জন করে। শিক্ষা লাভের আইনি অধিকার দীর্ঘ ১৭ বছর পরেও মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর লিপি সংরক্ষণ এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা সময়ের দাবি। ভাষার লিখিত চর্চা না থাকলে ভাষার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না। এ দেশের ক্ষুদ্র জাতিগুলোর ভাষা আধুনিক প্রযুক্তি সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্ণ/শব্দগুলো সংরক্ষণ

www.pathagar.com

করা প্রয়োজন। একুশ শতকে বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ মাতৃভাষা অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। একুশ শতকের শেষে বর্তমানে প্রচলিত হাজার হাজার মাতৃভাষার অধিকাংশই হয়তো আত্মরক্ষা করতে পারবে না অথবা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উপভাষা রক্ষার উপায় নিজেদের ভাষা, সাহিত্য, বর্ণমালা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হীনমন্যতা ছেড়ে শ্রদ্ধাশীল ও রক্ষণশীল হওয়া, কোনো অবস্থাতেই মাতৃভাষার বিকল্প ভাষারূপে বিদেশি ভাষা গ্রহণ না করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা অনেকদিন ধরে উন্নতমানের সাহিত্য সৃষ্টি করে আসছেন। অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে আমরা তা পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হয়েছি। সময় নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, রুশ, হিন্দি, উর্দু, ফার্সি, ইরাকি, আরবি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীরা উজ্জ্বল ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে। বিদেশি কূটনৈতিক মিশনে কর্মরতরা কেবল ইংরেজিনির্ভর। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি সাংস্কৃতিক সেন্টার বা হাইকমিশনও ভাষার উপর বিভিন্ন মান, মেয়াদে বিচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এতে সঠিকভাবে কোনো কাজই সম্পন্ন হচ্ছে না। সুনির্দিষ্ট শিক্ষা কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করে একটি নীতিমালার আলোকে ভাষা শিক্ষার কোর্স চালু করা উচিত।

আকর্ষণীয় নীতির কারণে দেশের তরুণরা দেশি বিদেশি ভাষাজ্ঞান রপ্ত করে বিশ্বব্যাপী কর্মে নিয়োজিত হতে পারে। বাংলা ভাষার মানমর্যাদা সিয়েরা লিওনের মতো বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা পাবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বাংলা সার্বিক অর্থে জনকল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

দৈনিক সংবাদ : ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

www.pathagar.com

সম্প্রসারিত হোক গ্রন্থসেবার পরিধি

বই সুস্থ চিন্তার প্রতীক। বই মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সমাজব্যবস্থার ভিত শক্ত করতে হলে বই সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। বইয়ের প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে ইউনেস্কো ২৩ এপ্রিলকে 'বিশ্ব গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস' ঘোষণা করে। এই দিনটিকে গ্রন্থ দিবস হিসেবে নির্বাচনের অন্তরালে মূল কারণ হচ্ছে, এ দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বসাহিত্যের দুই মহান ব্যক্তি শেক্সপিয়ার ও সারভান্তেস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশেও যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালিত হয়। বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে পালিত হচ্ছে এই দিবসটি।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ বইয়ের সমাহার হলো পাঠাগার। যার ইংরেজি শব্দ হলো লাইব্রেরি। ল্যাটিন শব্দ LIBER থেকে লাইব্রেরি শব্দের উৎপত্তি। লিবার (LIBER) শব্দের অর্থ হলো পুস্তক। খ্রিস্টের জন্মের দুই হাজার বছর পূর্বে আসিরীর রাজ্যে পৃথিবীর সর্বপ্রথম লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় আজকের মতো ছাপার অক্ষরে বই আকারে বাঁধাই পুস্তক ছিল না। তখন মাটি ও কাঠ উৎকীর্ণ করে জ্ঞান অভিজ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্য সংরক্ষণ করা হতো। আগের দিনে উৎসাহী রাজা জ্ঞানী-গুণীদের পুস্তক এবং নিজেদের বংশীয় ইতিহাস রচনা করে সংগ্রহে রাখত। নিয়মতান্ত্রিকভাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৪৭ সালে, যার নাম ভ্যাটিকান লাইব্রেরি, ১৬০২ সালে স্থাপিত হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্যার টমাস বড়লি লাইব্রেরি'। আমেরিকার প্রাচীনতম লাইব্রেরি ১৯৩৮ সালে জন হার্বার্ডের উদ্যোগে স্থাপিত হয়, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫৩ সালে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজা-বাদশা ও সামন্ত বিদ্যোৎসাহিতার জন্য গ্রন্থের সংগ্রহশালা গড়ে তুলতেন। মধ্যযুগে মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও বিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

সঙ্গে গড়ে তোলা হতো গ্রন্থের সংগ্রহশালা। পৃথিবীতে প্রথম লাইব্রেরি হয় প্রাচীন রোম দেশে। তারপর মিশর, ব্যাবিলন, চীন, তিব্বত ও ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিস্তারের সময়ও লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। আধুনিক বিশ্বে বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। প্যারিসের Bibliotheque national, লন্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মস্কোর লেনিন গ্রন্থাগার ইত্যাদি। এই লাইব্রেরিগুলোতে লাইব্রেরি বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ দিয়ে যুগোপযোগী ও জন আকর্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশেও বিখ্যাত অনেক গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, বরেন্দ্র মিউজিয়াম লাইব্রেরি ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।

গ্রন্থ ব্যবস্থাপনা ও বই পড়াকে জনপ্রিয় করতে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রায় চার দশকের বেশি সময় ধরে আলোকিত মানুষ তৈরির লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৭৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। পাঠাগারকে জ্ঞানের রাজ্য বলা হয়। জ্ঞানের আলোতে বিকশিত এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য সখ্য গড়ে তুলতে হয় পাঠাগারের সাথে। পাঠাগারে থাকে হাজার হাজার বছরের অতীত হওয়া জ্ঞানী গুণী লেখকদের মেধা ও জ্ঞান সম্বলিত বই, যা পড়ে আমরা হাজার বছর পেছনে অনায়াসে চলে যেতে পারি। জানতে পারি তখনকার সময়ের মানবসভ্যতার ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে। জানতে পারি তখনকার গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, গান, পুঁথিসহ তাদের সাহিত্যচর্চার ধরন। শুধু অতীত নয় বর্তমান লেখকদেরও নানা প্রকাশিত বইয়ের সমাহার থাকে পাঠাগারে। পাঠাগার হলো অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন। পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন বলেছেন—'বই জ্ঞানের, বই আনন্দের প্রতীক। সৃষ্টির আদিকাল হইতে মানুষ আসিয়াছে আর চলিয়া গিয়াছে। খ্যাতিমান, অর্থশক্তি কিছুই কেহ রাখিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু বইয়ের পাতা ভরিয়া তাহারা তাহাদের তপস্যা, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের নৈরাশ্য, কি হইতে চাহিয়া কি তাহারা হইতে পারে, সবকিছু তাহারা লিখিয়া গিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—'মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে। মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমনি করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত তবে

www.pathagar.com

সে নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মহাসমুদ্রের মানবাত্মার অপর আলোকে কালো অক্ষরের শৃঙ্খলা কাগজের কারাগারে বাধা পড়িয়া আছে।'

বর্তমানে আমাদের দেশে বাণিজ্যিক হারে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গাণিতিক হারে শিক্ষার্থী/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা বাড়ছে বইয়ের। এই চাহিদা পূরণে রাজধানী শহর থেকে গ্রামে পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে লাইব্রেরি। এইসব লাইব্রেরি যারা পরিচালনা করেছেন তাদের লাইব্রেরি বিজ্ঞানে ন্যূনতম শিক্ষা প্রশিক্ষণ নেই। বই যেখানে ডিপ্লোমা লাইব্রেরিয়ান সেখানে এই নীতিতে দেহ-মন সুস্থ রাখার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

সকল শ্রেণি-পেশার মানুষসহ শিক্ষার্থীর পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও শিক্ষা অর্জনের পথ সুগম করতে গণগ্রন্থাগার হলো জনগণের বিদ্যালয়। একজন সৃজনশীল পাঠক গণগ্রন্থাগার থেকে সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় বই-উপকরণ সংগ্রহ করে তার শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারেন। যুগ পরিবর্তন হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও রুচিবোধ। বিকাশ ঘটছে জ্ঞান ও গুণের। যতই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের উন্নত করছে এর পেছনে যার বিশেষ অবদান তার নাম গ্রন্থাগার। এটি চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে। সরকারি পরিচালনায় জেলাভিত্তিক নড়বড়ে মানদণ্ডে লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলেও তৃণমূল বা ইউনিয়ন পর্যায়ে এর উপস্থিতি চোখে পড়ে না। থানাভিত্তিক পাঠাগার অতীব জরুরি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য। লাইব্রেরি শিক্ষার ইনস্টিটিউট গড়ে ওঠেনি আজও। লাইব্রেরি বিজ্ঞান ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের অপর্যাপ্ততার কারণে দেশে ট্রেনিংপ্রাপ্ত জনবলের যোগান সম্ভব হয় না। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ান নিয়োগে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কম খরচে নিজ এলাকা থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা লাইব্রেরি বিজ্ঞানের উপর জেলাভিত্তিক ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের জীবনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা পেতে পারে। জেলা পর্যায়ে লাইব্রেরি ইনস্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্য বাস্তবায়ন হোক গ্রন্থ ও গ্রন্থস্বত্ব দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য।

দৈনিক অর্থনীতি প্রতিদিন : ২৩ এপ্রিল ২০১৪

www.pathagar.com

চিনির চাহিদা পূরণের শিক্ষা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ৩-১২ মার্চ ২০১২ ব্রাজিলে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। দেশে ফিরে ১৩ মার্চ মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বিজ্ঞ মন্ত্রী গর্ব করে বলেন আগামী রমজানে চিনি নিয়ে বাজারে যেন কোনো অস্থিরতা না হয় সেজন্য চিনি আমদানির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয় (প্রথম আলো, ১৪ মার্চ ২০১২, পৃষ্ঠা ১৫)।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে পৃথিবীর সব দেশই শিল্প মন্ত্রণালয় নিজ দেশের পণ্য চাহিদা অনুযায়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা প্রদান করেন। ব্যয়বহুল উচ্চপ্রযুক্তি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলো অনেক সময় সরকারি উদ্যোগে অথবা দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথভাবে প্রতিষ্ঠা করে। কখনো কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করে, বিদেশি উদ্যোক্তাদের জামাইআদরে সম্ভাষণ করা হয়। জমি অধিগ্রহণ, বিদ্যুৎ, পানি, কাঁচামাল সরবরাহ, প্রশিক্ষিত শ্রমিক নিয়োগসহ শিল্পপ্রতিষ্ঠার সকল অবকাঠামো নির্মাণ শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত। স্বল্প ব্যয়ে গুণগত মানের পণ্য উৎপাদনে পৌরকর, ট্যাক্স হ্রাসে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। বিদেশ থেকে বৈধ ও অবৈধ পথে পণ্য এনে দেশের বাজার যেন দখল করতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পণ্যের বিদেশ-রপ্তানির সহজ বিধিব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে শিল্প মন্ত্রণালয়।

কোনো পণ্যই সারা বছর এক রকম হারে বিক্রি হয় না। বিশেষ মাস, সপ্তাহ, দিনে অধিক হারে বিক্রি হয়। উৎপাদন ও বিক্রেতা সেই ক্ষণটির জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করেন। শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনা করে কখনো কখনো সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দেয়া হয়। পণ্য উৎপাদন থেকে বিক্রয় লব্ধ অর্থ মালিক-শ্রমিকের পকেটে নিরাপদে প্রবেশ পর্যন্ত তদারকি করে শিল্প মন্ত্রণালয়।

www.pathagar.com

আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে তৎকালীন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশের পাট, চামড়া, চিনি তিনটি শিল্পকে নিয়ে বিশ্ব দরবারে গর্ব করতেন। এই তিনটি শিল্পের অর্থ দিয়ে মাত্র ২৪ বছরে বঙ্গভবন, গণভবন, সংসদ ভবন, সচিবালয়, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট ২ ডজন ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, হাইস্কুল, প্রাইমারি স্কুল, মাদ্রাসা, ছোট বড় ৭ শত চিকিৎসা হাসপাতাল, রেলপথ, সড়কপথ, বিমানপথ সাড়ে ৭ কোটি বাঙালির চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সেনা, বিমান, নৌ, পুলিশ, বিডিআর, আনসার বাহিনী, জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দেশের শিল্পে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির অর্থ দিয়ে করাচি-পেশোয়ার-রাওয়ালপিণ্ডিকে তিলোত্তমা করেছিলেন। তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে '৭১ এ বাঙালির নাঙ্গা তলোয়ারের নিচে গর্দান সপে দিয়েছিল লক্ষাধিক পাকসেনা। বীর বাঙালিরা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন। অথচ চিনির ঐতিহ্যবাহী ভূখণ্ডের ইতিহাসে ব্রাজিল থেকে চিনি আমদানি চুক্তি দেশবাসীকে বেদনাহত করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশন অন্যতম। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর আদেশ বলে গঠিত বাংলাদেশ সুগার মিলস কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন একীভূত করে ১ জুলাই ১৯৭৬ বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন গঠন করা হয়। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যান এবং পাঁচজন পরিচালকের সমন্বয়ে পরিচালক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কর্পোরেশনের সদর দপ্তরে ২৯৮ জন ও তার অধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান মোট জনবল ১৫,২৭০ জন। উদ্দেশ্য ক্ষমতার সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন, সুষ্ঠু বিপণনের মাধ্যমে চিনির বাজারদর স্থিতিশীল রাখা। পর্যায়ক্রমে মিলগুলোর বিএমআরই ও নতুন চিনিকল স্থাপনের মাধ্যমে চিনিতে দেশকে স্বনির্ভর করা।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর জন্য দেশে উৎপাদিত পণ্যের বাইরে বিদেশ থেকে প্রচুর দ্রব্য আমদানি করতে হয়। বর্তমানে দেশে মোট চিনির চাহিদা ১২-১৪ লক্ষ মে. টন। দেশের ১৫টি চিনিকলের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ২,১০,৪৪০

www.pathagar.com

মে. টন। এগুলোর পূর্ণক্ষমতা কাজে লাগাতে পারলেও দেশে চিনির চাহিদার ঘাটতি থাকবে ১০-১২ লাখ মে. টন। আমাদের দেশে চিনি শিল্পের একমাত্র কাঁচামাল হচ্ছে ইক্ষু। দেশে জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আবাসন, শহরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে যে হারে ফসলি জমি কমছে তাতে ইক্ষু আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু উদ্বেগজনক খবর হচ্ছে ভারতীয় চিনির উপর নির্ভর করে সীমান্তবর্তী কলারোয়া, মহেশপুর, দর্শনাসহ বিভিন্ন স্থানে শতাধিক মিছরি কারখানা গড়ে উঠেছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা কারখানায় উৎপাদিত মিছরি অবাধে বাজারজাত হচ্ছে।

ভারতের ব্যবসায়ীরা চোরাইপথে বিপুল পরিমাণ নিম্নমানের ভেজাল ও বস্তাপচা চিনি বাংলাদেশে পাচার করে কাড়ি কাড়ি টাকা লুটে নিচ্ছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তপথে ভারতীয় চোরাচালান পণ্যসামগ্রীর মধ্যে চিনি অন্যতম। চিনি নিয়ে সম্প্রতি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া রীতিমতো চমকে ওঠার মতো তথ্য দিয়েছে। তথ্যটি হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আসা চিনিতে মাত্রাতিরিক্ত হাইড্রোজ রয়েছে। ২০ মাত্রা পর্যন্ত হাইড্রোজ কোনোরকমে গ্রহণযোগ্য। এ সতর্কবাণী চিকিৎসকদের। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আসা চিনিতে রয়েছে হাইড্রোজের পরিমাণ ১৩৯ পার পার্টস মিলিয়ন (পিপিএম)।

বাংলাদেশে চিনি শিল্পের প্রধান প্রতিবন্ধকতা ইক্ষু সরবরাহের স্বল্পতা, আধুনিক প্রযুক্তির ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবস্থাপনায় চাষিদের সম্পৃক্তকরণে ব্যর্থতা। চিনি উৎপাদনে প্রক্রিয়াজাতকরণ অপচয়, ঋণের সুদ, অত্যধিক বেশি স্থায়ী খরচ, অধিক জনবল, যন্ত্রপাতি অত্যধিক পুরনো হওয়ার কারণে ঘন ঘন ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

পুষ্টি বিশ্লেষকদের মতে মানুষের শরীরের খাদ্যবলের ১৩ শতাংশ আসা উচিত গুড় অথবা চিনি হতে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নির্ধারিত মান অনুযায়ী জনপ্রতি বার্ষিক ১৩ কেজি চিনি বা ১৭ কেজি গুড় প্রয়োজন। অথচ আমাদের দেশে চিনি ও গুড়ের মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ ৬ কেজিরও কম। প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকায় বার্ষিক মাথাপিছু চিনি ও গুড়ের ব্যবহার যথাক্রমে প্রায় ২১, ১৯ ও ১৩ কেজি।

দেশের জলবায়ু, মাটি ইত্যাদি আখ চাষে বিশেষ উপযোগী হলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশে টনপ্রতি আখে চিনির লক্ষ্যমাত্রা কম। ভারতসহ অন্যান্য চিনি উৎপাদনকারী দেশগুলোতে যেখানে প্রতি ১০০ টন আখের রসে ১৪ থেকে ১৮ টন পর্যন্ত চিনি উৎপাদন হচ্ছে, সেখানে আমাদের

www.pathagar.com

দেশে একই পরিমাণ আখের রস থেকে ৭-৮ টনের বেশি উৎপাদন হয় না। অনেক সময় উন্নতমানের আখের বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করেও উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়নি। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দেশে বার্ষিক আখ প্রয়োজন প্রায় ২৫ লাখ ৮৫ হাজার টন, কিন্তু পাওয়া যায় অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশি।

চাষি, ট্রাক্টর এবং পাওয়ারটিলার এবং পানি সেচ প্রভৃতির ব্যবস্থা আর্থিক সংকটে মান্ধাতার আমলের ভোঁতা লাঙ্গল, অর্ধমৃত গরু আর প্রকৃতির উপর নির্ভরতা চাষির একমাত্র ভরসা। ফলে আখচাষে ভালো ফলন আসে না। পরাধীনতার সময়ই পাবনা অঞ্চলের উর্বর বেলে দোআঁশ মাটির বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছিল কৃষি ও বীজ গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট। ঐ সময় এই ইনস্টিটিউটগুলো কৃষি বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল। পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী জেলায় ভালো ইক্ষু উৎপাদন হয় বিধায় সেই ব্রিটিশ আমল থেকে চিনির বড় বড় মিল গড়ে উঠেছিল ঐ সমস্ত এলাকায়। বর্তমানে এই মিলগুলো আধুনিকায়ন করে বিষয়ভিত্তিক দক্ষ ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ না দেয়ায় উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে এবং ক্রমেই লোকসান হচ্ছে।

ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ দেখতে প্রায় শত বছরের ঐতিহ্যবাহী ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৯১২ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর সুগার টেকনোলজি প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা বা ন্যূনতম প্রশিক্ষণ নেই। সুগার টেকনোলজিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চিনির হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। দেশে ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে সুগার টেকনোলজিতে ৪ বছর মেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া উচিত। প্রশিক্ষিত সুগার টেকনোলজিস্টগণ ইক্ষুর হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হবে।

দৈনিক ইনকিলাব : ১৮ জুলাই ২০১২

www.pathagar.com

দেশের চামড়া বাজারের অস্থিরতা

গণমাধ্যমে কুরবানির পশুর চামড়া নিয়ে অনেক খবর প্রকাশিত হয়। প্রতি বছর ঈদ-উল-আযহার সময় সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দেশের লাখ লাখ হতদরিদ্র, এতিম, মিসকিন, দুস্থ ও অসহায় মানুষের ৫শো থেকে ৬শো কোটি টাকা লুটে নেয় অসাধু চামড়া ব্যবাসায়ীরা। গরিব-মিসকিনের অধিকার কেড়ে নেবার এ ষড়যন্ত্র বেশ কয়েক বছর ধরে দাপটের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে চামড়া সিন্ডিকেট। দেশের রপ্তানিযোগ্য চামড়ার প্রায় অর্ধেক সংগ্রহ হয় কুরবানির ঈদে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৪৮ শতাংশ পূরণ হয় কুরবানির ঈদে, ১০ শতাংশ রোজার ঈদে ও শবেবরাতে, ২ শতাংশ কালীপূজায় পূরণ হয়।

প্রতি বছর দেশে কাঁচা চামড়া উৎপাদিত হয় ১ কোটি ৬৫ লাখ পিস। এর মধ্যে ছাগলের চামড়া ১ কোটি, গরু ৫০ লাখ, ভেড়া ও মহিষ মিলে ১৫ লাখ পিস। সব মিলিয়ে পাওয়া ২২ কোটি বর্গফুটের মধ্যে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মাত্র পৌনে ৩ কোটি বর্গফুট। বাকি প্রায় ১৯ কোটি বর্গফুট কাঁচা-পাকা ও চামড়াজাত পণ্য আকারে রপ্তানি হয়। কাঁচা চামড়া রপ্তানির চেয়ে ১০ গুণ বেশি অর্জন সম্ভব ফিনিশড গুড হিসেবে। কিন্তু দেশিয় অবকাঠামো গড়ে না ওঠায় এবং ১৫ শতাংশ শুল্ক থাকায় ওয়েট ব্লু চামড়ার রপ্তানিও ব্যাহত হচ্ছে এবং তা পচে গলে নষ্ট হয়ে যায়।

বিভিন্ন চামড়ার মধ্যে রয়েছে ট্যান্ডি চামড়া, ক্রাফট পিকস, সোল লেদার, ক্রেমে ট্যান্ড, প্লেইন লেদার, সোয়েড লেদার, জাগ্রেন লেদার, পোশাক তৈরি চামড়া, চ্যাময়িস লেদার, প্লাস্টিক লেদার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেদার, লাইনিং, ক্যারেকেউড গ্রেইন লেদার, ভেজিটেবল ট্রেন্ড পেইন লেদার এবং গ্লেসফিড লেদার ইত্যাদি। ১৯৪০ সালে প্রথম নারায়ণগঞ্জে ট্যানারি স্থাপন করা হয়। ভারত বিভক্ত হওয়ার পরপরই কলকাতার ট্যানারি শিল্প মালিকরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলেও তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল। এভাবে

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ৩৫টি মাঝারি আকারের এবং ৫০টি ছোট ট্যানারি প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত ওয়েট ব্লু চামড়া বিদেশে রপ্তানি হতো এবং নিম্নমানের ফিনিশড চামড়া দেশেই ব্যবহৃত হতো। এরপর ৭০ ও ৮০-র দশকে এসে ঢাকার হাজারীবাগে ব্যাপকভাবে ট্যানারি স্থাপিত হতে থাকে। তখন থেকেই হাজারীবাগ হয়ে ওঠে বাংলাদেশের চামড়া শিল্প বিকাশের প্রাণকেন্দ্র।

৭০ ও ৮০-র দশকে যে ট্যানারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ৯০ ভাগই ঢাকায়, ছয় ভাগ চট্টগ্রামে ও বাকি চার ভাগ দেশের অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে ট্যানারি সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৪টিতে। ট্যানারি শিল্পে বর্তমানে কর্মরত তিন হাজার শ্রমিক রয়েছে। দেশের অবহেলিত উপেক্ষিত সেক্টরগুলোর একটি হচ্ছে চামড়াশিল্প। এ শিল্প নিয়ে বড় বড় বিনিয়োগকারীদের যেমন আগ্রহ দেখা যায় না তেমন সরকারেরও তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা করার ইচ্ছা দায়সারা ভাব। গত ১০ বছর যাবৎ পরিত্যক্ত আছে সাভারের চামড়াশিল্প পার্ক স্থাপন কার্যক্রম। প্রতি বছর যে পরিমাণে চামড়া পাওয়া যায় যদি তার বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময় ব্যবহার নিশ্চিত করা যেত তবে চামড়াশিল্প হতো বাংলাদেশের সম্ভাবনার এক নবদিগন্ত।

দেশে উৎপাদিত চামড়াজাত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে জুতা, ব্রিফকেস, ব্যাগ, গিফট বক্স, পেন হোলডার, পোশাক, দস্তানা, কাটার ফ্রেম, ওয়ালেট, হাতঘড়ির ফিতা, চামড়ার তৈরি আচ্ছাদন ইত্যাদি। চামড়াশিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনাও অফুরন্ত। এই শিল্পের মানোন্নয়নে প্রয়োজন সরকারের আর্থিক সহযোগিতা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির লক্ষ্যে অধিক লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন।

বর্তমান সময়ে স্টিল এবং কাঠের বিকল্প হিসেবে সর্বক্ষেত্রে প্লাস্টিক জায়গা করে নিচ্ছে। অথচ এটি এক সময় সাধারণ মানুষের ভাবনাতেও ছিল না। এটা সম্ভব হয়েছে প্লাস্টিক রপ্তানিকারক দেশগুলোর সুদূরপ্রসারী চিন্তা, গবেষণা ও প্লাস্টিকের বহুমুখী ব্যবহার উদ্ভাবনের কারণে। চামড়া নিয়ে আমাদের এমন কিছু ভাবা উচিত। পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিনিয়তই একটি জিনিসের স্থান দখল করে নিচ্ছে আরেকটি জিনিস।

দেশের তৃতীয় বৃহত্তর সম্ভাবনাময়ী রপ্তানিখাত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য। এ দেশে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের গুণগত মানসম্পন্ন ও বহির্বিশ্বে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে এই শিল্প উত্তরণের বিপরীতে চলছে চরম নৈরাজ্য ও দৈনদশা। বাংলাদেশের চামড়ার গুণগতমান ভালো হওয়ায়

www.pathagar.com

বহির্বিশ্বে এ দেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে সংশ্লিষ্টদের এই শিল্পের প্রতি উদাসীনতা চামড়াকে হুমকিতে ফেলেছে। বাংলাদেশে যখন চামড়া শিল্প কারখানা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন প্রতিবেশী দেশ ভারতে চামড়াশিল্প কারখানা স্থাপন বেড়েই চলছে। ফলে তাদের কাঁচা চামড়ার চাহিদাও বাড়ছে। ভারতের কয়েকটি ব্র্যান্ডের চামড়াজাত পণ্যের আউটলেট সম্প্রতি ঢাকায় চালু করা হয়েছে।

আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যে চামড়ার স্থান তৃতীয়। রপ্তানি খাতে এর অবদান ৯-১০ শতাংশ। পরিকল্পিত নীতি প্রণয়নসহ সাভারস্থ হরিণধারায় প্রায় ২০০ একর জমির উপর ১৯৫টি প্লটে চামড়াশিল্পনগরী চালু করতে পারলে এর মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হতো। আসলে আমাদের দেশের সম্ভাবনাময় এই শিল্প খাত নিয়ে জাতীয়ভাবে চিন্তা ভাবনা করার সময় এসেছে। আগামীতে বিশ্ববাজারে চামড়াশিল্পের সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বমন্দা কেটে গেলেই চামড়ার বাজার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সেই সুযোগ গ্রহণের জন্য আমাদের এখনই প্রস্তুত হতে হবে। তবে একটি কথা আমাদের সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে তা হলো, শুধু ক্রাশড লেদার রপ্তানি করে কোনো দেশই চামড়াশিল্পকে উজ্জীবিত করতে পারবে না। তাই ফিনিশড লেদার ও লেদার গুডস রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

এজন্য প্রতিটি জেলা উপজেলার বিসিক শিল্পনগরীতে চামড়াশিল্প গড়ে তুলতে হবে। শিল্প পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ লেদার টেকনোলজিস্ট। লেদার টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স চালু করে ব্যাপকভাবে লেদার টেকনোলজিস্ট তৈরির পদক্ষেপ হবে এ শিল্প বিপর্যয় রক্ষার প্রথম পদক্ষেপ।

অর্থনীতি প্রতিদিন : ৯ অক্টোবর ২০১৩

www.pathagar.com

ডাক বিভাগের আধুনিকায়ন

'ডাক' এ ছোট শব্দটির অর্থ লিখে শেষ করা যাবে না। ইউরোপে ডাকহরকরা শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে চিঠিপত্র নিয়ে ছুটত গন্তব্যে। এ ধরনের কাজ যারা করত তাদের বলা হতো পোস্টহর্ন (Post horn)। এ দেশের 'রানার', এরাও ডাক বহনকারী। কাঁধে চিঠির খাকি থলে, পরনে খাকি পোশাক, হাতে লাঠি ও হারিকেন। রাতেও তারা চিঠি বিলি করত। ঝড়-বৃষ্টি তাঁদের কাছে কিছুই না। সবকিছুকে পেছনে ফেলে তাঁরা সামনে চলা অব্যাহত রাখত। দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ বিষয়ে তারা সচেতন ছিল বিধায় ডাক হয়ে উঠেছিল গণমানুষের আবেগ অনুভূতি আর সহানুভূতির বিভাগ। কাগজ আবিষ্কারের আগে মানুষ চিঠি লিখেছে গাছের বাঁকলে, তামার পাতে এবং শিলাখণ্ডে। সম্রাট অশোকের শিলাখণ্ড আজ বিস্ময়কার ঐতিহাসিক নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

উপমহাদেশে সকলের জন্য ডাক যোগাযোগের চিন্তা প্রথম করেছিলেন দিল্লির সম্রাট শেরশাহ। ষোড়শ শতকে তিনি ঘোড়ার পিঠে করে ডাকসামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এ ব্যবস্থাকে বলা হয় 'ঘোড়ার ডাক'। ঘোড়ার ডাকের প্রচলনই এই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ডাকব্যবস্থাকে বৃহত্তর গণজীবনে অঙ্গীভূত করে তোলে।

এরপর উপমহাদেশে ইউরোপীয় আদলে ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন হয় ১৭৮৫ সালে। তখন ভারতে ব্রিটিশ ভাইসরয় ছিলেন লর্ড ডাফরিন। তিনি সরকার ব্যবস্থাভিত্তিক ডাক চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ডাক যোগাযোগ সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসে জমিদার, ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তখন সমাজের উঁচুস্তরের লোকেরা ডাকঘর স্থাপনকে মর্যাদাকর কাজ বলে গণ্য করতেন। আর সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ডাকঘর ছিল একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান।

ডাকব্যবস্থার উন্নয়ন বিশেষভাবে অনুভূত হয় ফরাসি বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লবের পর। এ লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয় ইংল্যান্ডে ১৮৪০

www.pathagar.com

সালে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার রোনাল্ড হিল। তাঁর এই প্রয়াস ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। ১৮৬২ সালে আমেরিকার পোস্টমাস্টার জেনারেল মন্টেগোমারি রেয়ার আন্তর্জাতিক ডাকযোগাযোগ চালু করার জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন ১৮৬৩ সালের ১১ মে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী আন্তঃদেশীয় ডাক প্রচলনের উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করেন একটি নীতিমালা। প্রথমবারের মতো গঠন করা হয় পোস্টাল ইউনিয়ন।

১৮৭৫ সালের জুলাই এ বাইশটি দেশের প্রতিনিধির সমন্বয়ে নাম পাল্টে রাখা হয় 'দি ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন'। এটাই হচ্ছে সর্বজনীন স্বার্থে কার্যকর ডাকযোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রথম আধুনিক পদক্ষেপ। ১৯১৭ সালে ডাক কর্মচারীদের জন্য বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। ওই বছর 'ভারত শাসন আইন' প্রবর্তনের পর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও আসামকে নিয়ে আসা হয় একটি ডাক জোনের আওতায়। তখন জোনের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে জমিদার ও ধনীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ডাকঘরগুলো।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি ঘোষণা দিয়েছিলেন ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ইংরেজরা এ দেশ ছাড়বে। কিন্তু সারা দেশে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, রাজনৈতিক চাপ, পাঞ্জাব, বিহার, কলকাতা ও নোয়াখালীতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হাজার হাজার মানুষ হত্যা, বাড়িঘর জ্বালানো, ধনসম্পদ লুটপাট, নিরস্ত্র ইংরেজ সাহেব-মেমদের ওপর রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে যত্রতত্র আক্রমণ, নির্যাতন, বিবস্ত্র করে লাঞ্ছিত করার ঘটনা স্বাধীনতার তারিখ এগিয়ে এনে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বেতারে ঘোষণা করা হয়েছিল, ইংরেজ ছাড়ছে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭।

দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভাগ হয়েছিল অনেক কিছুই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মালামাল নিয়ে কলকাতা থেকে জলপথে যাত্রা করেছিল ৫০টি জাহাজ। একটিতে নিয়ে গিয়েছিল ডাক বিভাগের মালামাল।

ব্রিটিশ আমলে প্রণীত 'দি পোস্ট অফিস অ্যাক্টকে' গ্রহণ করে পাকিস্তান ডাক প্রশাসনের কার্যক্রম শুরু হয়। পাকিস্তানে পাঁচটি ডাক সার্কেল গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ২টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৩টি। একজন মহাপরিচালকের অধীনে তখন টেলিগ্রাফ বিভাগও ডাক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়। এ সময় কেউ নিজ উদ্যোগে পোস্টমাস্টার হতে চাইলে এলাকার প্রয়োজন হিসেবে অনুমোদন দেয়া হতো তিনটি মানদণ্ডের ভিত্তিতে (ক) পোস্টমাস্টারকে অবশ্যই বেশ কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে

www.pathagar.com

হবে। (খ) জমির আয় ছাড়াও নগদ আয়ের উৎস থাকতে হবে (গ) ডাক পরিচালনা করার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

এ প্রক্রিয়ায় পোস্টমাস্টার নিয়োগের পর নিয়োজিত পোস্টমাস্টার নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানত দিয়ে ডাকসামগ্রী নিতেন এবং বিক্রি করতেন নির্ধারিত মূল্যে। সাধারণত নিজের বাড়িতে স্থাপিত হতো এসব ডাকঘর। এজন্য সরকার হতে কোনো ভাড়া বা মজুরি দেয়া হতো না। পোস্টমাস্টার তাঁর পছন্দমতো ডাকপিয়ন বা ডাকহরকরা নিয়োগ করতেন। তবে তাঁরা দায়িত্ব ও অধিকারের প্রশ্নে সরকারের কাছে দায়ী থাকতেন।

পৃথিবীর সব দেশেই ডাক বিভাগ চালু হয়েছে সরকারি আদেশ বা সামরিক ফরমানের মাধ্যমে। একমাত্র 'বাংলাদেশ' যেখানে ডাক বিভাগ চালু হয়েছে 'যুদ্ধের ময়দানে'। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে আমরা স্বাধীন। স্বাধীন দেশের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চাই সরকার। সেটাও ১৭ এপ্রিল ১৯৭১। এক দেশ থেকে অন্য দেশে ডাক পাঠানোর জন্য চাই ডাকটিকিট। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডিজাইনার বিমান মল্লিক ডিজাইন করেছিলেন ৮টি ডাকটিকেটের; আর সেইগুলো প্রকাশিত হয়েছিল ২৯ জুলাই ১৯৭১।

ডাকব্যবস্থা সৃষ্টির কালে ডাক বিভাগের মূল কাজ ছিল ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, সরকারি চিঠিপত্র গ্রহণ, পরিবহন ও বিলি করা। পরবর্তীতে ডাক বিভাগের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয় মানি অর্ডারসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম। দেশব্যাপী সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটির আছে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। সে কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ২০ ডিসেম্বর বর্তমান 'ডাক ভবনে' বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।

একুশ শতকের সূচনালগ্নে সারা বিশ্বের ডাকব্যবস্থা বিস্ময়কর সাফল্যের পর ই-মেইলসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি মানুষের সামনে খুলে দিয়েছে দ্রুত যোগাযোগের নতুন দিগন্ত। আমাদের দেশের ডাক ও গ্রামীণ ডাকব্যবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হলেও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অবিভাগীয় ডাকঘর, ডাককর্মী এবং ডাকসার্ভিসের অবস্থা শ্রীহীন। দৈনন্দিন কর্মচঞ্চল জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে ব্যর্থ, পরাজিত এই বিভাগটির শম্বুকগতিতে পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়।

পোস্টমাস্টার, পিয়ন ও রানার এই তিন অপরিহার্য ডাকঘরকর্মীর পেশাগত জীবনেও লাগেনি আধুনিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির স্পর্শ। পেশা যোগ্যতাহীনতার কারণে চাকরির অনিশ্চয়তা, ন্যূনতম বেতন তাদের ঠেসে রেখেছে এক হতাশার মাঝে।

www.pathagar.com

স্বয়ংক্রিয় চিঠি বাছাই যন্ত্র ক্রয়েও 'ক্রিয়া' নেই ছয় বছরে। ২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে চীন থেকে আমদানি করা স্বয়ংক্রিয় এ যন্ত্রে ঘণ্টায় ৩০ হাজার চিঠি বাছাই করা সম্ভব। ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসে প্রায় আড়াই লাখ চিঠি বাছাই করতে পারে যন্ত্রটি। কিন্তু প্রশিক্ষিত ডিপ্লোমা পোস্ট টেকনোলজিস্টের অভাবে প্রযুক্তিনির্ভর চিঠির মেশিন চালু করা যায়নি।

চিঠি নিয়ে ভাবনা-দুর্ভাবনা থাকতে হয় কখন চিঠি হারিয়ে যায়। চিঠির মর্ম সাহিত্যমোদীরা বোঝেন। সত্যিকার অর্থে চিঠি সবাইকে আমোদিত করে। এর মূল্য অপরিসীম। চিঠিতে অনেক সময় পাওয়া যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ঐতিহাসিকরা খুঁজে পান ইতিহাসের অমূল্য উপাদান।

সরকারি ডাকসেবা সময়োপযোগী করার লক্ষ্য নিয়ে ২০০০ সালে ই-পোস্ট সার্ভিস চালু করা হয়েছিল। সম্ভাবনাময় সার্ভিসটি দীর্ঘ ১২ বছর পরও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে—প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল সঙ্কটের কারণে। সারা দেশে ডাকঘর বা পোস্ট অফিস আছে ৯ হাজার ৮৮৯টি, এর মধ্যে জেনারেল পোস্ট অফিস চারটি। জেলা শহরগুলো মিলিয়ে ৬৬টি। এরপর উপজেলা, গ্রামে রয়েছে ৮২০০টি এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল ডাকঘর।

বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টমাস্টার, পরিদর্শক, অপারেটর, মেইল অপারেটর ও রানারসহ সারা দেশে ডাক বিভাগে কর্মরত লোকবল রয়েছে ১৭ হাজার ৯১৩ জন। পূর্ণাঙ্গ বেতন স্কেলভুক্ত ও বেতন স্কেল ছাড়া ৪১ হাজার কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকেন। এত বড় ও সম্ভাবনাময় এ প্রতিষ্ঠানটিকে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মকাণ্ডে পরিচালিত করতে পারলে সাধারণ মানুষ স্বল্প খরচে অনেক বেশি সেবা গ্রহণের সুযোগ পেত।

শুনলে হয়তো অনেকে চমকে উঠবেন একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও ডাক বিভাগে কর্মরত ৫৮ হাজার ৯১৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারী একজনেরও পোস্টাল প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা বা ন্যূনতম শিক্ষা প্রশিক্ষণ নেই। তাদের এই মহতি পেশার আগমন ঘটেছে ভাই-ভাতিজা, মামা-ভাগিনা সূত্র ধরে। নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খানের ড্রাইভার পদে উক্তির মতো কাগজ-কলম চিনতে পারা নীতি পোস্ট অফিসে চলছে।

২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়া-ই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে ক্ষয়িষ্ণু ডাক বিভাগে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ডাকব্যবস্থায় প্রযুক্তি উন্নত দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নতুন নতুন প্রযুক্তিনির্ভর সার্ভিস চালু করতে

www.pathagar.com

হবে। ডাক বিভাগের জরাজীর্ণ পালে লাগাতে হবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের' হাওয়া।

বিশ্বে প্রতিদিনই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যায় সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরকারি ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিসের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডাক-কুরিয়ার সার্ভিসে নতুন নতুন শাখা-প্রশাখা প্রসারিত হচ্ছে। সংযুক্ত হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলা-কৌশল। মধ্যপ্রাচ্যসহ উন্নত বিশ্বে পোস্টাল সেক্টরে জনশক্তি রপ্তানিতে বাংলাদেশ শূন্য। ইনস্টিটিউট অব পোস্টল টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত এ বন্ধ্যাত্ব মোচন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের ডাক বিভাগ উন্নয়নে যত প্রকার সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সভা, আলোচনা, পরিকল্পনা নতুন পদ সৃষ্টি করে জাতীয় বাজেট থেকে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হোক না কেন; তাতে ডাক বিভাগের কোনো উন্নতি ঘটবে না।

ডাক বিভাগকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশে'র অংশ করতে হলে সর্বপ্রথম প্রতিটি পোস্ট অফিসে ডিপ্লোমা ইন পোস্টাল টেকনোলজি শিক্ষাপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল নিয়োগ দিতে হবে। ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন পোস্টাল টেকনোলজি কোর্স অধ্যয়নে দেশ বিদেশের সর্বশেষ আবিষ্কৃত প্রযুক্তিগুলো আত্মস্থ করে এই জনগুরুত্ব পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জেলা উপজেলা, ইউনিয়ন গ্রামে ইনস্টিটিউট অব পোস্টাল টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করে ঐতিহ্যের ডাকব্যবস্থাকে আবেগ আর অনুভূতির মোহনায় দাঁড় করাতে পারে।

দৈনিক সকালের খবর : ৪ আগস্ট ২০১২

www.pathagar.com

বিমান পরিবহন ব্যবস্থা

বিংশ শতাব্দী ছিল মানবজাতির জন্য একটি স্মরণীয় কাল। বিজ্ঞানের কল্যাণে উত্থান পতন, সৃষ্টি, ধ্বংসের জয়জয়কার। ১৯০০ সালের সূচনায় ব্রিটেনে বৈজ্ঞানিক হাবেস সর্ট লাউডস্পিকার আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে চমকে দেন। তার ২৫ বছর পর ১৯২৫ সালে স্কটল্যান্ডের বৈজ্ঞানিক জন লগি বেয়ার্ড আবিষ্কার করেন টেলিভিশন। ১৯৫০ সালে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পিসি গোল্ডমার্ক টেলিভিশনকে রঙিন করেন। ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক আরসি এ আবিষ্কার করেন। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ১৯৯৮ সালে ডা. ফুডা ফোকম্যান আবিষ্কার করে ঘাতকব্যাধি ক্যান্সারের প্রতিষেধক।

মানবকল্যাণে গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা যেমন এগিয়ে তেমনি পিছপা ছিলেন না মনুষ্য ধ্বংসে মারণাস্ত্র তৈরিতেও। ১৯১৪ সালে ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিক ই ডি সুইন্টন যুদ্ধবহরে সংযুক্তির জন্য ট্যাঙ্ক আবিষ্কার করেন। ১৯২২ সালে আমেরিকার অস্ত্রবিশারদ রাডার এবং শতাব্দীর মধ্যগগনে ১৯৪৫ সালে আমেরিকার পদার্থবিদ রবার্ট ওপেন হাইমার যুদ্ধবহরে পারমাণবিক বোমার সংযুক্তি ঘটান।

গত শতাব্দীর আরেকটি সেরা আবিষ্কার উড়োজাহাজ। ঐতিহাসিক পরিক্রমায় অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে মানবজাতিকে। সকল বাধা অতিক্রম করে মানবজাতি জয় করেছে আকাশকে। এরই সুবাদে পৃথিবী একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। বিমান আবিষ্কার করেন আমেরিকান দুই ভাই- অরভিল রাইট ও উইলবার রাইট। ১৯০৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর কিটি হকের ডেভিল নামের এক পাহাড়ের ওপর থেকে ইঞ্জিন নাগানো গাইডার 'ফ্লাইয়ার ওয়ান'-এ চড়ে প্রথম আকাশে ওড়েন উইলবার রাইট। তিনি উড়তে পেরেছিলেন মাত্র ৭ সেকেন্ড। ই আর মামফোর্ডের নকশা অনুযায়ী খাড়াভাবে ওড়ার যন্ত্র বা হেলিকপ্টার তৈরি করেন স্কটল্যান্ডের উইলিয়াম ডেনি। হেলিকপ্টারের মূল তত্ত্বটি প্রকাশ করা হয় ১৯০৫ সালের ৬ জানুয়ারি।

www.pathagar.com

প্রথমদিকে হেলিকপ্টার বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হলেও পরে ধাতু দিয়েই যন্ত্রটি তৈরি করা হয়।

প্রথম যুগে যুদ্ধ হতো সাধারণত স্থলভাগে। পরে জলপথও যুদ্ধে ব্যবহৃত হতে থাকে—বিশেষ করে সৈন্য ও রসদ পরিবহনের প্রয়োজনে। পরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে আকাশজুড়ে। আকাশযুদ্ধের সূচনা হয় ১৯১২ সালে লিবিয়ার আকাশে তুরস্ক থেকে। ১৯১২ সালে ইতালি সরকার তাদের উপনিবেশ লিবিয়ার আকাশ থেকে তুর্কি সৈন্যদের ওপর প্রথম বিমান আক্রমণ চালায়। বিমান দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তুরস্কের সৈন্যরাও তাদের বিমান নিয়ে আকাশে ওঠে। শুরু হয় বিমানে বিমানে আকাশযুদ্ধ। যুদ্ধবিমানের দ্রুত উন্নতি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সেই উন্নতির ধারাবাহিকতার পথ ধরে এসেছে টাইগার মথ, স্পিরিট ফায়ার, জাগুয়ার মিড, ন্যাট, বি-৫২, মিরেজ, এফ-১৬ টমক্যাট আর স্টিলথের মতো চৌকস সব যুদ্ধবিমান। এখন তৈরি হচ্ছে আরো উন্নত, আরো কার্যক্ষম মনুষ্যবিহীন নতুন নতুন যুদ্ধবিমান।

গত শতকের সত্তরের দশকে দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন চন্দ্রাভিযান নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু করে। একের পর এক মহাশূন্যযান ও কৃত্রিম উপগ্রহ ধেয়ে যায় চাঁদের দিকে। প্রথম দিকে চন্দ্রাভিযানে এগিয়ে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলো ১১ মিশনের মহাশূন্যচারী নিল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন চাঁদের মাটিতে প্রথম পা রাখলে ধাক্কা খায় সোভিয়েত মহাকাশ কর্মসূচি। এরপর নাসা সফলভাবে আরও পাঁচবার চাঁদে মনুষ্যভিযান চালায়, ১৯৭২ সালে অ্যাপোলো ১৭ অভিযানের মাধ্যমে যা শেষ হয়। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মোট ১২ জন নভোচারী চাঁদে পা রেখেছেন। ২০২৫ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ বসবাসের জন্য আমেরিকার উদ্যোগে গড়া হচ্ছে উপনিবেশ। চাঁদে নতুন করে অভিযানের তোড়জোড় করছে চীন, জাপান, ভারত, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। চন্দ্রপৃষ্ঠে ল্যান্ডার (অবতরণযান), রোভার (বিচরণযান), এমনকি মানুষ নামানোর নতুন সব পরিকল্পনা হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান তার যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেবার মান ও দক্ষতার কারণে বাংলাদেশ বিমান খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি ও সুনাম অর্জন করেছিল। বর্তমানে দুর্নীতি ও অরাজক পরিস্থিতির কারণে বিমানে একধরনের স্থবিরতার সৃষ্টি হয়েছে। দেড়শো কোটি টাকা খরচ করে বিমানের অনেকগুলো ইঞ্জিন মেরামত করা হলেও এগুলো

www.pathagar.com

নির্ধারিত সময়ের আগেই কার্যক্ষমতা হারিয়ে অকেজো হয়ে বিমানকে পথে বসিয়ে দেয়। বিমান যারা মেরামত করে তাদের বিমান মেরামত প্রযুক্তিবিদ্যার ন্যূনতম প্রশিক্ষণ নেই। সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়েই বিমানের স্পর্শকাতর মেরামতের কাজ করানো হয়।

প্রতিযোগিতামূলক এভিয়েশন বাণিজ্যে টিকে থাকা এবং বিমানকে লাভজনক ও গতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশনকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয় ২০০৭ সালে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অন্য অপারেটরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য যেখানে প্রয়োজন ছিল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংশিষ্ট উদ্যোগ আয়োজনের, সেখানেও দেখা গেল বিপরীত চিত্র। আধুনিকমানের উড়োজাহাজ নিজেদের বিমান বহরে সংযুক্ত করার পর শুধু রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য পাইলটসহ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল অর্জন চিন্তা করা হয়নি। আদমজীর পরিণতি ঘটানোর লক্ষ্যে বিমানে হাইব্রিড বিদেশি প্রশাসক নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিশ্বে প্রতিদিন ছোট বড় পরিবহন, যুদ্ধ, কার্গো মিলে ৪০ হাজার বিমান উঠানামা করছে। বিমানগুলো তৈরি থেকে উড়া রক্ষণাবেক্ষণ করতে ১৪ লক্ষ ১৭ হাজার কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োজিত। যাদের বেতনভাতা লক্ষ থেকে কোটি টাকা পর্যন্ত। আকাশ জয়ের শতাব্দী পেরিয়ে গেলও দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশ আকাশপ্রযুক্তিতে ১৯০৩ সালে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। জনসংখ্যা পৃথিবীর ৭ম স্থান দখল করে নিয়েছে। এ দেশটি শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তি, যোগাযোগে সর্বক্ষেত্রে ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম সর্বশেষ অষ্টম স্থান দখল করলে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারসাম্য রক্ষা হবে। এটিই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এই উচ্চাবিলাসী ভিশন বাস্তবে রূপ দিতে হলে বাংলাদেশকে আর্দশলিপি পাঠে মনোযোগী হতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে অ্যাভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট, অ্যারোন্যাটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ার, ট্রাভেল ও ট্যুরিজম, এয়ার হোস্টেস, এয়ার ফায়ার সার্ভিস পাইলট প্রশিক্ষণ শিক্ষার ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট। তাহলেই ঐতিহ্যের বিমান 'বলাকা' নবসংযুক্ত 'পালকি'-এর যৌথ প্রাণসঞ্চারে অতিক্রম করবে সকল সীমাবদ্ধতা। সংশয়বাদীদের মুখে চুনকালী লেপন করে রোমাঞ্চকর হবে বিমানের জনপ্রত্যাশা।

দৈনিক সংবাদ : ৬ ডিসেম্বর ২০১৩

www.pathagar.com

পরমাণুশক্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারে বাংলাদেশ

আধুনিক ও সমকালীন বিজ্ঞানের দার্শনিক তত্ত্ব দার্শনিকগণই গোড়াপত্তন করেন। পরমাণুবিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে উৎকর্ষের মূলেও রয়েছে দুজন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকের অবদান। এরা হলেন লিউসিপাস ও ডেমোক্রিটাস। জগতের উৎপত্তিবিষয়ক তাদের পরমাণুবাদী দর্শন থেকে পরমাণু সংক্রান্ত ধারণার সূচনা হয়। পরমাণুবিজ্ঞান মূলত একটি বিবর্তিত বিষয়। বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে তা উন্নত থেকে উন্নততর হয়।

পাথর, তাম্র, লৌহ যুগের অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বিশ্ব আজ পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করছে। পারমাণবিক দর্শন মানবকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশ এখনো তাম্র, লৌহযুগে অবস্থান করছে। এ দেশের সিংহভাগ মানুষের ধারণা পরমাণুশক্তি শুধু বিদ্যুৎ ও এটম বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে এর রয়েছে বহুবিধ ব্যবহার। রোগ নির্ণয়ে, কৃষিখামারের কীটনাশক হিসেবে ও উন্নত বীজ উৎপাদনে এবং এমনকি শিল্প ও খনিজ সেক্টরেও পরমাণুপ্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে। পারমাণবিক সাবমেরিন বা জাহাজের মতো পরমাণুশক্তি ব্যবহার করে ভবিষ্যতে ট্রেন ও মোটরগাড়ি চালানো সম্ভব হবে বলে বৈজ্ঞানিকগণ আশাব্যক্ত করেছেন। স্বাধীনতার পর এ দেশের পরমাণুবিষয়ক কার্যাবলী দেখভাল করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় এবং 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন' গঠন করা হয়। গত চার দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে সেনাপ্রধান, ডক্টরেট ডিগ্রিধারী, স্থপতি নিয়োগ দিয়ে ২৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে পরমাণুশক্তি নিয়ে কাজ করার জন্য কোনো দক্ষ জনবল গড়ে তোলা হয়নি।

গত বছর এ দেশে গাড়িচালকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। প্রতিটি ড্রাইভারের একজন উস্তাদ থাকেন। পরিবহন শ্রমিক সংগঠনের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ড্রাইভারগণ উস্তাদকে জন্মদাতা থেকে বেশি শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত ১৪ হাজার ৩৩৪ জন কর্মকর্তা কর্মচারী কারো পরমাণু প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা বা ন্যূনতম শিক্ষা প্রশিক্ষণ নেই। তাদের এ পেশায় আগমন ড্রাইভার ওস্তাদ সম্পর্কে।

পরমাণু চিকিৎসা বা নিউক্লিয়ার মেডিসিন একটি বিশেষ চিকিৎসাপদ্ধতি, যা অতি অল্প পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রয়োগ করে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে এবং চিকিৎসায় সাহায্য করে। পরমাণু চিকিৎসাপদ্ধতি নিরাপদ ও ব্যথামুক্ত। পরমাণু চিকিৎসা এবং আল্ট্রাসাউন্ড শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তেজস্ক্রিয় ওষুধ প্রয়োগ করে গামা ক্যামেরার সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গের রোগ নির্ণয় করা হয়। যেমন—লিভার, স্প্লিন, কিডনি, মস্তিষ্ক, অস্থি, থাইরয়েড ইত্যাদির স্ক্যান। এ ছাড়াও হেপাটোবিলিয়ারি (HIDA) স্ক্যান, ফুসফুসের স্ক্যান (Lungs Scan), শান্ট পেটেন্সি টেস্ট (Shunt Patency), মেকেলস স্ক্যান (Meckel's Scan), পেরোটিড স্ক্যান (Parotid Scan), মায়োলোসিনটিগ্রাফি (Myeloscintigraphy), ভেনোগ্রাফি (Venography), ইত্যাদি পরীক্ষাও করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরিচালনাধীন পরমাণু চিকিৎসা এবং আল্ট্রাসাউন্ড কেন্দ্রগুলোতে পরমাণুবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ন্যূনতম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ দেয়ার সুযোগ নেই।

নিউট্রন রেডিওগ্রাফি কৌশলের মাধ্যমে বিভিন্ন পদার্থের তৈরি নানা প্রকার নমুনা না ভেঙে তাদের গুণাগুণ ও দোষত্রুটি নির্ণয় করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমিকম্প মোকাবিলায় ডিপ্লোমা ইন নিউট্রিন রেডিওগ্রাফি প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত।

ক্যান্সার সারা বিশ্বজুড়ে মরণব্যাধি বলে চিহ্নিত হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর ১২ শতাংশ মৃত্যুর কারণ বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার। উন্নত বিশ্বে হৃদযন্ত্রের কারণ ছাড়া ক্যান্সারই মৃত্যুর দ্বিতীয় কারণ বলে পরিগণিত। উন্নয়নশীল দেশে ক্যান্সার মৃত্যুর তৃতীয় কারণ বলে চিহ্নিত, যার সংখ্যা ৯.৫ শতাংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে ১০ লক্ষ জনগোষ্ঠী ক্যান্সারের শিকার। অসহায় রোগীদের পাশাপাশি চিকিৎসক সমাজও শংকিত। নিউক্লিয়ার মেডিসিনের প্রয়োগে অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি এবং সার্জারি ইত্যাদির তুলনায় সীমিত ব্যয়, কম কষ্টদায়ক এবং কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসম্পন্ন। গবেষণাবিজ্ঞানীদের মতে শতকরা ৮০ ভাগের বেশি ক্যান্সার রেডিওআইসোটোপ চিকিৎসায় আরোগ্য করা সম্ভব।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ। এ দেশের গরিব ক্যান্সার রোগীরা

www.pathagar.com

বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করে। বিত্তশালীরা বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণ করতে গিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পাচার করে। ডিপ্লোমা ইন ক্যান্সার নিউক্লিয়ার প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ দিয়ে দ্রুততম সময়ে আধুনিক ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য, পশুখাদ্য, কৃষিপণ্য আমদানি এবং বিদেশে পণ্য রপ্তানি করার পূর্বে তেজস্ক্রিয় মাত্রা নির্ণয় করা হয়। বাংলাদেশে পরমাণু শক্তি কমিশনে নিয়ন্ত্রণাধীন তেজস্ক্রিয় পরীক্ষণ ও মনিটরিং গবেষণাগারে। অতিমাত্রার তেজস্ক্রিয়তা দেশের মানুষসহ পশুপাখিদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির ব্যাপক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত শিশু খাদ্যে অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তা মানবতাবিরোধী কাজ বলে গণ্য করা যায়।

বিশুদ্ধ খাবার পানির উৎস হিসেবে নিরাপদ অ্যাকুইফার সিস্টেমের কাজটি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন করে থাকে। সাভার আইসোটোপ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানি সম্পদের মূল্যায়ন, টেকসই উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ উৎস এবং অগভীর-গভীর অ্যাকুইফার পানির পুনঃভরণ নির্ণয়বিষয়ক গবেষণা কাজে নিয়োজিত। পরমাণু শক্তি কমিশনে প্রশিক্ষিত দক্ষ জনবল না থাকায় ধীরগতির এ কাজে রাজধানীসহ দেশব্যাপি সুপেয় পানির হাহাকার।

বিশ্বে জ্বালানির চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু প্রচলিত জ্বালানির মজুদ দিনকে দিন কমে আসছে এবং এসব জ্বালানি পৃথিবীর পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করছে। পাথুরে কয়লা ও জ্বালানি তেলের পর আরো উন্নত বা বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ, বাতাস, পানি এবং পরমাণু জ্বালানি বিকল্প হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি হিসেবে পরমাণু জ্বালানি অন্যসব জ্বালানির চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের শতকরা ২০ ভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে পরমাণু জ্বালানি থেকে। বিশ্বে বর্তমানে ৪৪০টি পরমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে।

সাম্প্রতিককালে সারা দেশে বিদ্যুতের তীব্র ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিদ্যুতের অভাবে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে এ দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়েছিল ২১ মেগাওয়াট দিয়ে। আজকে স্থাপিত ক্ষমতা রয়েছে ৯,২০২ মেগাওয়াট। বর্তমানে বিদ্যুৎ পাচ্ছে দেশের ৪০% মানুষ।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। পারমাণবিক চুল্লির বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ সবচেয়ে কম। এ কারণে ভারতে

www.pathagar.com

১৭টি চুল্লি রয়েছে, যা থেকে দৈনিক ৪,১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। আরো ছয়টি নির্মাণাধীন রয়েছে। পাকিস্তানে স্থাপিত দুটি পারমাণবিক চুল্লি থেকে ৪২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া ৩টি চুল্লি নির্মাণাধীন রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়াতে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ পড়েছে ৪.১৩ সেন্ট। গ্যাসে খরচ পড়ে ৪.১৫ সেন্ট এবং একই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লায় খরচ পড়ে ১২.৩৯ সেন্ট। উন্নয়নশীল দেশগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত অগ্রগতির দিকে হেঁটে চলেছে। আমরা এখনো সনাতনী চিন্তাভাবনার উর্ধ্বে উঠতে পারছি না। পৃথিবীর অনেক দেশ ও জাতি না খেয়েও পরমাণু শক্তিধর হতে সচেষ্ট হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনার দেশ। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার রিয়্যাক্টর স্থাপনই হবে সর্বোত্তম পদক্ষেপ। ৬০ বছর আগে পাবনার রূপপুরে ২০০০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন পারমাণবিক চুল্লির ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছিল। দীর্ঘ সময় পরিত্যক্ত থাকার পর বর্তমান সরকার ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই কেন্দ্রটি চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশে দক্ষ পরমাণু প্রকৌশলী না থাকায় রাশিয়া থেকে কারিগর এনে প্রথম ১০ বছর রূপপুর পরমাণু চুল্লি চালানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এরপরও দেশে পরমাণু সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

বিশ্বব্যাপি পরমাণু কেন্দ্রগুলোতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যা ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়নি। প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ আমদানি করে পারমাণবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ১৬ কোটি মানুষের শিক্ষা দীনতা প্রকাশে আমাদের লজ্জাবনত হতে হয়।

পরমাণু প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার জন্য পরমাণু বিষয়ে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি।

দৈনিক সংবাদ : ২৫ অক্টোবর ২০১৩

www.pathagar.com

সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সকল ধর্মে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যারা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে সবাই তাদের ভালোবাসে। দেহ, মন, পোশাক, স্থান বা পরিবেশের বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জিত পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে পবিত্রতা বলা হয়। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য যে সব পন্থা বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, তন্মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। পোশাক-পরিচ্ছদের পাশাপাশি ব্যবহার্য অন্যান্য সামগ্রী পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাও স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও ধর্মসম্মত।

পরিচ্ছন্নতার পরিবর্তে ময়লা আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হওয়ায় ঢাকাকে সম্প্রতি বিশ্বের দ্বিতীয় বসবাসের অযোগ্য নগরী হিসেবে ঘোষণা করেছে এক আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা। অথচ ঢাকা শহর বিশ্বের প্রাচীন নগরগুলোর একটি। ২০০৮ সালে এই মহানগরীর বয়স ৪০০ পেরিয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬০৮ সালে ঢাকার গোড়াপত্তন হয়। তখন ঢাকার নাম ছিল জাহাঙ্গীরনগর। ১৮৬৪ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ঢাকাকে পৌরসভা হিসেবে প্রশাসনিকভাবে তালিকাবদ্ধ করে। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হয় শহরটি। ১৯৭৮ সালে পৌরসভা থেকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হয়। ১৯৯০ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নাম হয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।

এক কোটি ৫০ লাখ অপরিকল্পিত জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ। রাজধানীতে প্রতিদিন প্রায় ৩ থেকে ৪ হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপাদন হয়, যার মাত্র ৫০ ভাগ সঠিক নিয়মে ডাম্পিং করা হয়। সেই সঙ্গে অপসারিত বর্জ্যকে কল্যাণমুখী কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য আধুনিক পদ্ধতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়নি। ফলে নগরবাসীকে যেমন প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, তেমনি হুমকি সৃষ্টি হচ্ছে পরিবেশের জন্য। শারীরিক ও

www.pathagar.com

মানসিকভাবে আমাদের সুস্থ থাকা নির্ভর করে দূষণমুক্ত পরিবেশের ওপর। আমাদের বর্জ্য অপসারণ প্রক্রিয়াকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর করা প্রয়োজন, প্রয়োজন এর পরিকল্পিত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

প্রতি বছর সারা বিশ্ব থেকে অর্ধকোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ্ব পালন করতে সৌদি আরবে গমন করেন। প্রায় দেড় মাস জেদ্দা, মক্কা, মদিনা, মুসফালিকা, মীনা এলাকায় অবস্থান করেন। সৌদিদের পাশাপাশি হাজীসাহেবগণ একাধিক হালাল পশু কুরবানি করেন। কুরবানির পশুর বর্জ্যগুলো সূর্য উদয়ের পূর্বে অপসারণ করা হয়। সেই দেশে কোনো কলেরা হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়নি। একদল প্রশিক্ষিত ডিপ্লোমা বর্জ্য প্রযুক্তিবিদ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করে। কুরবানির ঈদের পশুর বর্জ্য অপসারণ প্রক্রিয়ায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ডায়রিয়া রোগের বিস্তার ঘটায়। এই সময়ে মহাখালীস্থ কলেরা হাসপাতাল (আইসিডিডিআর,বি) কর্তৃপক্ষ রোগী সংকুলান করতে কাঁঠাল তলায় তাঁবু টাঙ্গিয়ে মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করে।

প্রতিদিন জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা। পণ্য চাহিদা পূরণে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে শিল্প-কারখানা। কারখানায় নির্গত বিষাক্ত বর্জ্য নগর মহানগর বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বর্জ্যমিশ্রিত পানির কারণে ৭ লক্ষ একর জমিতে ফসল উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষ ও গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, নদী, খাল-বিলের মাছ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিবিদের অভাবে শিল্প-কারখানাগুলোতে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে না।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অর্থায়নে দেশের সকল হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজে শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের হাত ধোয়া (হ্যান্ডওয়াশ) ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য অপসারণ প্রক্রিয়ায় মাঝে মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকের অভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান থাকছে না। মুখস্থ বুলি আওড়িয়ে অনিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালনার ফলে বিপজ্জনক বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনার এই মহতি উদ্যোগ আলোর মুখ দেখেনি।

একসময় বর্জ্য ছিল খেলনা। সৃষ্টি করত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা, শিল্পপতিদের দেশপ্রেমে বর্জ্য এখন খনিজদ্রব্যের মতো মূল্যবান

www.pathagar.com

সম্পদে পরিণত হয়েছে। প্লাস্টিক ধাতুর চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে বর্জ্য থেকে। পচনশীল বর্জ্য থেকে জৈব সার, বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন করে অর্থকরী সম্পদে পরিণত করা হয়েছে। ক্ষতিকর শিল্পে রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পৃথক করার মতো যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবলের অভাবে সম্ভাবনার এই অর্থনৈতিক খাত অবহেলিত রয়েছে।

সরকারি, আধা সরকারি, সামরিক, পুলিশ বাহিনী, অফিস আদালত, সিটি কর্পোরেশন পৌরসভায় যেসব কর্মী সুইপার পদে নিয়োজিত তাদের বর্জ্য অপসারণ নিষ্কাশন ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা বা ন্যূনতম প্রশিক্ষণ নেই। পৃথিবীর সব দেশেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিজে বাঁচো অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করো (Safty First) নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের নির্দিষ্ট মেয়াদের ডিপ্লোমা কোর্স অধ্যয়ন করতে হয়। ইনস্টিটিউট অব ক্লিনিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উন্নত, উন্নয়নশীল বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের আরবদেশগুলো বাংলাদেশ থেকে পরিচ্ছন্ন কাজে জনশক্তি নিয়োগে আগ্রহী। কিন্তু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কোর্স না থাকায় হাতছাড়া হচ্ছে জনশক্তি রপ্তানি বাজার। ঝুঁকিপূর্ণ এ কাজে পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা সময়ের দাবি।

প্রশিক্ষিত ব্যবস্থাপনাকর্মী দেশের বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করবে। ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদের রক্ষা করবে। স্বয়ংসম্পূর্ণ খাত হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটবে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

দৈনিক ডেসটিনি : ৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

পরিবেশ সংরক্ষণের পরিকল্পিত শিক্ষা

আমাদের চারপাশে যা কিছু তা নিয়েই পরিবেশ। সৌরজগতের বিশাল বিস্তারের মাঝে ছোট্ট সবুজ গ্রহ আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী। প্রতিনিয়ত অপরিকল্পিত আর অনিরাপদ পদ্ধতির শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রভাবে ক্রমান্বয়ে মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে প্রাণোচ্ছল এই গ্রহ। প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ আর জনসচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই দিনটিতেই জাতিসংঘের মানবিক কনফারেন্স শুরু হয়েছিল। এই কনফারেন্স হয়েছিল ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৫ থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত। বিশ্ব পরিবেশ দিবস প্রথম পালিত হয় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। এর পর থেকে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সমগ্র বিশ্বে সৃষ্টি হয়েছে সচেতনতা ও কর্মতৎপরতার প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন দেশের সরকার ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সর্বস্তরের সচেতন জনসাধারণও পরিবেশ বিপর্যয়ের ভয়াবহ পরিণাম উপলব্ধি করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই মন্ত্রণালয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করে এবং জনগণের মধ্যে এর গুরুত্ব তুলে ধরে। এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে র‍্যালি, সমাবেশ, আলোচনাসভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন ছাড়াও প্রচার মাধ্যমে গণসচেতনামূলক ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ও নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোনো মানুষের দেহ ও মনের সুস্থতা দূষণমুক্ত এবং উন্নত পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল, উন্নত, অনুন্নত সকল দেশই ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার। পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৫০ কোটি বছর। প্রাণের উদ্ভবের দিক থেকে উদ্ভিদকে পৃথিবীর আদি প্রাণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সূর্যের শক্তি শুষে নিয়ে উদ্ভিদ পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার করেছিল। প্রায় বিশ লক্ষ বছর ধরে মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতি হয়েছে। দুশো বছরের আগে শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শুরু করে। এর সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রকৃতির উপর মানুষের অত্যাচার। উনিশ শতকের শেষদিকে ব্রিটিশ শাসকরা এই উপমহাদেশে বন ব্যবস্থাপনা শুরু করলেও সবচেয়ে বেশি বৃক্ষসম্পদ ধ্বংস হয় এই ব্রিটিশদের হাতেই। শিল্পায়ন, রেলওয়ে স্লিপার ও নৌবাহিনীর বিশাল বহরের চাহিদার যোগানের জন্য যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, এ দেশ থেকে প্রাকৃতিক বনের কাঠ পাচারের মাধ্যমে আমাদের বন উজাড় শুরু। অথচ মানুষসহ প্রাণিজ বৈচিত্র্য নির্ঝঞ্ঝাট করতে উদ্ভিদপ্রাণ অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

এদিকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগে সয়লার হয়ে যাচ্ছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ সারা দেশের বিপণি কেন্দ্রগুলো। পরিবেশের জন্য হুমকি পলিথিনের ব্যবহার রোধে জুটমিলগুলোতে জুট টেকনোলজিস্ট নিয়োগের মাধ্যমে কাগজের তৈরি ঠোঙা ও জুট ব্যাগ শিল্পের প্রসারে পরিকল্পনা প্রয়োজন। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিঃসৃত বর্জ্য পরোক্ষভাবে সমুদ্র-দূষণ করে, যেমন— উপকূল সংলগ্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো থেকে নির্গত গরমজল সমুদ্রের জলে মিশে গিয়ে অক্সিজেনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দেয়। অম্ল/ক্ষার জাতীয় বর্জ্য খুব ধীরে হলেও সমুদ্রের জলের পিএইচ পরিবর্তন করে। ধাতব সম্পর্কিত কারখানা থেকে নিঃসৃত সায়ানাইড খুব ছোট অঞ্চলে হলেও সমুদ্র-দূষণে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে। প্লাস্টিক জাতীয় বর্জ্যে যেমন- বোতল, ব্যাগ, দড়ি ও বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরার সামগ্রী ইত্যাদি ছাড়াও যে সমস্ত সূক্ষ্ম কণা জলে ভাসমান থাকে তা প্রাণিদের শ্বাসকার্যে এবং উদ্ভিদের সূর্যের আলো পেতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। দ্বীপ উপকূলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের পূর্বে পেশা ও পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে ঝুঁকিমুক্ত শিল্প গড়ে উঠবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষার পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থাপনাকে স্যাটিটেশন বলা হয়ে থাকে। ন্যাশনাল স্যানিটেশন ফাউন্ডেশনের মতে স্যানিটেশন হলো একটি গুণগত বৈশিষ্ট্য যেটি পরিষ্কার বাসস্থান, পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা ও পরিষ্কার লোকসমাজকে সমষ্টিগতভাবে আলোকপাত করে। স্যানিটেশন একটি ব্যবস্থা যেটি বিভিন্নভাবে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে রোগের উৎস ও বিস্তার প্রতিরোধ করে মানুষের স্বাস্থ্য বজায়

www.pathagar.com

রাখতে সাহায্য করে। সুস্বাস্থ্যসহ সর্বক্ষেত্রে বিশেষায়িত প্রযুক্তিনির্ভর কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে প্রয়োজন দক্ষ প্রশিক্ষিত ডিপ্লোমা শ্রমশক্তি। পরিবেশ সংরক্ষণ করে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের পরিকল্পিত শিক্ষা এখনই শুরু করতে হবে।

দৈনিক সংবাদ : ৫ জুন ২০১৪

www.pathagar.com

মাদকের ভয়াল থাবা

১৯৮৭ সাল থেকে ২৬ জুন জাতিসংঘ ঘোষিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস বিশ্বব্যাপি পালিত হয়। মাদকবিরোধী গণসচেতনতার বার্তা নবায়ন করে, সমগ্র বিশ্বকে আরেকবার উদ্দীপ্ত, জাগরিত এবং উজ্জীবিত করে। এই দিনে জাতিসংঘের অগ্রাধিকার তালিকার অন্যতম বিষয় মাদক সমস্যা। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধের পেছনে মাদকের অবৈধ ব্যবসা ও অপব্যবহার অন্যতম কারণ। মাদকাসক্তদের শতকরা ৮০ ভাগ তরুণ-যুবসম্প্রদায়। মাদক HIV/AIDS ও হেপাটাইটিস বিস্তারে সহায়ক বলে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি।

মাদকাসক্তি একটা আসক্তি (Addiction), যার নেই কোনো সাহিত্যিক সংজ্ঞা, নেই কোনো জ্যামিতিক নির্দিষ্ট আকৃতি, যা মানে না কোনো বীজগণিতীয় সূত্র, শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে একবার এ ফাঁদে পা দিয়েছে তার অন্তত এ আসক্তির মোহ থেকে নিস্তার নেই—মন্থর মৃত্যুর এক অবশ্যম্ভাবী এর পরিণতি। আজকের দুনিয়ার প্রচণ্ড ভূমিকম্প, টর্নেডো, বিমান দুর্ঘটনা ও সন্ত্রাসী বোমা হামলার চেয়েও মাদক ভয়ংকর ও মারাত্মক। শুধু তাই নয় আধুনিক বিশ্বের পারমাণবিক বোমাকেও Drug Addiction হার মানিয়েছে।

আদিকালের পশুজীবন থেকেই মাদকের সঙ্গে মানুষের পরিচয়। খাবারের খোঁজে বিভিন্ন ফুল, ফল, মূল, পাতা বা বাকলের স্বাদ নিতে গিয়ে মানুষ প্রথম শনাক্ত করে কিছু উদ্ভিদ, ফুল, ফল বা পাতাকে, যেগুলো খেলে বা গন্ধ নিলে মাথায় বা শরীরে একটি বিশেষ ধরনের অনুভূতি তৈরি হয়। এই বিশেষ অনুভূতিটির অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্য সভ্যতাপূর্ব মানুষ সেই বিশেষ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের অংশ বারবার গ্রহণ করত। মানবসত্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কৌতূহল। কেমন অনুভূতি হয়—এই কৌতূহলের বশে অনেকেরই

www.pathagar.com

মাদকসেবনের হাতেখড়ি হয়। তারপর ধীরে ধীরে ফাঁদে জড়ায়। বন্ধুসঙ্গও অনেককে মাদকে অভ্যস্ত করে। জীবনের ব্যর্থতা বা যন্ত্রণা ভুলতে অনেকে নেশায় আসক্ত হয়। রোমাঞ্চকর অনুভূতি বা ফ্যান্টাসি তৈরির ভাবনা থেকেও কেউ কেউ মাদক নেয়। অনেকে আনন্দে বুঁদ হওয়ার জন্য মাদক নেয়া শুরু করে।

যেসব রাসায়নিক উপাদান ও ওষুধ মানুষের স্নায়ুতে অবসাদ, উত্তেজনা, মতিভ্রম ও প্রশান্তি, ঘুম অথবা নেশা তৈরি করে, সেসব দ্রব্যকেই মাদকদ্রব্য বলা হয়। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য চালু আছে। মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম ইত্যাদির নেশা বহু প্রাচীনকালের। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মাদকদ্রব্যেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। বর্তমান কালের মাদকদ্রব্য হিসেবে হেরোইন, মারিজুয়ানা, এলএসডি, পেথিডিন, কোকেন, মরফিন, চরস, ক্যানাবিস, কোডিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিককালে ইয়াবার জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। তবে আমাদের দেশের যুবসমাজ অতি সামান্য কারণে যেসব ড্রাগকে মাদকদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করে তার মধ্যে হেরোইন, সিডাকসিন, ইউনকটিন, পেথিডিন, ফেন্সিডিল ইত্যাদি প্রধান। বাংলাদেশে অধুনা আবির্ভূত ইয়াবা আসলে অ্যামফিটামিন এর একটি যৌগিক মিশ্রণ। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি মুখে গ্রহণ করলে ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে স্নায়ু উত্তেজক ক্রিয়া শুরু হয়। ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এ সময়ের মধ্যে ব্যবহারকারী শারীরিক ও মানসিকভাবে এমন এক জগতে অবস্থান করে যেখানে কোনো ক্ষুধা, বেদনা, ক্লান্তি, অবসাদ নেই।

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী অঞ্চলের মধ্যবর্তী হওয়ায় মাদকদ্রব্যের অবৈধ পাচার ও অপব্যবহার থেকে মুক্ত থাকা অনেকটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও লাওসের সীমান্তস্থিত পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত। এ কারণে বলা যায়, বাংলাদেশ বিশ্বে বৃহত্তম মাদক উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের থাবার মধ্যে অবস্থান করছে। ভৌগোলিক অবস্থানই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক চোরাচালানের ট্রানজিট রুট ও করিডোরে পরিণত করেছে। এ কারণে সরকার মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকার মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য দেশের চারটি বিভাগীয় শহরসহ বিভিন্ন জাতীয় আঞ্চলিক সংগঠন সংস্থা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মাদকাশক্তি নিরাময় ও চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তুলেছে।

www.pathagar.com

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। প্রতিটি মানুষ সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী সামাজিক জীবন প্রত্যাশা করে। অথচ সেই প্রত্যাশা ভেঙে-চুরে খান-খান হয়ে যায় কিছু মানুষের অনাচার ও অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার তার মধ্যে অন্যতম। বর্তমান বিশ্বে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ফলে মাদকসেবীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে এইচআইভি সংক্রমণ ও নানাবিধ অপরাধ।

পৃথিবীর সকল ধর্মে নেশাকারীদের কোনো স্থান নেই। মাদককে দেহের জন্য ক্ষতিকারক হিসেবে গণ্য করে তা গ্রহণ না করার জন্য বলা হয়েছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির মনে শুদ্ধ/কল্যাণবোধ জন্মায় না বিধায় তা বর্জন করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে।

যুবসমাজ একটি দেশের মহামূল্যবান সম্পদ। এই গোষ্ঠীই সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত যুবসমাজের ভূমিকা গৌরবদীপ্ত। আমাদের যুবসমাজের একাংশ আজ নিজেদের ধ্বংস করার পথ ধরেছে। মাদকের মরণনেশায় তারা আজ আক্রান্ত। সর্বনাশা এ মাদক সেবন করে উঠতি বয়সের কিশোর, তরুণ যুবক বিপথগামী হচ্ছে।

নেশায় অভ্যস্ত হবার পর জগতের সমস্ত সুন্দর চিন্তা মাথা থেকে অপসৃত হয়ে যায়। যে কিশোরটি ছিল শান্ত-সুবোধ সে-ই হয়ে ওঠে অপরাধপ্রবণ। শহরাঞ্চলে যত ছিনতাই রাহাজানি ঘটে তার অধিকাংশই হয়ে থাকে নেশাগ্রস্ত তরুণ-কিশোরদের দ্বারা। নেশার টাকা যোগাড় করতে যেয়ে তারা চুরি ছিনতাইয়ের মতো অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়।

মাদকদ্রব্যের সমস্যা আমাদের অন্যতম প্রধান জাতীয় সমস্যা। দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন এবং খাদ্য ও বেকারত্ব সমস্যার মতো এ সমস্যা এখনই আমাদের চিত্তবিদারক না হলেও বাংলাদেশে সম্প্রতি মাদকাসক্তি বৃদ্ধি, আমাদের জাতীয় জীবনের এক অবশ্যম্ভাবী ভয়াল পরিণতির ইঙ্গিত দেয়। মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধের ক্ষেত্রে 'prevention in better than cure' এটাই সবচেয়ে ভালো পন্থা। মাদক সমস্যা শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতেরও সমস্যা। কিছু কিছু সমস্যা বর্তমানে সমাধান করলেই হয় না, যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে চলতে একটা সময় জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে।

পৃথিবীতে সমস্যা বলতে কিছু নেই। কারণ প্রতিটি সমস্যারই একটা সমাধান রয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাধি মাদকেরও সমাধান রয়েছে।

www.pathagar.com

বর্তমান ছাত্র ও যুব সমাজের মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ হলো বেকার সমস্যা। যুবসমাজের বেকার সমস্যা আজ দেশের উন্নয়নের মেরুদণ্ড (Development Pole)-কে বাঁকিয়ে রেখেছে। বেকার সমস্যা আজ ক্রমশ অক্টোপাসের (Octopus) মতো সমগ্র জাতিকে গ্রাস করতে চলেছে। দেশে এমন কোনো পরিবার নেই যেখানে বেকারত্বের (Unemployment) দীর্ঘশ্বাস নেই। ক্ষুদ্র দেশে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মিলে প্রায় তিন কোটি লোক বেকার এবং এ বেকার সমস্যা অন্যতম জাতীয় সমস্যা।

রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম এই নীতি অনুসরণ করে দেশ থেকে চিরতরে মাদকাসক্তের সংখ্যা নির্মূল করা সম্ভব। মাদকাসক্ত আক্রান্তের বেশিরভাগই এসএসসি পাস যুবক। শিক্ষাজীবনে সকলেরই প্রত্যাশা ছিল লেখাপড়া শেষ করে কর্মের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ, জাতির সেবা করবে, বাস্তবে দেখা যায় অন্যরকম চিত্র। এসএসসি সার্টিফিকেট প্রদর্শন করে কোনো চাকরি পায় না। ডিপ্লোমা প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাবে নিজ উদ্যোগে কর্মসংস্থান গড়ে তুলতে পারে না। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে এক সময় বাধ্য হয় মাদকদ্রব্য সেবন করতে।

অথচ একজন যুবক/যুবতী একটি পরিবারের প্রাণ, সমাজের আশীর্বাদ এবং দেশের সম্পদ। সবাই আশা করে যে, সে তাঁর যৌবনের শক্তি এবং প্রাণের উচ্ছ্বাস দিয়ে নিজের পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে। তাই কোনো যুবক-যুবতী মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে শুধু সেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সঙ্গে সঙ্গে পরিবারটিও বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তারুণ্যের বিকাশ আর দেশের প্রগতি ও উন্নয়নের রয়েছে এক সমান্তরাল অবস্থান। তাই এ টগবগে তরুণ তরুণীরা যেন মাদকদ্রব্যের নেশা থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে ভবিষ্যৎ মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে এটাই এ মুহূর্তে আমাদের কর্মপরিকল্পনা হওয়া উচিত।

এই তরুণদেরকে কৃষি, পোল্ট্রি, লেদার, ক্রিকেট, ফুটবল, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা, ডেন্টাল হাইজিন, শিপ তৈরি, শিপ পরিচালনা, বিমান তৈরি, পাইলট, এয়ার হোস্টেজ, নিউক্লিয়ার ইত্যাদি প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলে নিজ এলাকায় সংশ্লিষ্ট শিল্প গড়ে তোলার জ্ঞান আহরণ করত। উচ্চ বেতনে বিদেশে চাকরির সুযোগ হতো। মাদকের অভিশপ্ত জীবন না হয়ে উন্নয়নে কর্মচঞ্চল হয়ে আবির্ভূত হতো।

দৈনিক সংবাদ : ৯ জুলাই ২০১৪

www.pathagar.com

যুবসমাজের সমবায়ী মনোভাব

৫ জুলাই আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস। বরাবরের মতো এবারও এ দিবসটি পালিত ও উদযাপিত হচ্ছে সমবায় আন্দোলনের মহৎ উদ্দেশ্য ও আদর্শকে শক্তিশালী ও জোরদার করার জন্য। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালিত হয়ে থাকে।

সমবায় একটি সামাজিক উদ্যোগ, একটি গণমানুষের নিজস্ব চেতনার আন্দোলন, একটি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং পুঁজি সৃষ্টি সহায়ক উন্নয়ন পদ্ধতি। 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' 'দশের লাঠি একের বোঝা'—এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত সমবায় খাত। সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকাণ্ডে যেমন রয়েছে সামাজিক কল্যাণ, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, আর্থিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, তেমন রয়েছে গণতন্ত্রের চর্চা, নেতৃত্ব ও নৈতিকতার বিকাশের সমান সুযোগ। দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার, বেকারত্ব নিরসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম সমবায়কে 'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা আয়রে আয় দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায় সমবায়' হিসেবে কবিতায় উদ্বৃত করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার ভিত্তিতে দ্বিতীয় খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ আন্দোলনের মূলকথা ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে সমষ্টির স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে।

ফ্রান্সের প্রতি ১০ জন কৃষকের ৯ জনই সমবায়ী। মোট আমানতের ৬০ ভাগ সমবায় ব্যাংকে সংরক্ষিত এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের ২৫% সমবায়। কোরিয়ার ৯০% কৃষক সমবায়ী এবং সমবায়ী কৃষকের সংখ্যা ২ মিলিয়নেরও বেশি। তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারমূল্য ১১ মিলিয়ন ইউএস ডলার। তাছাড়া মোট মৎস্য উৎপাদনের ৭১ ভাগ সমবায়ী মৎস্যজীবীরা উৎপাদন করে থাকে। কুয়েতের খুচরা বাজারের ৮০% সমবায়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

নিউজিল্যান্ডের জিডিপি এর ২২% আসে সমবায় খাত থেকে। ৯৫% ডেইরি সামগ্রী সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় এবং ডেইরি পণ্য রপ্তানির ৯৫% আসে সমবায় খাত থেকে। এছাড়া ৭০% মাংস, ৫০% কৃষিজ সামগ্রী, ৭০% সার বিপণন, ৭৫% পাইকারি ওষুধ, ৬২% মুদি ব্যবসা সমবায়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। নরওয়ের ৯৯% ডেইরি পণ্য সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়ে থাকে। ভোগ্যপণ্য বাজারের ২৫% সমবায়ের দখলে এবং প্রতি ৩ জন নরওয়েবাসীর মধ্যে ১ জন সমবায়ী। সিঙ্গাপুরের ভোগ্যপণ্য সমবায়গুলো মোট বাজারের ৫৫% নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যাদের বার্ষিক টার্নওভার ৭০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ভিয়েতনামের মোট জিডিপির ৮.৬% আসে সমবায় খাত থেকে। এশিয়ার সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ জাপানে শুধু ভোক্তা সমবায় সমিতির সদস্য প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ। জাপানে প্রতি ৫ পরিবারের একটি পরিবার রিটেল সমবায়ের সদস্য যার ৯০ শতাংশ নারী। ভারতে দুগ্ধ সমবায় কার্যক্রমে ২২টি রাজ্য ফেডারেশনের ১২০টি ইউনিয়ন এবং ১ লক্ষ প্রাথমিক সমবায় সমিতি সম্পৃক্ত রয়েছে। সারা দেশের প্রায় ২৮৫টি জেলায় ১ কোটি ১০ লাখ সদস্য নিয়ে এ কার্যক্রম বিস্তৃত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু হওয়া সমবায় ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বব্যাপি ভিন্ন ভিন্ন রূপ, কাঠামো ও কার্যক্রমের মাধ্যমে উজ্জ্বল উপস্থিতি বজায় রেখেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও আমেরিকার বৃহত্তর আঞ্চলিক পরিসরে সমবায় অর্থনীতির তৃতীয় খাত এবং সামাজিক অর্থনীতির প্রধানতম অবলম্বন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিন্দু থেকে সিন্ধু গড়ে ওঠে। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবায় আন্দোলন প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে, সে সঙ্গে নতুন নতুন দিগন্ত সংযোজিত হচ্ছে। সমবায়ীদের সমবেত প্রচেষ্টা দারিদ্র্যবিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র সম্পদকে একত্র করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রচনা করছে। কৃষি, মৎস্য, তাঁত, সেচ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সমবায় সমিতি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। সকল সমবায়ী দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

সমবায়ের ধ্যান-ধারণা ও প্রয়োগ এ উপমহাদেশে অনেক দিনের পুরনো। ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন করা যায় কিনা তা খতিয়ে

www.pathagar.com

দেখার জন্য ১৯০১ সালে স্যার এডওয়ার্ডের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে এবং এই কমিটি একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। এই কমিটির সুপারিশের পর তদানীন্তন আইন সচিব স্যার ইবেটসন ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি প্রণয়ন করেন।

১৯১২ সালে পুনরায় সমবায় আইন প্রণয়ন করা হয়। এটি The Co-operative Societies Act 1912 নামে পরিচিত। এই আইন ১৯০৪ সালের আইনের বহু ত্রুটি সংশোধন করে। এই আইন করার মাধ্যমে ঋণদান সমিতি গঠন করা ছাড়াও অন্যান্য ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করার বিধান ছিল। এগুলো হলো উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, ক্রেতা ও বিক্রেতা সমবায় সমিতি ইত্যাদি। Maclagan Committee অক্টোবর ১৯১৪ সমিতির উন্নতির জন্য কিছু সুপারিশ প্রদান করে। এই কমিটির সুপারিশের মধ্যে ছিল উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদান, শুধু সদস্যদের ঋণ দেয়া এবং শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয় জড়িত ছিল।

১৯১২-১৯২১ সালে সমবায়ের একটি সমৃদ্ধির সময় ছিল। ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড (Montagu Chalmos Ford Act) আইন পাস হয় এবং সমবায় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়।

এই আইন পাসের পর ১৯২৫ সালে বোম্বেতে, ১৯৩২ সালে মাদ্রাজে, ১৯৩৫ সালে বিহার ও উড়িষ্যায় এবং ১৯৪০ সালে বাংলাদেশে সমবায় আইন জন্ম নেয়। The Bengal Co-operative Societies Act 1940 নামে এটা পরিচিত। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন কারণে সমবায় আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষি সমবায় সমিতি কৃষিঋণ সম্পর্কে ১৯৪৪ সালে গ্যাডগিল কমিটি এবং ১৯৪৫ সালে সরাইয়া কমিটি গঠন করে এসব কমিটি সমবায়কে কৃষি ঋণের বিকল্প হিসেবে চিহ্নিত করে।

১৯৪৮ সালে জন্ম নেয় সমবায় ব্যাংক। সমবায় ব্যাংক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণ দেয়া শুরু করে। ১৯৬০ সালে মৎস্যজীবীদের নিয়ে গঠিত হয় প্রভিনসিয়াল ফিশারম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, বর্তমানে যা জাতীয় মৎসজীবী সমবায় সমিতির নামে পরিচিত। ১৯৬১ সালে কৃষিপণ্য বিপণনের জন্য গঠিত হয় সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি। পাট, কাপড় ইত্যাদি নিয়ে ১৯৪৯ সালে গড়ে ওঠে সমবায় শিল্প সংস্থা, ১৯৫১ সালে সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস লি., ১৯৬২ সালে কো-অপারেটিভ জুট মিলস তৈরি হয়। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ

www.pathagar.com

প্রবর্তিত সমবায় আইন চালু ছিল। ১৯৮৬ সালে দ্য বেঙ্গল কো-অপারেটিভ আইন বাতিলপূর্বক সমবায় সমিতিসমূহ ১৯৮৪ অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৮৭ সালে সমবায় বিধিমালা জারি করা হয়। বর্তমানে উপর্যুক্ত আইনের অধীনে সমিতিগুলো পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে গোঁজামিল দিয়ে। তা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণায় প্রকাশ পায়। ১৫ এপ্রিল ২০১৪ রাজধানীর একটি হোটেলে টিআইবি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে সমবায়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও সমিতিগুলোর বিভিন্ন সমস্যার কারণে দেশের প্রায় ৪৭ শতাংশ সমবায় সমিতি অকার্যকর রয়েছে বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

সমবায় সমিতিকে অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত রাখতে টিআইবির পক্ষ থেকে কিছু সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশমালা হচ্ছে, 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩'-এর আলোকে সমবায় সমিতি বিধিমালা সংশোধন ও একটি যুগোপযোগী 'সমবায় নীতিমালা' প্রণয়ন।

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে মানুষের আর্থিক নিশ্চয়তা ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সমবায়কে কাজে লাগাতে হবে পরিকল্পিত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে। সমবায় আন্দোলনের সংস্কার এখন খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ যেহেতু যুবসমাজ সেহেতু সমবায়ের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে পারলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। যুবসমাজই দেশের প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান ধারক ও বাহক। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিয়ে তাদেরকে যথাযথভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসূচি থাকতে হবে। তবেই সুগম হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথ।

৫৬ হাজার বর্গমাইলের ক্ষুদ্র বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৬ কোটি। সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত সমিতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৯০টি। সদস্য সংখ্যা ৭৬ লক্ষ ২৮ হাজার ২৫৯ জন। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, বিভাগীয় জেলা-উপজেলা চাকচিক্যকর মনোমুগ্ধকর অফিস, বাড়ি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, নিবন্ধক, পরিচালক, উপ-পরিচালক, জেলা, উপজেলা, সমবায় কর্মকর্তা, এমএলএসএস পদে ৪৪ হাজার ৪১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত।

www.pathagar.com

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, পেনশন ভাতা, গাড়ি, বাড়ি বাবদ প্রতি বছর ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

সমিতির সংখ্যা, অর্থবরাদ্দ লোকবল বাংলাদেশের আয়তন জনসংখ্যা অনুপাতে বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এত আয়োজন ঢাকঢোল পিটানো অর্থ বরাদ্দের পরও সমবায়ের অধীনে এ দেশের জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। এখনও সিংহভাগ মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ৩ কোটি যুবক বেকার জীবন কাটাচ্ছে। বাংলাদেশ লজ্জাজনক এলডিসি (Least Development Country) নামে অভিহিত হয়েছে।

ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশের এক গবেষণায় প্রকাশ পায়, সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা ও সদস্যদের কারোর আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণ নেই। সদস্যদের পণ্যভিত্তিক প্রযুক্তিজ্ঞানের অভাবে সমবায় সমিতিগুলো উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনার পরিবর্তে সুদি বা দাদন ব্যবসায়ে জড়িত।

দেড় লক্ষ সমিতির ৭৬ লক্ষ ২৮ হাজার ২৫৯ জন সদস্যের অর্ধেক সদস্যও ডিপ্লোমাধারী হলে প্রতিটি সমিতি একটি শিল্পে অথবা খামারে পরিণত হতো। গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলার কম্পিউটার, টেলিভিশন, মোবাইল, জেনারেটর, ট্রাকটর, এক্সরে মেশিন তৈরি হতো। উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরীগুলো যুগ যুগ ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকত না। এ দেশের চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নত যে কোনো দেশের সমতুল্য হতো। বাংলাদেশ আমদানিকারক দেশের পরিবর্তে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হতো। জিডিপি ২ ডিজিট অতিক্রম করতো। বাংলাদেশে সমবায় সমিতিগুলোর প্রযুক্তিহীন কর্মকাণ্ডের ফলে বাস্তবে দেখা যায় অন্য রকম চিত্র।

১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডের রচডেল শহরে ১৮ জন বেকার যুবকদের নিয়ে রবার্ট ওবেন যে সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু করেছিলেন, তাদের ৭ জনই ছিল তাঁতশিল্পে ডিপ্লোমাধারী। তাঁদের মূলধন ছিল মাত্র ২৮ পাউন্ড। তারা সেই দিন ২৮ পাউন্ড দিয়ে সুদি-সুদি ব্যবসা করেনি। সুতা-তাঁতকল রংয়ের সাথে সকলের লব্ধ প্রযুক্তিজ্ঞান সমন্বয় ঘটিয়ে ইতিহাসে সমবায় আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন।

সমবায় আন্দোলনের সাথে বাংলাদেশের যুবসমাজকে সংঘবদ্ধ করতে হলে এসএসসি পাস প্রতিটি তরুণকে পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যায়

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রামে নির্মাণ করতে হবে নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ প্রযুক্তিবিদ্যা ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট। তৃণমূলে ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট নির্মাণে প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভূমিকা পালন করার জন্য প্রয়োজন একটি বোর্ড। বোর্ডের সৃজনশীল কর্মতৎপরতায় দাদন আর দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস মুক্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত সমবায়ী হয়ে উঠবে দেশের যুবসমাজ।

দৈনিক ইত্তেফাক : ৫ জুলাই ২০১৪

www.pathagar.com

জনাধিক্য সমস্যা উত্তরণ

সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও আজ পালিত হচ্ছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। এ দিবসকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আড়ম্বরের সাথে পালন করছে এই দিবস। শোভাযাত্রা, রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালের ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা ৫শ' কোটি পূর্ণ হয়, এ কারণে তখন থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিবসটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উদযাপন শুরু করে। জাতিসংঘের সম্মতিক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয় বাংলাদেশে। এরপর ৩১ অক্টোবর ২০১১ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭০০ কোটি হয়েছে। আগামী ১৩ বছরে পৃথিবীতে আরও ১০০ কোটি মানুষ বাড়বে বলে বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন। ফিলিপাইন প্রথম দাবি করে, ৭০০ কোটিতম শিশুটি জন্ম নিয়েছে তাদের দেশে। ম্যানিলার হোসে ফ্যাবিলা মেমোরিয়াল হসপিটালে জন্ম নেওয়া কন্যাশিশুটির নাম রাখা হয়েছে ডানিকা মে কামাচো।

জাতিসংঘের হিসাব মতে পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে জন্ম নিচ্ছে দুটির বেশি শিশু। শুধু ভারতেই প্রতি মিনিটে জন্ম নিচ্ছে ৫১টি শিশু। এর মধ্যে ১১টিই জন্ম নেয় সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তর প্রদেশে। বাংলাদেশের সাতশো কোটিতম নবজাতক মেয়ে শিশুটির নাম ঐশী। তার মায়ের নাম তন্নি হোসেন। আজিমপুর সরকারি মা ও শিশু হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয় ঐশী। এ উপলক্ষে পুরো হাসপাতালে ছিল উৎসবের আমেজ। আগে থেকেই এ জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়া ছিল। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল—ইউএনএফপিএর উদ্যোগে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের হারের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে স্বাধীনতার সময় সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যা ছিল দেশের বহন ক্ষমতার বাইরে।

www.pathagar.com

দারিদ্র্যের হার ছিল ৮০ শতাংশ। আজকের জনসংখ্যা স্বাধীনতা-উত্তরকালের তুলনায় দ্বিগুণ। এখনো প্রতি বর্গকিলোমিটারে যে জনঘনত্ব, তাবৎ দুনিয়ার সকল জনগোষ্ঠীকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর করা হলে তারপরেও বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব হবে যুক্তরাষ্ট্রেরও বেশি।

বিশ্বের দরিদ্রতার মূলে জনসংখ্যা না শোষণ-বৈষম্য? এ প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে একটি বিতর্ক চলে আসছে। সমাজতন্ত্রীরা জনসংখ্যাকে দারিদ্র্যের মূল কারণ হিসেবে দেখেন না। বরং এটাকে তারা সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। গণতন্ত্রীরা দরিদ্রতর মূলে জনসংখ্যাকেই দায়ী করে আসছেন। জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করে যে সব দেশে শিল্প বিকাশ ঘটছে, সে সব দেশে জনশক্তি কোনো সমস্যা নয়। তাদের সাধারণত জনশক্তি আমদানি করে চলতে হয়। আজ বিশ্ব এমন এক যুগে প্রবেশ করেছে, যেখানে জনশক্তি রপ্তানি করেও অনেক দেশ ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসংখ্যা প্রযুক্তি শিক্ষা পরিকল্পনার আওতায় আনার নিরন্তর চেষ্টা অব্যাহত না রাখলে বিপর্যয় অবধারিত।

সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার। অথচ জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) প্রতিবেদন অনুযায়ী এ সংখ্যা ১৬ কোটি ৪৪ লাখ। প্রকৃত জনসংখ্যা যাই হোক, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, জনসংখ্যা আমাদের দেশে সম্পদ না হলে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের অর্থনীতি হচ্ছে ঘাটতি বাজেটের অর্থনীতি। সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাব পূরণ দুরাশা মাত্র। দেশে প্রতি বছর কর্মক্ষম জনশক্তির সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে বেকারের সংখ্যাও। ২০১৫ সালে এ সংখ্যা দাঁড়াবে ৪ কোটিতে। জনসংখ্যার আধিক্য এদেশে একটি স্থায়ী সমস্যা।

বিশ্বের অনেক শিক্ষিত ও সুউন্নত দেশগুলোতে ভৌগোলিক আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় মানুষের সংখ্যা খুবই কম। তারা উন্নতমানের জীবন যাপন করে। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে বিশেষ করে ইউরোপের কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক। সুশিক্ষার কারণেই তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে উন্নতমানের জীবনযাত্রার অধিকারী হয়েছে। উন্নত দেশের শিক্ষার হার ১০০ ভাগ।

আমাদের দেশে রাজধানীর অলি-গলিতে বা দেশজুড়ে নানা ধরনের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সরকারি নামি-দামি প্রতিষ্ঠানগুলোতে

www.pathagar.com

ভর্তি হতে না পেরে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও অধিক খরচে লেখাপড়া করছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। লেখাপড়া শেষে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে কোথাও চাকরি পাচ্ছে না। পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত বর্তমানে দেশে প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ যুবক-যুবতী বেকার। এই বেকার সমস্যা জাতীয় সমস্যা হিসেবে ভেসে উঠেছে। তারা যদি কারিগরিবিষয়ক কর্মবান্ধব ডিপ্লোমা শিক্ষা গ্রহণ করত তবে, দেশে বেকার সমস্যা চোখে পড়ার মতো মনে হতো না। স্বউদ্যোগেও সৃষ্টিশীল কর্মউপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারত।

সরকারি, বেসরকারিবভাবে গড়ে ওঠা শিল্পকারখানায় দক্ষ জনশক্তির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। একজন অদক্ষ কর্মীর চেয়ে দক্ষ কর্মীর মজুরি তিনগুণ বেশি। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয়, ইউরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সম্ভব।

জনসংখ্যা ও সাধারণ শিক্ষায় বেকারত্বের সমস্যা থেকে উত্তরণে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত জনশক্তি রপ্তানির বিকল্প নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা যা আছে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে, ক্রমহ্রাসমান নিয়মে কমিয়ে আনতে এখন থেকে জোরেশোরে উদ্যোগ নিতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কর্মীবাহিনীতে রূপ দিয়ে দেশ-বিদেশে কর্মের সুযোগ করে দিতে পারলেই জনসংখ্যা অভিশাপ না হয়ে আশীর্বাদে পরিণত হবে।

জনসংখ্যাকে কোনো দেশের জীবন্ত সম্পদ বলা হয়। এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অনেক দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে পুঁজি করে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার একটা রীতি দেশে দেশে চালু আছে। যে দেশ এ কাজটি সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে সে দেশ তত দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। জনসংখ্যা তত্ত্বে ন্যূনতম নির্ভরশীলতার অনুপাত আছে। যখন কোনো দেশ এই ন্যূনতম নির্ভরতার অনুপাতে চলে যায় তখন ঐ দেশটির জনসংখ্যাতে কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ সবচাইতে বেশি থাকে। এই কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কাজে লাগানোর উপায় হলো তাদেরকে ডিপ্লোমা শিক্ষা ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে তোলা।

বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মান নিম্ন, শ্রমশক্তির দক্ষতা কম, ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতাও কম। বাংলাদেশে মাথাপিছু শ্রমশক্তির অবদান ইউএস ডলারে শিল্প ক্ষেত্রে ১১১, ভারতে ১৮৩, ইন্দোনেশিয়ায় ৫৯৬, মালয়েশিয়ায় ২,৬৬১, অস্ট্রেলিয়ায় ৮,০৪৯ এবং জাপানে ১০,৭৯৪। সেই হিসেবে বাংলাদেশে মাথাপিছু শ্রমশক্তির অবদান ইন্দোনেশিয়ার তুলনায়

www.pathagar.com

১৯%, মালয়েশিয়ার তুলনায় ১.৪% এবং অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের তুলনায় ১% ভাগ মাত্র।

শ্রমশক্তির কম দক্ষতা, কম উৎপাদনশীলতার ফাঁদ থেকে বাংলাদেশকে বের হতে হলে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারের কথা চিন্তা করে চাকরিদাতা ও সরকারের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগের অংশগ্রহণে পেশা ও জবের কি দাবি তা অব্যাহতভাবে যোগান দেয়ার জন্য অবশ্যই একটা আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সাথে সাথে এর সাথে মিল রেখে শিক্ষা কর্মসূচি, বিশেষ করে ডিপ্লোমা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার করে যথাযথ কারিকুলাম তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে। সামগ্রিক এই অবস্থায় ডিপ্লোমা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সরকার, শিল্পকারখানার মালিকসহ বেসরকারি উদ্যোগ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রেখে ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণ, কেরিয়ার প্লান গঠন, ব্যবস্থাপকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নে একটি একক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারবে। তাহলেই জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক ভালো—এই নীতিবাক্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে সক্ষম হবে দেশের দুশ্চিন্তার অধিক জনসংখ্যা।

দৈনিক সংবাদ : ১১ জুলাই ২০১৪

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা চ্যালেঞ্জ

রণবীর আলেকজান্ডার বাংলা আক্রমণ করে তার সেনাপতি সেলুকাসকে বলেছিলেন, কি সেলুকাস বাংলাদেশ! সত্যিই অনেক বৈচিত্র্যে ভরপুর সোনার বাংলা। পৃথিবী নামক গ্রহে স্বাধীন/ পরাধীন অর্ধসহস্রের বেশি দেশ আছে। আয়তন , লোকসংখ্যা, সম্পদে বাংলাদেশ থেকে বেশি হলেও বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে বাংলাদেশের ভূগোল, তার ভূ-অর্থনৈতিক ও ভূ-কৌশলগত অবস্থান। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। আমাদের ছোট্ট ভূখণ্ড তিন দিকেই প্রতিবেশী ভারত-বেষ্টিত। চার হাজার ৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারতের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত। দেশের মোট আয়তনের বিপরীতে মাত্র একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে এত দীর্ঘ সীমান্তের দেশ পৃথিবীতে বিরল। প্রতিবেশী মিয়ানমারের সঙ্গে ১৯৭ কিলোমিটার স্থল সীমানায় ভারত মিয়ানমার সংলগ্ন রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি বান্দরবান তিন পার্বত্য জেলা। দক্ষিণ-পূর্বে ৬২ হাজার বর্গমাইল বঙ্গোপসাগর। মিয়ানমারের দিক থেকে বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সীমানার মধ্যে যে অফুরন্ত খনিজ, মৎস্য ও তেল-গ্যাসের মতো সম্পদ রয়েছে তার পরিপূর্ণ ব্যবহার বাংলাদেশের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় সোপান হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু তার নিরাপদ আহরণ ও ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বহুগুণে বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বাংলার ধন-সম্পদ সুদর্শনী নারীদের প্রতি বিদেশি হায়নাদের কুদৃষ্টি পড়ে। হায়েনারা কখনো বাণিজ্যিক সমরশক্তি প্রকাশ, বন্ধু বেশে, ধর্ম প্রচার , সেবাদান, সাহায্য আবরণের আড়ালে আগমন ঘটায় এ দেশে। ইংরেজরা ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের প্রায় ২০০ বছর শাসন করেছে, শোষণও করেছে। ইংরেজরা ছাড়াও ইউরোপীয় অনেক জাতির মানুষ এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশে এসেছে। আড়াইশো বছর আগে

www.pathagar.com

পর্তুগিজরাও ইংরেজ ও ফরাসিদের মতো এ ভূখণ্ডটি তারা নিজ অধিকারে নিয়েছিল। বাণিজ্য জাহাজ লুট করেছে। নারী-পুরুষদের বন্দি করে নিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে অন্যায়ভাবে নিজেরা সম্পদশালী হয়েছে।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট অনেক ত্যাগ, জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে ইংরেজদের বিতাড়িত করে এক প্রান্তে পূর্ব অন্যপ্রান্তে পশ্চিম মাঝখানে ১৪ শত মাইল ব্যবধানে পাকিস্তান নামক এক হাস্যকর রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পরই এ দেশের মানুষ ভোগ করতে থাকল খানদের ঔপনিবেশিক শাসন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় নিরস্ত্র একটি জনগোষ্ঠী অসামান্য মনোবল ও মুক্তির দুর্মর আকাঙ্ক্ষাকে বুকে ধারণ করে দুর্ধর্ষ পাকিস্তানি বাহিনীকে করেছিল পরাস্ত। সীমান্তের ওপারে উদ্বাস্তু শিবিরে লাখ লাখ অসহায় নর-নারীর অনিশ্চিত জীবন, অবরুদ্ধ স্বদেশে কোটি কোটি বিপন্ন মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই সৃষ্টি করেছিল বেদনা ও বিষাদের মহাকাব্য। কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, কামার কুমার, জেলে, ছাত্র, তরুণসহ অগণিত সাধারণ মানুষের অপরিসীম বীরত্ব ত্যাগেই মুক্তিযুদ্ধকে সফল করে বাংলাদেশ স্বাধীন করে।

এরপর শুরু হয় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে ষড়যন্ত্র। একদিকে সীমান্ত হত্যা, পার্বত্য তিন জেলা আদিবাসীদের দিয়ে বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন উসকে দেয়। অন্য দিকে শুরু হয় দক্ষিণ এশিয়ায় সমরাস্ত্রের প্রতিযোগিতা। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়ার পর চতুর্থ ভারত। ভারত পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি-৫ এর সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। এ ক্ষেপণাস্ত্র চীনের মধ্যাঞ্চল এবং ইউরোপে আঘাত হানতে সক্ষম। এ বছর প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ দিয়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার কোটি রুপি, যা গত বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। ভারত ইতোমধ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারকে পরিণত হয়েছে।

ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিবিদ টেসি টমাস ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার (ডিআরডিও) অগ্নি-৫ নিয়ে প্রযুক্তিগত মূল কাজটি করেন। ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন, বিশ্বে যে কজন নারী তাঁদেরই একজন টেসি। কেরালায় স্কুল কলেজের পাট চুকিয়ে ২০ বছর বয়সে তিনি নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের উপর পড়াশুনা করতে যান পশ্চিমাঞ্চলীয় নগর পুনেতে। সেখান থেকে স্নাতকোত্তর পাঠ শেষ করে তিনি ১৯৮৮ সালে ডিআরডিওতে যোগ দেন। সেই থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে তাঁর কাজ শুরু। গত জানুয়ারিতে ভারতের

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে টেসি সম্পর্কে বলেছিলেন, ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রথাগত বলয়ে টেসি টমাস একটি দৃষ্টান্ত। প্রধানমন্ত্রীর সেই মন্তব্য সার্থক হয়েছে টেসির হাত দিয়ে অগ্নি-৫ এর সফল আবির্ভাবে। এরপর উপগ্রহ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে মনোযোগী হয়েছে ভারত।

বাংলার সার্বভৌমত্ব ধরে রাখতে চাইলে একবিংশ শতকের যুগোপযোগী একটি সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এ দেশ মাটি মানুষ ও একটি পতাকার জন্য জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় জেলে কাটিয়েছেন। বার বার ফাঁসির রশির নিকটবর্তী হয়েছেন। ১৩ বছর বয়সে পুলিশী হস্তক্ষেপে বিক্ষুব্ধ, ১৮ বছর বয়সে ৭ দিনের জেল খাটা শেখ মজিব। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হন। এ ঘটনা কেবল বাঙালির ইতিহাসে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ঘটনাচক্রে সেই সময় জাতির জনকের দু. কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকাতে সেই যাত্রা জীবন রক্ষা পান। ফারুক রশিদের অনুসরণ করে কখনো বন্দুকের নল, কখনো গ্রেনেড, কখনো বিষ প্রয়োগে বারবার হত্যার চেষ্টা করে। বহু শতাব্দীব্যাপি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে বাঙালি জাতিকে তিনি মুক্ত স্বাধীন হতে শিখিয়েছেন। বিশ্বে বাঙালির স্বকীয় পরিচয় তুলে ধরেছেন। বাঙালির মাতৃভূমিকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের নাম ও ভৌগোলিক সীমারেখা এঁকে দিয়েছেন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু। যতদিন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা প্রবহমান থাকবে ততদিন তাঁর এই গৌরবের পরিচয়ও বিধৃত থাকবে। এই দেশের প্রতিটি ইঞ্চি ভূমিতে বঙ্গবন্ধু পরিবারের অবদান, রক্তদান একাকার হয়ে আছে। বঙ্গ পরিবারের উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অনেক বেশি মনোযোগী—এটাই স্বাভাবিক।

স্বাধীনতার পর প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছিল। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া সেনাসদস্যদের নিয়ে সেনাবাহিনীর তিনটি ব্রিগেড গড়ে তোলা হয়েছিল। ট্যাঙ্ক, কামান, ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না।

www.pathagar.com

নৌ ও বিমানবাহিনীর ছিল আরও দৈন্যদশা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাগার থেকে দেশের মাটিতে পা রেখে সর্বপ্রথম ভারতীয় বাহিনীকে বাংলার মাটি ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করেন। গঠন করেন সেনা, নৌ, বিমানবাহিনী। মিশর সরকারের দেয়া ৩০টি ট্যাঙ্ক টি-৫৪ সাঁজোয়া কোরে হস্তান্তর করেন। জাতির পিতা বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল, প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। নৌবাহিনীর জন্য দুটি জাহাজ সংগ্রহ করেন। বিমানবাহিনীর জন্য সুপারসনিক মিগ-২১ হেলিকপ্টার, রাডারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে ইতোপূর্বে শেখ হাসিনা প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে কোরিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক ফ্রিগেট এবং রাশিয়া থেকে বিমানবাহিনীর জন্য মিগ ক্রয় করেন।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, ওয়ার কলেজ, এমআইএসটি ও আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মতো কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস। এসব প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শুধু সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারাই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন না, প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বেসামরিক কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরাও।

আমরা গত বছর উপলব্ধি করতে পারছি ভিশন ২০২১ মানে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সামরিক বাহিনীকে এনালগ পরিত্যাগ করে ডিজিটাল করা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে নিজস্ব অর্থায়নে কেনা চতুর্থ প্রজন্মের ট্যাঙ্ক এমবিটি-২০০০। অত্যাধুনিক এই ট্যাঙ্ক অন্তর্ভুক্তির ফলে সাঁজোয়া কোরের সামর্থ্য আরো বাড়ল। অত্যাধুনিক এই ট্যাঙ্ক থেকে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে গোলা নিক্ষেপ করা যায়। এর কামানে ১২৫ মিলিমিটার ব্যাসের গোলা ব্যবহার করা যাবে। এ ছাড়া ৭ দশমিক ৬২ মিলিমিটার ব্যাসের গুলি ছোড়ার জন্য একটি এবং ১২ দশমিক ৭ মিলিমিটার গুলির জন্য আরেকটি মেশিনগান রয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়াতে ১০ বছরব্যাপি একটি পরিকল্পনার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের মধ্যে নৌবাহিনীর বহরে সাবমেরিন যুক্ত হতে পারে। এতে খরচ হবে ১০০ কোটি ডলার। সাবমেরিনের উপযোগী কর্মকর্তা তৈরি করতে অনেক সময় লাগে।

এ কারণে এখন থেকে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এজন্য নৌবাহিনীর পাঁচজন কর্মকর্তাকে সাবমেরিন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য তুরস্কের গোল চুক নৌঘাঁটিতে পাঠানো হয়েছে।

www.pathagar.com

মহাভারতের পাণ্ডবদের রণনীতি, পিথাগোরাসের জ্যামিতি, অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা, আল জাবেরের অ্যালজেবরা, নিউটনের গতিসূত্র, ভিঞ্চির সংকেতবিদ্যা, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সূত্র সবকিছুর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে যেসব রণতরী জল, স্থল, আকাশ—সবই কাঁপাতে পারে অত্যাধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম এসবের নিবিড় প্রশিক্ষণ চলছে। সাবমেরিন (ডুবো যুদ্ধজাহাজ) ঘাঁটি তৈরি করা হচ্ছে কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলায়। কুতুবদিয়া চ্যানেলকে ঘিরে এ পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এজন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের কাছে প্রায় ৪২০ একর জমি বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। সাবমেরিন কেনা হলে নৌবাহিনী চতুর্মাত্রিক বাহিনীতে পরিণত হবে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীর সমরাস্ত্রের তালিকায় রয়েছে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মিসাইল মেতিস এম-১ ও করনেট ই সাঁজোয়া যান বিটি আর ৮০ ও বিটি আর ৮০-তে, স্বয়ংক্রিয় গ্রেনেড লাঞ্চার এজিএস ৩০ নৌপথে সাঁজোয়া যান ও ট্যাঙ্ক পারাপারের উপযোগী পিপি ৯১ পন্টুন ও ট্যাঙ্কের মাধ্যমে পরিচালিত এমটিইউ-৯০ সেতু। বিমানবাহিনীর কেনাকাটার তালিকায় রয়েছে ইয়াক-১৩০ প্রশিক্ষণ জঙ্গি বিমান, সাবমেরিন পণ্য পরিবহন উপযোগী এমআই ১৭১ এসএইচ হেলিকপ্টার, গাম-ডিই/গামা-সি-১ রাডার ও কাস্তা-২ই২ রাডার।

একটি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা বহিঃনিরাপত্তার থেকে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কার্যক্রম বহুগুণ বেশি। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীকে আরো আধুনিক, জনবান্ধব করতে শেখ হাসিনা সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। পুলিশের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির জন্য কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা যায় তা নিয়েও গবেষণা চলছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়া সফরের সময় সে দেশের রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রদেয় ঋণে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অস্ত্র ক্রয়ে চুক্তি করেছেন, যা দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ অস্ত্র ক্রয় চুক্তি।

স্বাধীনতার পর থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী পাঁচ দশকে পড়েছে। উপমহাদেশের প্রধান দেশগুলোর সামরিক বাহিনী উপনিবেশবাদের ধারাবাহিকতায় জন্ম নিয়েছিল। পৃথিবীর স্বল্পসংখ্যক দেশের সামরিক বাহিনীর জন্ম জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। একে বলা যায় 'আমর্ড ফোর্সেস অব লিবারেশন'। বাংলাদেশ এই গৌরবের অধিকারী। কেবল '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে নয়, বিগত ৪২ বছরে যখনই এ জাতি

www.pathagar.com

সংকটে নিপতিত হয়েছে তখনই আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্রবাহিনী দেশ ও জাতির সম্ভ্রম রক্ষায় জীবনবাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের এই সশস্ত্রবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তি দমনে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গতের সেবায় অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করে দেশের সকল স্তরের জনগণের গভীর আস্থা ও অকুণ্ঠ ভালোবাসা কুড়িয়েছে।

বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও পুলিশ প্রায় দুই দশক যাবত বিশ্বজুড়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে এ কার্যক্রমে সর্বোচ্চ অবদান রাখা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। পেশাদারিত্ব, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সাহসিকতার কারণে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামরিক বাহিনীর এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সারা বিশ্বে বাংলাদেশেই একমাত্র প্রতিরক্ষা ব্যয় সর্বনিম্ন, যা জিডিপির মাত্র ১ দশমিক এবং সমগ্র জাতীয় বাজেটের মাত্র ৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ পৃথিবীর সপ্তম জনবহুল দেশ। এই দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা, প্রশিক্ষণ মান ও সমরাস্ত্র ৮ম জনবহুল দেশ রাশিয়ার উপরে উন্নতি ঘটাতে হবে। বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করে হাইভিশন বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব নয়। ভিশন ২০২১-তে সংযুক্ত করতে হবে বাংলাদেশ অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে। এই দেশের ডিপ্লোমা ইন আর্মস টেকনোলজিস্টরা উন্নত বিশ্বের সকল অস্ত্র কারখানায় উচ্চ বেতনে চাকরি করবে। আমরা শিক্ষা নিতে পারি এশিয়ার অন্যতম দেশ ইরান থেকে। ডিপ্লোমা ইন ল্যান্ড, মেরিন, এয়ার আর্মস ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি কোর্স চালু করে ব্যাপকহারে অস্ত্র কারখানা তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা সময়ের দাবি।

বাংলাদেশ সময় : ১৭ এপ্রিল ২০১৩

www.pathagar.com

ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালকরণে প্রতিবন্ধকতা

মাটির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর আবর্তন ভূমিকেন্দ্রিক। ফল, ফসল থেকে শুরু করে সব ধরনের খাদ্যপণ্য এবং উৎপাদনকর্ম এই ভূমিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। অনেকেই ভূমিকে মায়ের সাথে তুলনা করে থাকেন। ভূমির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহায়তা ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি মালিকানা একটা বড় জটিল সমস্যা। ভূমি মালিকানাকে ত্রুটিহীন করতে নানা সময়ে নানা উদ্যোগ নেয়া হলেও তা সহজ করা হয়নি। বরং কোনো কোনো সময় সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর করে তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশে মোট কৃষি জমির পরিমাণ কত, বনাঞ্চল কত, নদী সিকস্তির জরিপ কোনোটাই আধুনিক নিয়মে হয়নি। দেশের সবচেয়ে বেশি অনিয়ম দুর্নীতি, দাঙ্গা-ফাসাদ, মামলা-মোকদ্দমা ঘটে ভূমি সেক্টরে। এ সেক্টরে মানুষে মানুষে বিরোধ অনেক বেশি, মামলা রেকর্ডসংখ্যক। ভূমির ব্যবহারে চরম বিশৃঙ্খলা, স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। কৃষি জমিতে নির্মিত হচ্ছে শিল্প-কারখানা, গড়ে উঠছে আবাসন, জলাভূমি ভরাট করে ফেলা হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, বন উজাড় করে স্থাপন করা হচ্ছে পোল্ট্রি খামার কিংবা বসানো হচ্ছে করাতকল, পাহাড় কেটে গড়ে তোলা হচ্ছে ইটভাটা।

ঔপনিবেশিক আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনা এ দেশে সাধারণ মানুষকে ক্রমেই মানবেতর জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনাবসানের পর থেকে এখনো সে ব্যবস্থার প্রতিফলন চলতে থাকে। আওয়ামী লীগ গেল নির্বাচনী ইশতেহারে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ও ভূমিহীন কৃষকদের খাস জমি বন্দোবস্ত দেয়ার কথা উল্লেখ ছিল। ভূমি ব্যবস্থাপনা উন্নত করার কথা ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতি প্রকল্প অঙ্কুরেই বিনাশ হয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনায় তিনটি প্রশাসন কাজ করে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস) ভূমি জরিপের দায়িত্ব পালন করে এবং ভূমির স্বত্বলিপি বা রেকর্ড প্রণয়ন করে। মাঠপর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার থেকে শুরু করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেকর্ড হালনাগাদ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভূমি রাজস্ব আদায় করেন। আর মাঠপর্যায়ে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীন সাব-রেজিস্ট্রাররা করেন ভূমি রেজিস্ট্রেশন কাজ। 'বাংলাদেশ ভূমি প্রশাসন সংস্কার' প্রকল্পের প্রস্তাবে বলা হয়েছে রেকর্ডের এ ত্রিমুখী উৎস একটি বড় ধরনের ত্রুটি।

সনাতন পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের কাজ সময় সাপেক্ষ ও জটিল ব্যাপার। বাংলাদেশে প্রথম ভূমি জরিপ কাজ সম্পন্ন করতে সময় লেগেছিল ৫৪ বছর। ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে বা সিএস রেকর্ড নামে পরিচিত। সেই জরিপ ১৮৮৭ সালে শুরু হয়ে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চলে। পরিবর্তিতে জমিদারি প্রথা বাতিলের পর ১৯৫৫ সালে স্টেট একুইজিশনের আওতায় নতুন কার্যক্রম শুরু হয়। এসএ রেকর্ড নামে পরিচিত সে জরিপ সরেজমিনে করা হয়নি। জমিদারদের আওতাধীন প্রজা বা মালিকদের নামে মালিকানা স্বত্ব এবং খাসজমির তালিকা প্রস্তুত করাই ছিল সেই জরিপের উদ্দেশ্য। সেই এসএ রেকর্ড প্রণয়নের কাজ শেষ করতে ৭ বছর লেগে যায়। স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত দেশে সময়সাপেক্ষ ও জটিল সনাতনী পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ পরিচালিত হচ্ছে।

ব্যবস্থাপনার প্রথাগত পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রপাতি (জিপিএস-গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, ইটিএস-ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন, ডেটা রেকর্ডার) ইত্যাদি ব্যবহার করে ভূমির জরিপ, আগের পরিবারভিত্তিক খতিয়ানের পরিবর্তে প্লটভিত্তিক খতিয়ান প্রণয়ন এবং এগুলোর ডিজিটাল সংরক্ষণই ডিজিটালকরণ ব্যবস্থার পূর্বশত। এই শর্ত পূরণে প্রাথমিকভাবে নরসিংদী সদর, যশোরের মনিরামপুর এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় ডিজিটাল জরিপের প্রকল্প চালুকরণের লক্ষ্যে ৬৮টি ইটিএস, নয়টি ওয়ার্ক স্টেশন, ২৮টি ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যার, তিনটি লেজার প্রিন্টার, দুটি ডিজেল জেনারেটরসহ বিভিন্ন আসবাব কেনা হয়েছে। কিন্তু দক্ষ লোকবল, প্রশিক্ষণ ও নানা জটিলতায় যন্ত্রগুলোর বেশিরভাগই অব্যবহৃত থাকছে।

ভূমি কর আদায়ে সহকারী ও উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের বেতনক্রম ১৭তম গ্রেড থেকে ১১তম ও ১২তম গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে। কয়েক হাজার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া মামলাজনিত স্থগিতাদেশ

www.pathagar.com

রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক করা হয়েছে। অথচ প্রয়োজন ছিল এ বিষয়ে ডিপ্লোমা। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার), উপজেলা ভূমি অফিস জারিকারক, নামজারি সহকারী, সার্ভেয়ার, কানুনগো সকলের মধ্যমণি হিসেবে কাজ করেন এসিল্যান্ড বা সহকারী ভূমি কমিশনার। তিনি ভূমি সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত কোনো কর্মকর্তা নন।

দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এ প্রশাসন প্রক্রিয়া নিয়ে সরকারের সকল মহল প্রকাশ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে থাকেন। সাধারণ মানুষ জমির নকশা ও মালিকানার প্রামাণ্য কাগজ যাতে সহজে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ম্যানুয়ালি এই কাজ করার বদলে একে ডিজিটাল করা, ভূমির ম্যাপ, পরচা ইত্যাদি সেবা পিপিপি মডেলে তৈরি করা সময়ের দাবি।

দুর্ভাগ্যজনক যে, বর্তমান সরকার ভূমি হস্তান্তর নিবন্ধন পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নিলেও এর বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। দেশের সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলো এ কার্যক্রমের আওতায় এনে সব ধরনের নিবন্ধন ফরম, জমির ধরন অনুযায়ী নিবন্ধক খরচ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য নিবন্ধন বিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হলে সাধারণ মানুষকে আর দলিল লেখক, নকলনবিশ বা দালালদের ওপর নির্ভর করতে হতো না।

সারা দেশে ৪৭৬টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রি মহাফেজখানায় কর্মরত প্রায় বিশ হাজার নকলনবিশ চাকরিতে কর্মরত আছেন। উদ্বেগের বিষয় হলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় নিবন্ধন কর্মকর্তা কর্মচারী, নকলনবিশ, দলিল লেখক ও স্ট্যাম্প ভেন্ডাররা ডিজিটালাইজেশনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার তিন দিক দিয়ে সীমানা জালে আবদ্ধ। স্বাধীনতার চার দশক পেরিয়ে গেলেও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জরিপ থেকে সীমানা নির্ধারণী কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

১৯১ কোটি টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশের ডিজিটাল মানচিত্র জনগণের সামনে হাজির করা হয়েছে। এই মানচিত্র তৈরিতে যারা নিয়োজিত ছিল তাদের কারোই ভূমি সংক্রান্ত পূর্ব প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ভূমি নিয়ে দেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাকে অরাজকতা বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। দেশের ভূমি নিবন্ধন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং মালিকানা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আনা সম্ভব হলে সামাজিক সমস্যা অনেক কমে যাবে। ভূমি মালিকানা নিয়ে জটিলতা না থাকলে সামাজিক অস্থিরতার অবসান হবে।

www.pathagar.com

ভূমি বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত। দেশের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তি লুকিয়ে আছে ভূমিতে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশের ভূমি বিশ্বের অন্যতম উৎকৃষ্ট ভূমি। বাংলাদেশের আয়তন ১ লাখ ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে স্থলভাগ বা ভূমির আয়তন ১ লাখ ৩৩ হাজার বর্গকিলোমিটার। অবশিষ্ট ১০ হাজার ৯০ বর্গকিলোমিটার জলভাগ বা পানি। ভূমি সম্পদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আজকের বাংলাদেশের সমৃদ্ধ জনপদ। মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করছে ভূমির ওপর। কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বিকাশ পুরোপুরি ভূমির ওপর নির্ভরশীল।

অনেক কারণের মধ্যে কেবল ভূমিকে কেন্দ্র করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ এই ভূখণ্ড ২ বার স্বাধীনতা অর্জন করে। এই দেশটি স্বাধীন করতে প্রতিটি মাটির কণা রক্তে রঞ্জিত হয়, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদ নদীর প্রবাহিত রক্তের স্রোত বঙ্গোপসাগরে মিশ্রিত হয়। এই দেশের মানুষ আশা আকাঙ্ক্ষা আবেগ অনেক বেশি। ঔপনিবেশিক আমলের ভূমির ত্রিমন্ত্রণালয় ব্যবস্থা বিলুপ্তি ঘটানো প্রয়োজন। ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম আইন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা ডিজিটাল প্রক্রিয়ার অংশ। ভূমি জরিপ, দলিল লেখা, দলিল নকলনবিশ, মানচিত্র তৈরি, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, জাতীয় পর্যায়ে ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার), ভূমি রাজস্ব, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি প্রক্রিয়াকরণের কাজ পূর্ব প্রাতিষ্ঠানিক ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদদের উপর ন্যস্ত করতে হবে। তাহলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

দৈনিক ইত্তেফাক : ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

www.pathagar.com

হালকা প্রকৌশল শিল্প

একটি দেশের শিল্প খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ছাড়া কোনো দেশ উন্নত হতে পারে না। শিল্প খাতের অনেক শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে। এর মধ্যে একটি সম্ভাবনায় খাত হলো হালকা প্রকৌশল খাত। দেশের শ্রম ঘন শিল্প খাতকে এগিয়ে নিতে হালকা প্রকৌশল সম্ভাবনাময় শিল্প বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। সাম্প্রতিক চীন, তাইওয়ান ও মালয়েশিয়া আরো পূর্বে ইউরোপ ও জাপান এই হালকা প্রকৌশল শিল্পকে ভিত্তি করেই আজ সারা বিশ্বে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছে। পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ ও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলে বাংলাদেশে হালকা প্রকৌশল শিল্পের বিকাশ অবধারিত।

আমাদের দেশে হালকা প্রকৌশল শিল্প উচ্চারণ করলেই সমার্থক হিসেবে চলে আসে রাজধানীর ধোলাইখাল। শিক্ষা, প্রশিক্ষণবিহীন ও অপরিকল্পিতভাবে প্রায় ৫ হাজার কারখানা গড়ে উঠেছে এসব এলকায়। দামি গাড়ি, ফার্মাসিউটিক্যাল থেকে শুরু করে দেশিয় নৌযান, রাস্তা সংস্কারের যানবাহনের নানা রকম যন্ত্রাংশ তৈরি হচ্ছে এখানে। বগুড়ায় প্রকৌশল শিল্প কারখানায় উৎপাদিত হয় কৃষি যন্ত্রাংশ। হালকা প্রকৌশল শিল্পের মাধ্যমে পূরণ হতে পারে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল এক স্বপ্ন।

হালকা প্রকৌশল শিল্পের পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে গত অর্থবছরে ২ হাজার ২৬৩ কোটি টাকার বেশি আয় হয়। অথচ ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ওই শিল্প থেকে রপ্তানি আয় ছিল ৮৪ দশমিক ১৫ লাখ টাকা। এ খাতে রপ্তানি আয় ক্রমেই বেড়ে চলছে। কৃষিপণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, রাবার, চা-সহ আরো বিভিন্ন সামগ্রীর চেয়ে এ খাতে রপ্তানি আয় বেশি।

বর্তমানে সারা দেশে ৪০ হাজার হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতির কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় প্রায় চৌদ্দ লাখ লোক কাজ করেন। এর মধ্যে মাত্র এক হাজার ২০০ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনে নিবন্ধিত রয়েছে। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ৩ হাজার সহযোগী শিল্পে আরো ৪ লক্ষ শ্রমিক

www.pathagar.com

নিয়োজিত। ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশের এক গবেষণায় প্রকাশ পায় ৪০ হাজার হালকা প্রকৌশল শিল্পে ১৪ লক্ষ এবং ৩ হাজার সহযোগী শিল্পে ৪ লক্ষ মোট ১৮ লক্ষ শ্রমিকের কারোর ন্যূনতম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেই। তাদের কর্মে যোগদানের সময় বয়স ১২-১৬ বছর। পেটেভাতে মৌখিক চুক্তিভিত্তিক কাজে যোগদানের সূচনা হয়। শিশুশ্রমই এই শিল্পগুলোর মূল ভিত্তি। প্রতি বছর ছোট বড় মাঝারি প্রায় ৭ হাজার দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় নিহত আহতদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান নেই। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের কোনো নীতিমালা এই শিল্পে অনুসরণ করা হয় না।

বাংলাদেশে হালকা প্রকৌশল খাতে ৩১৭টি পণ্য উৎপাদন করা হয়। চীনে হালকা প্রকৌশল শিল্পে ৬৭১২টি, জাপানে ৫৩০০, ভারতে ৪৯১৮টি ব্র্যান্ডের পণ্য উৎপাদন করে। চীনে ৩০০০ হাজারের বেশি, জাপান ২১৮৮ এবং ভারতে ২০০৪টি পণ্যভিত্তিক ট্রেডে ডিপ্লোমাধারী হালকা প্রকৌশল শিল্প পরিচালনা করেছে। তাদের মাসিক বেতন ৮০০ থেকে তিন হাজার ডলার পর্যন্ত। শিশুশ্রমিক যোগদানের কোনো সুযোগ নেই। ভারত ও পাকিস্তানে টাইম বাউন্ড ভিশন ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ অনুরূপ পরিকল্পনা এখনো গ্রহণ করা হয়নি। প্রকৌশল শিল্পের বিশ্ববাজারের অবয়ব অন্তত ৬ ট্রিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক বাজারে এ খাতের পণ্যের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। অভ্যন্তরীণ চাহিদা অনুযায়ী দেশে পর্যাপ্ত উৎপাদন এখনও হচ্ছে না। এ খাতে দেশের বার্ষিক চাহিদা ৬ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার। ২ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের চাহিদা স্থানীয় বাজার থেকে মেটানো গেলেও বাকিটা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

সরকারি উদ্যোগে পণ্যভিত্তিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে অল্পদিনের মধ্যেই মেটানো সম্ভব এ খাতের চাহিদা। পাশাপাশি রপ্তানি আয়ও অনেক গুণ বেড়ে যেতে পারত। ভবিষ্যতে বড় বিপর্যয় এড়াতে সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থেই হালকা প্রকৌশল খাতের বিকাশ প্রয়োজন। হালকা প্রকৌশল শিল্পে শেয়ার বাজার থেকে মূলধন স্থানান্তরিত করা গেলে জাপান থাইল্যান্ডের মতো শিল্প বিপ্লব ঘটবে এ ভূখণ্ডে।

বর্তমান সমাজের বস্তুগত সম্পদ দিনে দিনে মেধাসম্পদে পরিণত হচ্ছে এবং অর্থনীতি হচ্ছে মেধাসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। ভিশন ২০২১ বাস্তবে পরিণত করতে হলে, হালকা প্রকৌশল শিল্পে এশিয়ার তিন শিল্প সমৃদ্ধ দেশ চীন, জাপান, ভারতকে অনুসরণ করতে হবে। মানবতাবিরোধী শিশুশ্রমের

www.pathagar.com

বিকল্প মেধাশ্রমের গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আইএলও'র নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি শিল্পে ডিপ্লোমাধারী কর্মী নিয়োগের পরিবিধান জারি করতে হবে। রাজধানী ও বিভাগীয় শহর থেকে এই শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ করে উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রামে স্থানান্তরিত করতে হবে। শিল্প ও পণ্যভিত্তিক ২-৩ হাজার বিষয়ে কর্মবান্ধব শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও ডিপ্লোমা কোর্স চালু করতে হবে। প্রস্তাবিত বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড এ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারে।

দৈনিক সংবাদ : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

www.pathagar.com

ড্রাইভিং-এর সূর্যোদয়

যখন দেশে কোনো চাঞ্চল্যকর সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে, যার সঙ্গে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বা একই পরিবারের সদস্যের মৃত্যু জড়িত থাকে, চাঞ্চল্যের মাত্রা সাপেক্ষে কর্তাব্যক্তিরা নড়েচড়ে বসেন এবং তাদের ওপর এতসংক্রান্ত অর্পিত দায়িত্ব দায়সারাভাবে সম্পন্ন করে দায়মুক্তির তৃপ্তি খোঁজেন। তারপর যথারীতি সড়ক পরিবহনের ধারা আগের মতোই চলতে থাকে এবং আরেকটি দুর্ঘটনার আগে এ দেশে একটি জোড়াতালি দেয়া সড়কব্যবস্থা নিয়ে কারো জন্য টনক নড়ে না। তারপর আবার কিছুদিনের জন্য বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ-দুঃখ, বক্তৃতা-বিবৃতি, তদন্ত, প্রতীকী এবং লোক দেখানো শাস্তি। আবার সেই সাক্ষাৎ যমদূত চালকদের কিছু লঘুদণ্ডের পর চালকের আসনে প্রত্যাবর্তন।

এক জরিপে জানা যায়, দুর্ঘটনার জন্য প্রায় ৯৯ ভাগ চালক নিজেই দায়ী। এক্ষেত্রে জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সের সহজপ্রাপ্যতাও একটি কারণ। জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী চালক অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রধারী সন্ত্রাসীর চেয়ে কোনো অংশেই কম মারাত্মক ও ঝুঁকিপূর্ণ নয়, বরং অনেক বেশি।

বাংলাদেশে লাইসেন্স পাওয়া পেশাদার চালক বর্তমানে সাড়ে ছয় লাখ। এদের অধিকাংশই শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত, প্রশিক্ষণহীন, নিজের বা অন্যদের জীবনের মূল্য বোঝার ক্ষমতা বিবর্জিত একধরনের মূঢ় মানুষ। যারা সচেতন ভাবে নয়, অবোধ ও হিতাহিতবোধশূন্যতার কারণেই ওই দুর্ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ মানুষকে সচেতন করে চারপাশ সমন্ধে সজাগ ও অবহিত করে। জীবন পৃথিবী, পারিপার্শ্ব বা জীবনের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে উচ্চতর মানবিক বোধের জন্ম দেয়। ফলে নিজের জীবনের মূল্য, অর্থ বা গুরুত্ব সে আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারে। তাই অন্যের জীবনের দাম বা ক্ষতির বেদনাও তার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ফলে সে তখন শুধু গাড়ি চালায় না, পাশাপাশি মানুষকে রক্ষাও করে, ব্যবসায় ব্যর্থ হলে তার খেসারত দিতে হয় দেউলিয়া

www.pathagar.com

বা কপর্দকশূন্য হয়ে। কিন্তু যদি গাড়ি চালাতে গিয়ে মুহূর্তের ভুলে তার ক্ষতি হয় খুবই নির্মম, এই চালক যদি বাসের বা ট্রাকের হয়, তবে কেবল নিজের নয়, এক মুহূর্তে সে বহু মানুষের রক্তাক্ত মৃত্যু ঘটাতে পারে।

উন্নত দেশগুলো কাউকে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়ার ব্যাপারে খুবই হুঁশিয়ার। লাইসেন্স দেয়ার আগে দেখে নেয়া হয় তিনি একজন শিক্ষিত বা সচেতন মানুষ কি না, ড্রাইভিংয়ের জটিল নিয়মকানুন বোঝার, আত্মস্থ করার বা মুহূর্তের দরকারে প্রয়োগ করার মতো ক্ষিপ্র মেধা আছে কি না, চারপাশে মানুষ পৃথিবী ও পরিবেশ সম্বন্ধে তিনি সজাগ বা মানবিকবোধে জাগ্রত কি না। একজন নির্বোধ বা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মানুষকে একটা বাস ট্রাকের লাইসেন্স দেয়া আর অস্ত্র হাতে একজন দুর্বৃত্তকে খুন করার ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে কোনো লোকালয়ে ঢুকিয়ে দেয়া প্রায় একই ব্যাপার।

আমাদের দেশে গণপরিবহনে দুর্ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে যাওয়ার জন্য অপ্রশিক্ষিত চালকের হাতে চালনার দায়িত্ব চলে যাওয়াকে প্রধান কারণ হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন দেশের প্রায় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। দেশে বিদ্যমান ব্যবস্থায় চালকদের প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স দেয়ার সুযোগ সীমিত। বিদ্যমান যানবাহনের সংখ্যার বিপরীতে চালকের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। পাশাপাশি প্রতি বছর দেশে ৫০ হাজার নতুন যানবাহন রাস্তায় নামছে। কিন্তু সরকারি ও বেসরকরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে মাত্র বছরে ১০ হাজার চালকের প্রশিক্ষণ দিয়ে লাইসেন্স দেয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ প্রতি বছর ৪০ হাজার যানবাহন লাইসেন্স বা প্রশিক্ষণবিহীন চালকের হাতে চলে যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৬১ জেলা পরিষদে ১৫ দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থে অনেক সেবাধর্মী কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে চালক প্রশিক্ষণের কাজটি যুক্ত হবে। জেলা পরিষদের রাজস্ব বাজেটে আত্মকর্মসংস্থান জীবনমান উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কাজে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে।

ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশের গবেষণায় জেলা পরিষদের মাধ্যমে ১০/১৫ দিনের সংক্ষিপ্ত ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ বন্যা, সাইক্লোন, হারিকেন, সিডরের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থা মাত্র। ত্রাণে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে কর্মসংস্থান হারিয়ে ফেলে। পরবর্তীতে বেকার জীবন কাটায়। বাধাপ্রাপ্ত হয় জাতীয় উন্নয়ন। জেলা পরিষদের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণে সরকারের অর্থের হরিলুট

www.pathagar.com

হবে। অল্পবিদ্যার ভয়ংকর রূপ লাভ করবে। এতে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

দীর্ঘমেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ড্রাইভিং ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কোর্স সড়ক দুর্ঘটনা চিরতরে বন্ধ করতে পারে। এজন্য জেলা উপজেলা ইউনিয়নে সরকারি/বেসরকারি একাধিক ইনস্টিটিউট অব ড্রাইভিং ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আন্তর্জাতিকমানের ড্রাইভার তৈরির কোর্স কারিকুলাম, একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড।

দৈনিক ইত্তেফাক : ৫ মার্চ ২০১৪

www.pathagar.com

কর্মসংস্থানভিত্তিক মেধার বিকাশ

ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (WIPO)-এর অনুপ্রেরণায় বিশ্বের ১৯৪টি দেশের মতো বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। রাজনীতি খেলাধুলা শিক্ষা ব্যবসা সবক্ষেত্রেই আজ মেধার জয়জয়কার। যেসব দেশ আজকে উন্নত বিশ্বের সারিতে তাদের এ অবস্থানে আসার পেছনে অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ মেধা।

উন্নত দেশগুলো অভিবাসীদের জন্য অভিবাসন নিয়ম সহজ করে মেধাবীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। জার্মানি দক্ষ জনশক্তির জন্য ভিসার নিয়ম সহজ করে দিচ্ছে। ফ্রান্স মেধাবী গবেষকদের আকর্ষণ করার জন্য Scientist visa দিচ্ছে এবং ফ্রান্সে পড়তে যাওয়া ছাত্রদের কাজের সময় ৭ থেকে ২০ শতাংশ বাড়িয়েছে। মেধাবী ছাত্রদের জন্য অনেক বিষয় সম্পূর্ণ ইংরেজিতে করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। ব্রিটেন মেধাবী অভিবাসীদের জন্য কাজের অনুমতি তথা ওয়ার্ক পারমিট দিচ্ছে। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘদিন চিন্তাভাবনা করে এমন একটি নম্বর পদ্ধতি বের করছে যাতে শুধু দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তিই অভিবাসী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে যেটির প্রথম ধাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা থেকে শুরু করে পরবর্তী কাজের সুযোগ এবং পরিশেষে স্থায়ী অভিবাসনের সুযোগ দিচ্ছে। বাইরের মেধাবী জনশক্তি আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সিঙ্গাপুর।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা মেধাবী জনশক্তি খুঁজে বের করার জন্য উপযুক্ত নয়। বিশ্বের অনেক দেশই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলে 'Ideal Talent Catching Machines'। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তারা ব্যবহার করে চুম্বক হিসেবে, Talent-দের খুঁজে বের করার জন্য। বর্তমানে বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন মহাধুমধামে অনেক পুরস্কার ঘোষণা করে বিভিন্ন মাধ্যমের 'Talent Search' প্রতিযোগিতা

www.pathagar.com

করছে। এসব সংগঠনের 'Talent Search'-এর পদ্ধতিগুলো নিয়ে নানা রকম হাস্যকর মন্তব্য হয়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পারছে না কোনো মেধাবীকে বাইরে থেকে দেশে নিয়ে আসতে। ফলে শুধু 'ব্রেন-ড্রেন' হচ্ছে, যা একমুখী। শুধু রপ্তানি কিন্তু কোনো আমদানি নেই। ফলে আমদানি রপ্তানি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। মেধাশূন্য হয়ে যাচ্ছে দেশ। এই প্রক্রিয়া শুরু হয় আমাদের ঊষালগ্ন থেকে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাত্র দুদিন আগে ১৪ ডিসেম্বর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতায় ও নৃশংসভাবে এ জাতির স্বনামখ্যাত, প্রাজ্ঞ শতাধিক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। জাতির চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক-মুহূর্তে দেশের জ্ঞান-গুণী, প্রাজ্ঞ মনীষীদের হত্যা করার লক্ষ্য ছিল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিক্ষেপ করা। পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

কোনো জাতি সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকর্মে যতটা উন্নত, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও ততটাই সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। শিল্পোন্নত বিশ্বের উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শিল্পের বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদ সৃজন, আত্তীকরণ, সংরক্ষণ, লালন এবং তার যথাযথ ব্যবহারে ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে Knowledge Based Economy-এর মূল চালিকাশক্তিই হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনসহ তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেধাসম্পদ আহরণ, লালন ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা অবশ্যই দরকার। দেশপ্রেমী রাজনীতি ও মেধার দক্ষতা আর সততার সংযোগ না হলে একটি দেশের উন্নয়ন গতিধারা এগিয়ে নেয়া যায় না। বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্রে মেধার সংকট লক্ষণীয়। অথচ আমরা মেধাহীন জাতি নই। মূল সমস্যা মেধা বিকাশে সুযোগের অভাব। বিগত কয়েক বছরের দেশের শিক্ষার হারের অভাবনীয় বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু শিক্ষার সেই হারের সাথে মেধার বিকাশ, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটেনি। পৃথিবীতে সম্পদ সীমিত হলেও মেধাসম্পদের সম্ভাবনা ও প্রয়োগ অসীম। তাই নতুন প্রজন্ম তথা তরুণদের মাঝে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী কাজের স্পৃহা জাগিয়ে তোলা এবং মেধাসম্পদ লালন ও চর্চার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। মেধার লালন ছাড়া মেধার বিকাশ সম্ভব নয়। বিশাল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করতে হলে মেধার সঠিক লালন করতে হবে। মেধা লালনের মাধ্যমেও দারিদ্র্যবিমোচন করা সম্ভব। প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় কৃতীমান

www.pathagar.com

এক ঝাঁক তরুণ-তরুণীর আনন্দ এবং স্বপ্ন-সম্ভাবনার সঙ্গে সহজে একাত্ম হয়ে ওঠে দেশের মানুষ। কিন্তু তারুণ্যের এই স্বপ্ন-সম্ভাবনা উচ্চ শিক্ষাঙ্গন পেরিয়ে কর্মজীবনে ঢোকা পর্যন্ত কতটুকু টিকে থাকে, আর কতটা স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও হতাশায় বিলীন হয়, তার কোনো সঠিক তথ্য-পরিসংখ্যান আমাদের নেই। ১০টি শিক্ষাবোর্ড থেকে বছরে গড়ে ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। মাত্র ৭০/৮০ হাজার শিক্ষার্থী নিজেদের মেধা, অভিভাবকের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির জোরে দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। বছরে ১২/১৩ লাখ তরুণ থাকে দিকনির্দেশনাহীন। তাদের মেধা বিকাশের ব্যর্থতায় আমাদের সমাজে প্রায় প্রতিটি স্তরে তরুণদের জীবনে হতাশা, রাগ, ক্ষোভ, অসন্তোষ, অবিশ্বাস ও অস্থিরতার মতো নেতিবাচক আবেগ-অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক অস্থিরতা হতাশা দূর করে কর্মসংস্থানভিত্তিক ডিপ্লোমা শিক্ষা চালুর পদক্ষেপ হোক বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের অঙ্গীকার।

অর্থনীতি প্রতিদিন : ২৬ এপ্রিল ২০১৪

www.pathagar.com

মজুরিকাঠামো ও কর্মপরিবেশের ক্ষেত্র উন্মোচন

১ মে মহান মে ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের পবিত্রতম প্রতীক এই দিবস। আন্তর্জাতিক সংহতি ও একাত্মতা প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বলতম ঐতিহ্য ও সর্বমানবের মিলনের চেতনায় দিবসটি অনন্য। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতীক এই দিবস। এটি শ্রমিকশ্রেণির গণতান্ত্রিক অধিকার সুসংহত ও স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ১৮৮৬ সালে আজ থেকে ১২৮ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে পুলিশের গুলিতে ৮ জন শ্রমিক শহীদ হয়ে আত্মত্যাগের এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

১৮৮৯ সাল থেকে এ দিবস বিশ্বের নিপীড়িত ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্মারক হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। ২১ জুন ১৮৮৬ প্রহসনের বিচারে ৭ জন শ্রমিকনেতাকে ফাঁসির আদেশ দেয় মার্কিন আদালত। শ্রমিকনেতাদের ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে বিশ্বের সর্বত্র। এমনকি আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি পুনরায় পরীক্ষা করতে অস্বীকার করে। ফাঁসির দিন নির্ধারণ করা হয় ১৮৮৬ সালের ১১ নভেম্বর। বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে ঐদিন শ্রমিকনেতাদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। পৃথিবীর শোষক-শাসকরা সেদিন শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর শোনেনি। বরং তারা ভেবেছিলেন শ্রমিকনেতাদের এভাবে হত্যা করলে আর কখনো তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়াবে না।

১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিস নগরীতে শ্রমিকনেতারা মিলিত হন এবং প্যারিস কংগ্রেসেই গঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন। এতে শ্রমিকশ্রেণির আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রস্তাব করে যে, ১৮৯০ সালের ১ মে হতে প্রতি বছর মে দিবস শ্রমিকশ্রেণির উৎসব ও প্রতিজ্ঞা দিবস হিসেবে পালন করা হবে। দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের ফসল হিসেবে ১৯১৯ সালে আইএলও প্রতিষ্ঠা হলে ৮ ঘণ্টা কাজের সময়টি ১নং কনভেনশন হিসেবে প্রণীত ও গৃহীত হয়।

www.pathagar.com

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপি এ কনভেনশনটি অনুসমর্থিত ও আইনে প্রণীত হয়েছে। ১৯৭২ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সক্রিয় সদস্যপদ লাভ করে এবং মে দিবসকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধুর সরকার।

বিশ্বের সকল দেশেই উৎপাদনশীলতা ও অগ্রগতির চাকাকে সচল রেখেছে শ্রমিকশ্রেণি ও মেহনতি মানুষ। যুগে যুগে তারাই সভ্যতা ও সমৃদ্ধির সোপান রচনা করেছে। তাই কাজের নিশ্চয়তা বিধান, উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রাপ্তি এবং কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও আনুষঙ্গিক সুবিধা পাওয়া তাদের ন্যায্য অধিকার। মে দিবস প্রতিটি দেশে শ্রমজীবী মানুষের জন্য নতুন নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আসে। এখনো আমাদের দেশে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা নিত্য দিনের সঙ্গী। উন্নত জীবনধারণের যে প্রত্যয় মে দিবস সৃষ্টি করেছিল, তাদের জীবন উন্নতির ধরাছোয়ার বাইরে চলে গেছে। এই শোষণ-বঞ্চনা নিরসন ও ন্যায্য মজুরি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন লড়াই-সংগ্রাম। লড়াই-সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণির অতীত ও ঐতিহ্য এখন প্রায় ম্রিয়মাণ। এর জন্য দায়ী বর্তমান প্রজন্মের শ্রমিকশ্রেণির সচেতনতার অভাব। পৃথিবীর সব সভ্যতা গড়ে ওঠার ইতিহাসের মূল কারিগর হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ। অথচ সেই শ্রমিকেরা তাদের ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না। পাচ্ছে না ন্যায্য মজুরি, যা দিয়ে দুই বেলা দু'মুঠো মোটা ভাত-কাপড় জোটাতে পারে। শোষণ-বঞ্চনা এখন এক নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষিশ্রমিকদের অবস্থা ভয়াবহ। যাদের মাসিক বেতন, সময় ও নির্ধারিত মজুরি নেই। নেই অবসর কিংবা পেনশন ভাতা। জোতদার কৃষককে মজুরি কম দিলে প্রতিবাদ করার উপায় থাকে না নানা কারণে। প্রতিনিয়ত বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে দেয়া অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর কৃষিশ্রমিকদের কোনো সংগঠন নেই। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত কৃষিশ্রমিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যায় কিভাবে তারও কোনো ব্যবস্থাপনাও নেই দেশে।

শিল্পশ্রমিক যারা স্থায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত তারা ছুটিছাটা পায়, সুবিধা ও অসুবিধার কথা বলার সুযোগ পায়। কিন্তু কৃষিশ্রমিকরা হচ্ছে 'হ্যান্ড টু মাউথ'। আমাদের শিল্পক্ষেত্রে অন্যতম অহঙ্কার যে শিল্পকে ঘিরে সেই গার্মেন্টের বেলায়ও এ সত্যটি হতাশাব্যঞ্জক। ভারত চীন কোরিয়া ভিয়েতনাম শ্রীলঙ্কায় ২২ বছর বয়সের নিচে কোনো নারী শ্রমিক নিয়োগের বিধান নেই। অথচ আমাদের দেশে ৯০ শতাংশ নারী শ্রমিকের ৭০ ভাগের গড় বয়স ১৭। শিল্পশ্রমিক হিসেবে কাজে যোগদানের পূর্বে এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণের

www.pathagar.com

ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লক্ষ লোক আত্মীয়স্বজন পরিবার পরিজন ত্যাগ করে বিদেশে কর্মের মাধ্যমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। তাদের সিংহভাগই হোটেলবয়, ঝাড়ুদার, নির্মাণশ্রমিক পদে কর্মরত। বিশ্বের জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিটি দেশ বিদেশে শ্রমিক নিয়োগ নীতিমালা তৈরি করে পণ্য ও পেশাভিত্তিক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে। শিক্ষা অর্জনের কারণে তাদের শ্রমভাতা অনেক বেশি। বাংলাদেশে এখানো ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, আশ্রয়হীনতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে শ্রমজীবীদের মুক্তি মেলেনি। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা ও আইএলও'র সদস্য হওয়া সত্ত্বেও নীতিমালা অনায়াসে লঙ্ঘন করে। মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে। মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টি করে নারীদের অপেক্ষাকৃত কম মজুরি দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান, মজুরি ও কর্মপরিবেশ বাড়ানোর ক্ষেত্র উন্মোচন হোক মে দিবস পালনের যথার্থ কর্মপন্থা।

দৈনিক সংবাদ : ১ মে ২০১৪

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অনুষঙ্গ শিক্ষা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দেশ। বাংলাদেশের ৯৬ শতাংশ শিল্পই ক্ষুদ্র ও মাঝারি। আমাদের দেশের জিডিপির শতকরা ১২ ভাগ আসে শিল্প থেকে এবং এই জিডিপির শতকরা প্রায় ৬ ভাগই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান। কৃষি খাতের বাইরের খাতগুলোর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মসংস্থানই হয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে। দেশের পঁয়ত্রিশ লাখেরও বেশি শ্রমিক জড়িত আছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে। আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিপুলসংখ্যক তরুণ, যুবার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সার্বিক ভূমিকা রাখছে।

'স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ' বাংলায় 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প'। বর্তমান বিশ্বে এসএমই একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এসএমই শিল্পের বিশ্বব্যাপি স্বীকৃত কোনো একক সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সংজ্ঞায়িত করেছে। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা, প্রতিষ্ঠানের সম্পদ অথবা এই দুটির উভয়কে ভিত্তি করে এই সংজ্ঞা নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতি কৌশল ২০০৫'-এ এসএমই'র সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। ২০০৮ সালের জুন মাসে শিল্প মন্ত্রণালয়ের এসএমই সেল এ সংজ্ঞায় কিছু পরিবর্তন আনে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এই পরিবর্তন অনুসারে বাংলাদেশের কোনো শিল্পকে এসএমই হিসেবে চিহ্নিত করার সংজ্ঞাগুলো হলো।

ক. ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

০১. ক্ষুদ্র শিল্প খাত বলতে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মোট মূল্য ৫০ হাজার থেকে ১.৫ কোটি টাকা, কর্মরত জনবল অনূর্ধ্ব ৫০ জন।

www.pathagar.com

০২. মাঝারি শিল্প খাত বলতে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি ও কারখানা ভবন ছাড়া অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মোট মূল্য ১.৫ কোটি থেকে ২০ কোটি টাকা যেখানে কর্মরত জনবল সর্বোচ্চ ১৫০ জন।

খ. ট্রেডিং এবং অন্যান্য সেবা খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

০১. ট্রেডিং এবং অন্যান্য সেবা খাতে ক্ষুদ্রশিল্প বলতে যেসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি ও ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের দাম ৫০ হাজার থেকে ৫০ লাখ টাকা; জনবল অনূর্ধ্ব ২৫ জন।

০২. ট্রেডিং এবং অন্যান্য সেবা খাতে মাঝারি শিল্প, যেসব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি ও ভবন ছাড়া স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ ৫০ লাখ থেকে ১০ কোটি টাকা; জনবল সর্বোচ্চ ৫০ জন।

উন্নত দেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত। বেশি হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন করার কাজে বিভিন্ন দেশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উন্নয়নের বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছে। ইউনাইটেড নেশনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (UNIDO) বিভিন্ন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, ভারত ইত্যাদি দেশের উন্নয়নের মূলে রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান। বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে দেখা গেছে, প্রায় ১৪০ কোটি এসএমই-কারখানায় ১৩০ দেশের ৬৫ শতাংশ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ সরকার গৃহীত 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে' ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং রপ্তানি শিল্পের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ নিবিড় কর্মসংস্থানভিত্তিক শিল্পায়নের কথা বলা হয়েছে। সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন নীতিকৌশল' প্রণয়ন করে। বেসরকারি খাতকে সহায়তা দেয়া এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান বৈষম্য দূর করা, সবার জন্য সমান্তরাল ক্ষেত্র নিশ্চিত করে বিনিয়োগবান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টির নিরর্থক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হুমকির সম্মুখীন। ১৯৭১ সালে এই দেশের তরুণ সমাজ স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধ সমাপ্তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে অস্ত্র জমা দিয়ে দেশ উন্নয়নে শপথ গ্রহণ করে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে নিজের মতো গড়ে

www.pathagar.com

তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। বিজয়ের উষালগ্নে নিজ বাড়িতে এসে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনায় পৈতৃক জমি, মা-বোনের গহনা, হালের বলদ, বাবা-মায়ের পেনশনের টাকা, ব্যাংক থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প গড়ে তোলে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য গত শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপি প্রযুক্তি বিপ্লব ঘটে। শিল্প মালিকরা প্রতিটি শিল্পে প্রশিক্ষিত ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ দিয়ে শিল্পকে বিশেষায়িত করে। স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করে।

দক্ষ জনবলের অভাবে প্রযুক্তি সংযোজন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তরা ছিটকে পড়ে। 'ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল', বাংলাদেশের গবেষণায় দেখতে পায়, স্বাধীনতার পর কোনো শিল্পেই পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ দেয়া হয়নি। আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে ৮৬ হাজার ৪১২টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে ৭২ হাজার ৩০০টি রুগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করছে, বাকি ৪ হাজার ১১২টি কোমায় আক্রান্ত হয়ে কোরামিনের উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে ২ কোটি যুবক পূর্ণ বেকার এবং দেড় কোটি যুবক অর্ধ বেকার জীবন কাটাচ্ছে। ব্লেড, পেনসিল, কলম, তালা, ছাতা, মোবাইল, চশমা, চকলেট, বিস্কুট, ইলেকট্রিক ফ্যানের মতো নিম্ন প্রযুক্তিগত দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করে চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। রপ্তানিকারক দেশের পরিবর্তে আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন স্ফীত হচ্ছে। বিজয় অর্জনের পর দেশের নীতি নির্ধারকগণ জাপান, জার্মানি, ভিয়েতনাম, মালেয়েশিয়া, কোরিয়া, ইরানের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেনি।

'মিল্কম্যান অব ইন্ডিয়া' ভার্গাস কুরিন—যিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচির জনক, এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়নি। ব্রিটিশ, পাকিস্তানিদের গড়া বিচ্ছিন্ন মতাদর্শের ডিপ্লোমা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত ঘটায়নি। প্রশাসনিক বিভাগে বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করেনি। জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম যেখানে হাইস্কুল আছে তারই পার্শ্বে পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা হয়নি। এসএসসি পাস লক্ষ তরুণদের ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ করা হয়নি। দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পায়নের স্বার্থে শিল্পকে প্রতিযোগিতামূলক করে গড়ে তুলতে পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা শিক্ষা অপরিহার্য।

দৈনিক পূর্বকোণ : ৩০ নভেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

সাভার ট্র্যাজেডি : বিপর্যয় উত্তরণে যা প্রয়োজন

'মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না।' ভূপেন হাজারিকার অমর এই গানের কথা অনেকেরই জানা। গানের এই কলিটি আপন মহিমায় মূর্তিমান হয়ে উঠেছিল সাভারের 'রানা প্লাজা' ভবন ধসের ঘটনায়। গত কয়েকদিন ধরে সারা দেশের উদ্বিগ্ন মানুষের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে সাভারের ধসে পড়া এই ভবনটির ওপর। একটি ভবন যে এভাবে ধসে পড়তে পারে এটা কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। শ্বাসরুদ্ধকর উদ্ধার অভিযান চলছে। অনেকের হাতে মাইক। তারা মাইকে বলছেন, একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রয়োজন। মুহূর্তেই তা হাজির করছেন স্বেচ্ছাসেবকরা। কিছুক্ষণ পরপর ঘোষণা—ড্রিল মেশিন, হাইড্রোলিক জগ, হেলমেট, স্যালাইন পানি, খালি বস্তা, জেনারেটরের পেট্রোল, টর্চলাইট, স্ক্রু ড্রাইভার, রড কাটার, হাইড্রোলিক প্লায়ার্স, হ্যান্ড গ্লাভস, চাকু, পানি, রুটি, বিস্কুট, বালতি ইত্যাদি।

সাধারণ ছেনি, হাতুড়ি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে একেক করে জীবিত মানুষ বের করে আনে মৃত্যুপুরী থেকে, কয়েক ঘন্টার মাঝে হাজার হাজার ব্যাগ রক্ত জোগাড় হয়ে যায় আহতদের জন্য, ভেঙে পড়া ধ্বংসস্তূপের পাশে সেই স্তূপের চেয়েও বড় স্তূপ জমে যায় খাবারের। যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে ছুটে আসে প্রত্যেকে, উদ্ধারকারী জীবিত মানুষ উদ্ধারের নেশায় ভুলে যায় উদ্ধার করতে গিয়ে তার নিজের আহত পা থেকেও ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। দেশের সব দোকান খালি করে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে নিয়ে আসে উৎসাহী ব্যক্তি আহতদের অক্সিজেন দেবে বলে, হামাগুড়ি দিয়ে নড়বড়ে ধ্বংসস্তূপের নিচে ঢুকে যায় নাম না জানা তরুণ, পচাগলা লাশ পেরিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জীবনের খোঁজ করে চলে সাধারণ মানুষ, একজন শাহীনাকে বাঁচাতে ঘন্টার পর ঘন্টা সাধারণ মেশিন দিয়ে কংক্রিট কেটে চলে। ১৭তম দিনে অলৌকিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ উদ্ধার সম্ভব হয় তরুণী রেশমাকে। উদ্ধারকারীরাসহ টিভির সামনে লাখ লাখ মানুষ প্রার্থনা করে যেন সে ঠিকমতো উদ্ধার হতে পারে।

www.pathagar.com

দেশ-বিদেশের কোটি কোটি উদ্বিগ্ন মানুষকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবগত করার কাজটি করেছেন সাংবাদিকেরা। অকল্পনীয় হৃদয়বিদারক ও বীভৎস দৃশ্য তাঁরা নিজেরা অতি কাছে থেকে দেখেছেন। হাত-পা বিচ্ছিন্ন মানুষ, বিমের চাপায় চ্যাপ্টা মৃতদেহ, অন্ধকূপে সেলাই মেশিনের নিচে চাপা পড়া মানুষের আর্ত-আকুতি, এক ফোঁটা পানি ও অক্সিজেনের জন্য তাদের নিস্তেজ কণ্ঠস্বর, তাঁরা নিজের চোখে দেখেছেন ও নিজের কানে শুনেছেন।

২০০৫ সালে সংঘটিত স্পেকট্রাম ট্র্যাজেডির পর জরুরি উদ্ধার কাজ তৎপরতায় আমাদের অদক্ষতা এবং অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জামের প্রকট অভাব ধরা পড়ে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ডিসিসি ইত্যাদি প্রায় কোনো প্রতিষ্ঠানেরই যে কোনো দুর্ঘটনায় জরুরি উদ্ধার কাজ ও তৎপরতা চালানোর মতো হালকা ও ভারি সরঞ্জাম নেই। নৌপথের পরিস্থিতি আরো খারাপ। এক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল স্বেচ্ছাসেবক দলের অভাবও প্রকটভাবে চোখে পড়ে। পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজারে ভবন ধস, তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ড, দাহ্য পদার্থের গুদামে আগুন, ফিনিক্স ভবন ধসসহ একাধিক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভবন ধসে অথবা আগুনে পুড়ে অসহায় মৃত্যুবরণ করেছেন কয়েকশো আদম সন্তান। সর্বশেষ রানা প্লাজা ধসের ভয়াবহ ও ভয়ংকর ট্র্যাজেডি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ব্যাপক আকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দূরে থাক, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ঘটনাও আমরা মোকাবিলা করতে পারি না। দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা মোকাবিলায় অটুট ও অদম্য মনোবলের অভাব নেই আমাদের। অভাব শুধু অত্যাধুনিক হালকা ও ভারী যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা প্রশিক্ষণের।

গোল্ডফিশ অ্যাকুয়ারিয়ামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে যেতেই আগের স্মৃতি ভুলে যায়। 'গোল্ডফিশের এ গল্পই বোধহয় আমাদের চলমান সমাজের জন্য প্রযোজ্য হয়ে গেছে। আগের দুর্ঘটনার নির্মমতা কিছুক্ষণেই চাপা পড়ে যায়। তাজরীন কারখানায় কাজ করতে গিয়ে আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়েছে শত শত জীবন। মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ১১০টি। সেই ঘটনার পর কয়েক দিন বিষয়টি নিয়ে খুবই আলোচনা হয়েছে, সংবাদপত্রে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। তারপর নতুন ইস্যু আসার পর প্রায় সবাই ভুলে গেছে তাজরীন ট্রাজেডির কথা।

খ্রিস্টপূর্ব ২২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া প্রদেশে একটি স্ট্যাচু ভেঙে ২০ হাজার, ২৭ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের ফিদানায় মুক্তমঞ্চ ধসে ১৩ হাজার মানুষ নিহতের ইতিহাস বড় ট্র্যাজেডি হিসেবে লিপিবদ্ধ আছে। হাল আমলে

www.pathagar.com

১৯৯৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলের স্যামপুং স্টোরের ভবন ধসে নিহত হয়েছিল ৫০২ জন। আর সাভারের 'রানা প্লাজায়' এ লেখা পর্যন্ত (১০-০৫-১৩) উদ্ধার হয়েছে ১১১৫ জন হতভাগ্যের মৃতদেহ। এটি ভবন ধসে মৃতের বিশ্বরেকর্ড।

উদ্ভূত পরিস্থিতি ও বিপর্যয় হয়তো আমরা 'গোল্ডফিশের' মতোই ভুলে যাব। এরপরও বাঙালি সংস্কৃতি এবং সহজাত মমত্ববোধই আমাদের বড় ভরসা। আমরা আত্মশক্তি সংহতিবোধ ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এবং এটাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগাতে পারলে যে কোনো বিপর্যয় মোকাবিলা করা সম্ভব।

উদ্ধার কাজে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমিকা জাতিকে হতাশ করেছে। সাধারণ মানুষ যেভাবে বীরত্বগাথা মহাকাব্য রচনা করেছে, তার ছিটে-ফোঁটাও দেখাতে পারেনি এই পেশার লোকেরা। অন্যদিকে জরুরি প্রয়োজনে টর্চ লাইট, ছেনি, শাবল, করাত, অক্সিজেন সিলিন্ডারের মতো টুকিটাকি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। টিভি চ্যানেলগুলোর ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শুধু চাকরি রক্ষার খাতিরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছেন তারা। জাতির প্রতি পেশাগত কোনো কর্মদক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

অবাকের বিষয় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে কর্মরত ৫৫০৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর দেশে কিংবা বিদেশে এ সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যায় পূর্ব প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেই। বাংলাদেশে ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণভাবে বিদেশে থেকে আমদানিনির্ভর। অর্থের অভাবে নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি না করে পুরাতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধার কার্যক্রম বিঘ্ন ঘটে। দেশে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স যন্ত্রপাতি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইনস্ট্রুমেন্টমেকিং ও ম্যানটেইনেন্স প্রযুক্তিবিদ প্রশিক্ষণের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

একটি উন্নত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে হলে নিজেদের নিরাপত্তা বলয় নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ব্যবস্থাপনায় এনালগ কর্মকাণ্ড বাতিল করে ডিজিটাল করেতে হবে। এ ব্যাপারে ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ নিম্নোক্ত ৮ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছে।

১. সরকারি, আধা-সরকারি, পুলিশ, সামরিকবাহিনী, বেসরকারি, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ফায়ার সার্ভিস

www.pathagar.com

অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত টেকনোলজিস্ট নিয়োগনীতি প্রণয়ন ও নির্দেশনা প্রদান করা।

২. ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণবিহীন কর্মরত সকল চাকরিজীবীর বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করে ডিপ্লোমা ইন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিতে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের নিয়োগ নির্দেশনা প্রদান।

৩. চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ল্যান্ড ফায়ার সার্ভিস, রিভার ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স ইনস্ট্রুমেন্ট মেকিং ম্যানটেইনেন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা।

৪. সরকারি, সিটি কর্পোরেশন, বেসরকারি উদ্যোগে জেলা-উপজেলা, ইউনিয়নে একাধিক ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করা।

৫. তৃণমূলে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা নীতি সহজ ও সরলীকরণের লক্ষ্যে ব্রিটিশ পাকিস্তানিদের বিচ্ছিন্ন মতাদর্শের ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী ৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা শিক্ষা কার্যক্রম পৃথক করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক বিভাগে স্বাধীন স্বতন্ত্র ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা নির্দেশনা প্রদান করা।

৬. উন্নত বিশ্বের মতো 'বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড' প্রদত্ত ডিপ্লোমা ইন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ডিগ্রিপ্রাপ্তদের নিয়োগ এবং উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা নির্দেশনা প্রদান করা।

৭. উপজেলার বিসিক শিল্পনগরী, জেলা, বিভাগীয় ভারী শিল্পনগরী, ইপিজেড এ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ইনস্ট্রুমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ডিপ্লোমাধারীদের সহজ শর্তে প্লট বরাদ্দ ও ব্যাংক ঋণ প্রদানের নির্দেশনা।

৮. (ক) বাংলাদেশে প্রস্তুত ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স যন্ত্রপাতি অধিদপ্তর, শিল্প-কারখানা, হাসপাতালে ব্যাপক সংযোগ ঘটানো।

(খ) বাংলাদেশে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি বিদেশে রপ্তানি প্রদানে নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত দফাসমূহ বাস্তবায়ন করলে জাতি ট্র্যাজেডি উত্তরণ নির্ভাবনার প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে।

দৈনিক সংগ্রাম : ১৯ মে ২০১৩

www.pathagar.com

মানব উন্নয়ন সূচক : অগ্রগতিতে বাংলাদেশ

১৫ মার্চ শুক্রবার জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ২০১৩ সালের যে মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশ করেছে, তাতে বাংলাদেশ ১৮৭টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম হয়েছে। গড় আয়ু, স্বাক্ষরতা, শিক্ষা এবং মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে সারা বিশ্বে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ইউএনডিপি। ৬৯ দশমিক ২ বছর গড় আয়ু, জনপ্রতি ৪ দশমিক ৮ বছরে শিক্ষাগ্রহণ এবং ১ হাজার ৭৮৫ ডলার মাথাপিছু আয় নিয়ে মানব উন্নয়ন সূচকে এবারে বাংলাদেশের এই অবস্থান।

দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়নে সবচেয়ে এগিয়ে শ্রীলংকা। দেশটির বৈশ্বিক অবস্থান ৯২তম এবং উচ্চপর্যায়ভুক্ত। বাংলাদেশের সরকারি নীতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই এখন মানবসম্পদ উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে। মালদ্বীপ ও শ্রীলংকা মানবসম্পদ উন্নয়নে মধ্যশ্রেণির দেশে উন্নীত হতে পারলে অধিক জনসংখ্যার দেশ বাংলাদেশ পারবে না তা বিশ্বাস করা মুশকিল।

এবারের মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য হলো 'দক্ষিণের উত্থান : বৈচিত্র্যময় বিশ্বে মানব অগ্রগতি'। বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশ বেশ ভালো অগ্রগতি লাভ করেছে। যে কয়েকটি দেশের অগ্রগতি বেশ দ্রুত এগুলো হলো চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুরস্ক।

কিন্তু বাংলাদেশ, চিলি, ঘানা, মরিশাস, রুয়ান্ডা, থাইল্যান্ড ও তিউনিশিয়ার মতো ছোট অর্থনীতির দেশগুলোও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দ্রুততম সময়ে উন্নতি করা বিশ্বের ১৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। তারপরও প্রত্যাশিত নয়।

১৯৫০ সালে চীন, ভারত, ও ব্রাজিল মিলে বিশ্ব অর্থনীতির ১০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব করত। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি—এই ছয় সনাতনী শক্তির হিস্যা ছিল বিশ্ব অর্থনীতির অর্ধেক। অথচ আগামী ২০৫০ সালে চীন, ব্রাজিল ও ভারত বৈশ্বিক উৎপাদনের ৪০ শতাংশ জোগান দেবে বলে আশা করছে গবেষকদল। দক্ষিণের দেশগুলোর

www.pathagar.com

মধ্যে নতুন বাণিজ্য আর প্রযুক্তির অংশীদারিত্বই এই প্রসারণের মূল চালিকাশক্তি।

বাংলাদেশের উৎপত্তি পাকিস্তান নামক ব্যর্থ রাষ্ট্র থেকে। এক প্রান্তে পশ্চিম পাকিস্তান অন্য প্রান্তে পূর্ব পাকিস্তান মাঝখানে ১৪ শত মাইল ভারত। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামক এক হাস্যকর রাষ্ট্রের জন্ম দেয় জিন্নাহ। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যে পাকিস্তান হচ্ছে সবচেয়ে অনিরাপদ দেশ। পশ্চাৎপদ নারী শিক্ষানীতি, জন্ম থেকে সামরিক শাসনে জর্জরিত, জঙ্গিদের অভয়াশ্রম। মার্কিনিদের ড্রোন হামলায় সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত। কারণে অকারণে প্রতিবেশীদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পড়ন্ত বিকালে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পরাজিত সেনাপতির মুক্ত আকাশের নিচে আত্মসমর্পণের গ্লানি পৃথিবী নামক গ্রহটি যতদিন থাকবে ততদিন পাকিস্তানিদের তাড়া করবে।

প্রকৃতির নিয়মেই পরাজয় পিছনের দিকে চলে। হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানিকে ধাবিত করে। আর স্বাধীনতা ও মুক্তি সামনের দিকে পথ চলে। বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য হাজার বছরের। নিজস্ব কালচারের বর্ণছটায় আলোকিত বাঙালির ঐতিহ্য দেখে বিমোহিত পুরো বিশ্ব। একটি জাতির ঐতিহ্য এতটা সমৃদ্ধিশালী হতে পারে তা অনেকেরই মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। গত শতকের বায়ান্নতে রক্তের দামে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পর '৭১-এ মহান বিজয় ছিনিয়ে আনতে লাখ লাখ শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে দেশটির প্রতি ইঞ্চি জমি। পৃথিবীতে ভাষার জন্য যেমন কোনো জাতি রক্ত ঝরায়নি, তেমনি স্বাধীনতার বেদিমূলে ত্রিশ লাখ শহীদ এবং দু'লাখ মা বোনের সম্ভ্রম উৎসর্গের কোনো দ্বিতীয় নজিরও খুঁজে পাওয়া যাবে না। নজিরবিহীন আত্মত্যাগের দামে বিজয়ের সোনালি সূর্য ছিনিয়ে আনার অবিস্মরণীয় গৌরব, শৌর্য-বীর্য, দেশপ্রেমের দ্যুতি নিরন্তর অফুরন্ত আলোর যোগান দিয়েছে।

অথচ উন্নত বিশ্বের কথা বাদ দিলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন সূচকে অনেকটা পিছিয়ে আছে। বরাবরের মতো এবারও দক্ষিণ এশিয়ার মানবসম্পদ উন্নয়নের শীর্ষে আছে শ্রীলংকা। মালদ্বীপ, ভারত ও ভুটানের অবস্থান যথাক্রমে ১০৪, ১৩৬ ও ১৪০তম। সেখানে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুগলবন্দি হয়ে ১৪৬তম স্থানে থাকার লজ্জা পেতে হয়।

বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় মহান ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদের জীবন উৎসর্গ

www.pathagar.com

পৃথিবীর সপ্তম জনবহুল দেশ বিবেচনায় রাখতে হবে। পরিসংখ্যানে নিচের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে উপরের দিকে মনোযোগ হতে হবে। প্রথম থেকে সপ্তমের মধ্যে স্থান নির্ধারণে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ২০১৩ সালে মানবসম্পদ উন্নয়নে নরওয়ে শূন্য দশমিক ৯৫৫ স্কোর অর্জন করে ১ম স্থান দখল করেছে। ২য় অস্ট্রেলিয়া, ৩য় আমেরিকা, ৪র্থ নেদারল্যান্ডস, ৫ম জার্মানি। তাদের এই অর্জনের চালিকাশক্তি হলো মানবসম্পদ উন্নয়নের ডিপ্লোমা শিক্ষা। নরওয়ে মূল শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ৮২ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়া ৭৭ শতাংশ, নেদারল্যান্ডস ৬৮ শতাংশ, জার্মানি ৬৪ শতাংশ ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। আমেরিকা ৪৩১৭টি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে স্বদেশি বিদেশিদের অধ্যয়নের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে গুটিকয়েক বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু। মাত্র ২ শতাংশ শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগপ্রাপ্ত হয়।

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়ে থাকে। যে জাতি যত বেশি ডিপ্লোমা শিক্ষায় শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। শিক্ষাই ব্যক্তিকে উন্নতির ধারায় নিয়ে যায়। শিক্ষা ব্যক্তির দেহমনের পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে তাকে একদিকে যেমন আধুনিক ও কর্মউপযুক্ত করে তোলে অন্যদিকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে টিকে থেকে নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণের মানসিকতা তৈরি করে। শিক্ষাই ব্যক্তির ভেতরকার সত্তাকে জাগ্রত করে সৃষ্টিশীল কর্মে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

একবিংশ শতাব্দী হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। একবিংশ শতাব্দীতে ডিপ্লোমা শিক্ষাই উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। ডিপ্লোমা শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতির শিখরে উঠতে পারে না। আমরা জানি বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক দিয়ে অনেক অগ্রসর। এ অধিক জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা না গেলে কখনোই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হবে না। তা করতে গেলে আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। ডিপ্লোমা শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তাহলে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কাঙ্ক্ষিত স্থানে উপনীত হবে।

অর্থনীতি প্রতিদিন : ২৯ মে ২০১৩

www.pathagar.com

জাতীয় যুব দিবস : স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ

নভেম্বরের এক তারিখ জাতীয় যুব দিবস। গেল জাতীয় যুব দিবস জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলো থেকে ব্যতিক্রম ছিল। এই দিবসটি পালন করতে গিয়ে সরকার কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, যা ইতঃপূর্বে দেখা যায়নি। প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলায় র‍্যালি, পোস্টার, ব্যানার, আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও বেসরকারি যুব সংগঠনগুলো অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র, নিবন্ধ, টকশো আয়োজন করে থাকে। কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানী শহর ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যৌথভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনাপূর্ণ বক্তব্য অবলম্বন করে জাতীয় জীবনে এখনও ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে।

ঝাঁকজমকপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী আহাদ আলী সরকার। এতে অন্যদের মধ্যে একই মন্ত্রণালয়ের সচিব নূর মুহাম্মদ বক্তৃতা করেন। দিবসটি উপলক্ষে ১৫ জন যুব পুরুষ-মহিলাকে জাতীয় যুব দিবসের পদক দেয়া হয়। দিবসটির প্রতিপাদ্য 'প্রশিক্ষিত যুবশক্তি, বিকশিত অর্থনীতি' যথার্থ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দেশের যুবসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন একজন স্বনিয়োজিত যুবক চাকরির প্রত্যাশিত বেতনের চেয়ে মৎস্য চাষ, হর্টিকালচার, পোলট্রি, ও ডেইরি খামার করে অনেক বেশি উপার্জন করতে পারে।

এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ, দেশে ১৮ বছরের উর্ধ্ববয়সী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটি। এর মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অর্ধেক।

www.pathagar.com

কর্মক্ষম জনসংখ্যার অর্ধেকই বেকার। এ বেকারদের একটা অংশ অপরাধ জগতে নাম লিখিয়েছে এবং বড় অংশটা বেকারত্বের জ্বালা বুকে নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। তরুণ বললেই সন্ত্রাস, ড্রাগ, চাঁদাবাজি, ইভটিজিং, কলুষিত ছাত্র রাজনীতি কিংবা অবক্ষয়ই ফুটে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত। তাঁর এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে চিরায়ত সত্যেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে—'History is written by the old but made by the young'—ইতিহাস বড়দের দ্বারা লিখা হলেও নির্মাণ হয় তরুণদের হাতে। তারুণ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। একটা জাতির তরুণ সমাজের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয় ঐ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন-ভবিষ্যৎ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় অংশই এখন তরুণ। আর তরুণরাই পারে একটি দেশের অর্থনীতির গতি পরিবর্তন করতে। কোনো দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যখন স্ফীত হয়ে ওঠে তখন তাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বা বোনাস বলে। এ অবস্থাকে আবার উইন্ডোজ অব অপরচুনিটিও বলা হয়। এর মাধ্যমে কোনো দেশের উন্নয়নের সম্ভাবনাময় দুয়ার খুলে যেতে পারে। আর যদি সঠিক সময়ে তাঁদের সঠিকভাবে কাজে লাগানো না যায় তাহলে তা যে কোনো দেশের জন্য বোঝা ও মারাত্মক বিপদের কারণ হয়।

তরুণ জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত ডিপ্লোমা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করতে পারলে বিদেশে রপ্তানিসহ দেশে বিনিয়োগের পরিবেশের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজে লাগানো সম্ভব। বর্তমান চীন ও ভারতে আমাদের মতোই তরুণ যুবগোষ্ঠীর আধিক্য রয়েছে। তাদেরকে ডিপ্লোমা শিক্ষায় শিক্ষিত করে কর্মে নিয়োজিত করছে। ফলে তারা বিশ্বে অন্যতম প্রসারণ অর্থনীতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

আমাদের মেধাবী তরুণরা এ মুহূর্তে কিছুটা রাজনীতিবিমুখ হলেও তারা কর্মবিমুখ নন। দেশে-বিদেশে তারা নানামুখী প্রতিভা ও সম্ভাবনার জানান দিয়ে চলেছেন। নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ পৃথিবীকে করেছে আপনার নিকটতম। নির্মাণ করেছে সভ্যতা, বিনির্মাণ হয়েছে শ্রম এবং শিল্পের। ক্লান্তিহীন এ সংগ্রামের নেপথ্যে যে সলতেটি উস্কে দিয়েছে মেধার এ অগ্রযাত্রাকে, তার নাম ডিপ্লোমা শিক্ষা। ডিপ্লোমা শিক্ষাই শৃঙ্খলা মুক্তির একমাত্র নিয়ামক। বাংলাদেশের ডিপ্লোমা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের তুলনায় মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশ্বায়নের এ যুগে দেশে

www.pathagar.com

দেশে মানবসমাজের জীবনবোধ ও চাহিদার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তন আমরা যা দেখেছি; তাতে আদিম যুগ পর্যন্ত যেতে হয় না। বাপ-দাদাদের আমল দেখলই বিস্তর ফারাক নিজেরাই অনুধাবন করতে পারি।

বিশ্বের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুবকদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠার আহ্বানের সাথে সাথে এই দেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের পূর্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। '৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের আহ্বানে এই দেশের তরুণরা অস্ত্রহাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। শহীদের স্বপ্ন ছিল এ দেশের প্রতিটি নাগরিক মৌলিক অধিকারগুলো অর্জন করবে। তরুণদের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব গতি-প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত হবে। বাংলা অভিধান থেকে বেকার শব্দ নির্বাসনে যাবে। বিজয় অর্জনের পর জাতির জনকের পদতলে অস্ত্র জমা দিয়ে দেশ গড়ায় মনোনিবেশ করেছিল।

পিতামাতার পেনশনের শেষসম্বল, পৈতৃক সম্পত্তি, মা-বোনের অংলকার, হালের গরু বিক্রি, ব্যাংক থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ছোট বড় মাঝারি ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৩১২টি শিল্পকারখানা খামার গড়ে তোলেন। প্রাণের চেয়ে মূল্যবান শিল্পগুলো পরিচালনায় জনবল নিয়োগ করতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে যান। বারবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েও পেশাভিত্তিক কোনো ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ পাওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে আত্মীয় ও রাজনৈতিক চাপে ১ জন ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদের স্থলে ১৫-২০ জন অদক্ষ লোক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণবিহীন শ্রমিকরা মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলো নষ্ট করে অহেতুক শ্রমঘণ্টা ব্যয় করে। বাংলা অভিধানে রুগ্নশিল্প শব্দ সংযোজিত হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে পরিবর্তন করতে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রতিষ্ঠা করা হয় স্বতন্ত্র শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ইত্যাদি। বছর বছর সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় করে পালন করা হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস, মে দিবস ইত্যাদি। মূল্যবান কৃষি জমি ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠা করা হয় ইপিজেড, ভারী শিল্পনগরী, কেমিক্যাল কমপ্লেক্স, স্পেশাল ইকোনোমিক জোন, উপজেলা বিসিক শিল্পনগরী ইত্যাদি।

গত ৪১ বছরে ইপিজেডে ৩৭২০ প্লটের মধ্যে ১০১২ ভারী শিল্পনগরীতে ১৪১২টির মধ্যে ৩১৭টি উপজেলা বিসিক শিল্পনগরীর ১৩২১২টি প্লটের মধ্যে

www.pathagar.com

মাত্র ৪৩০৯টি প্লট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হয়েছে। প্লট বরাদ্দপ্রাপ্তদের অধিকাংশ আবাসিক ভবন নির্মাণ করেছে। শিল্প উদ্যোক্তাদের ব্যর্থতায় বাংলাদেশ রপ্তানি জাতির পরিবর্তে আমদানিমুখী জাতিতে পরিণত হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমদানি পণ্য তালিকার নিম্নপ্রযুক্তির শেভ করার ব্লেড, নেইলকাটার, তালা, ছাতা, কলম, চশমা, মোবাইল, মেলামাইনযুক্ত কৃত্রিম দুধ, জেনারেটর, গাড়ি ইত্যাদি রয়েছে।

আজকের তরুণরা চিন্তা-চেতনায় অনেক অগ্রগামী। তাদের পণ্য ও পেশাভিত্তিক ডিপ্লোমা শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করলে স্বউদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থানমুখী হতো। উপজেলা বিসিক শিল্পনগরীগুলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। ইপিজেডের ভারী শিল্পনগরীতে উৎপন্ন হবে গার্মেন্টস শিল্পের মেশিন, রেল ইঞ্জিন, বিমান, অস্ত্র, হেলিকপ্টার, সাবমেরিন, নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টর, মহাকাশযান ইত্যাদি। নিম্ন মধ্যম উচ্চ প্রযুক্তিপণ্য উৎপাদনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব।

দৈনিক কর্ণফুলী : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

www.pathagar.com

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশায় তরুণ প্রজন্ম

বর্তমানে বাংলাদেশের সবকিছুর সঙ্গেই ডিজিটাল বাংলাদেশ। কেউ কেউ একে ব্যঙ্গও করেন। তাদের কাছে হতাশার নাম ডিজিটাল বাংলাদেশ। কেউ কেউ এমনটি বলেন, বাতি জ্বালানোর বিদ্যুৎ যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে আবার ডিজিটাল বাংলাদেশ। যেখানে আশাবাদ থাকে সেখানে ডিজিটাল বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তরুণদের মাঝে এই স্বপ্নটা অনেক বড়। সরকারের সকল পর্যায়ে যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা অবিরাম বলতে থাকার ফলে এখন বাংলাদেশের রাজনীতির মাঝেও সবচেয়ে জনপ্রিয় শব্দটি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। বাণিজ্য ও সমাজ—দুদিকে এর প্রভাব তীব্র। এর প্রভাবে মোবাইল অপারেটর কোম্পানির বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করার সুযোগ সম্বলিত বিজ্ঞাপনেও ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' সাম্প্রতিক কালের কয়েকটি আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। আমাদের পরিষ্কার দুই ধারা এনালগ না ডিজিটাল।

সাধারণভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে অনেকেই সর্বত্র কম্পিউটার ব্যবহারকে মনে করেন। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচনসহ সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রযুক্তির লাগসই প্রয়োগের একটি আধুনিক দর্শন। সর্বত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হচ্ছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বাংলাদেশ এবং চালিকাশক্তি হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বলতে বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করে চলার

www.pathagar.com

যোগ্যতা অর্জনকে বুঝায়। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনকে স্বাগত জানানো।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বলতে যত সহজ মনে হয় আসলে তা বাস্তবায়ন করা তত কঠিন। কিন্তু তাই বলে তা অসম্ভবও নয়। আমাদের দেশের ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। গ্রামের মানুষেরা শহরের মানুষের চেয়ে অনেক কম সুযোগ-সুবিধা পায়। শুধু শহরের নাগরিকদের কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সুবিধা দিলে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে না। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে দিতে হবে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা। পরিবর্তন করতে হবে গ্রামের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান। নিশ্চিত করতে হবে তাদের স্বাস্থ্যসেবা, ছড়িয়ে দিতে হবে শিক্ষার আলো, উন্নত করতে হবে যোগাযোগের ব্যবস্থা। এ কাজগুলো করতে পারলেই আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। তাই উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কৃষি উন্নয়ন ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন কৃষিশিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এবং ব্যবহারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। কৃষি উন্নয়ন বলতে বোঝায় দেশের শস্য, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও বনসম্পদের পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা।

অথচ কৃষি খাতে এখনো মান্ধাতা আমলের কৃষি ও সেচকার্য চলছে। কৃষি খাত সম্মিলিতভাবে যান্ত্রিক যুগে প্রবেশ করতে পারেনি। কৃষিকে যদি ডিজিটাল পর্যায়ে নিয়ে না আসা যায় তাহলে ২০২১ সালে ডিজিটাল শব্দটি স্লোগানধর্মী শব্দ হিসেবেই থেকে যাবে। তৃণমূলে কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, বনবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ পৌঁছাতে পারলে ডিজিটাল কৃষির অগ্রগতি একধাপ এগিয়ে যাবে।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে বলেছেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঠিকমতো কাজ করছেন না আমলারা। এই আমলাদের দিয়ে বাংলাদেশকে ডিজিটাল করা যাবে না। আমলাদের বেশিরভাগই তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান রাখেন না। এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান ভাসা ভাসা। এই ভাসা ভাসা জ্ঞান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টাইপ করা, কম্পিউটারে গান শোনা বা ছবি দেখার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

তথ্যপ্রযুক্তিতে অজ্ঞ লোক দিয়ে বাংলাদেশকে ডিজিটাল করা যাবে,

www.pathagar.com

সরকার এমনটা ভেবে থাকলে বলতে হবে তারা ভুল করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকে তার পরিকল্পনার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তিতে জ্ঞানী, দক্ষ, অভিজ্ঞ লোকদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এ কাজে সম্পৃক্ত হতে তরুণ যুবসমাজকে বিশেষভাবে শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। সারা দেশে ৪০-৬০ লক্ষ এসএসসি পাস যুবক বেকার। অর্ধশিক্ষিত, কর্মহীন যুবকরা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, পথে-ঘাটে, যানবাহনে, পাড়া-মহল্লা, অলিতে গলিতে ইভটিজিং-এ জড়িয়ে পড়ছে। স্কুলজীবনে এই তরুণদের স্বপ্ন ছিল আকাশছোঁয়া। শিক্ষা সমাপ্তির পর নিজ পরিবার, সমাজ, দেশের জন্য কর্মসংযোগ করবে। আজ তারা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এর জন্য ঔপনিবেশিক আমলে গড়া কেরানি তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা দায়ী। রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। এই সব দিকনির্দেশনাহীন তরুণদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রাথমিক ভীত রচনায় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

জ্ঞাননির্ভর এ প্রযুক্তিতে সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে জ্ঞান বিতরণ ও সৃষ্টির উৎস শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোই হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের কেন্দ্রবিন্দু, অগ্রপথিক। স্কুল কলেজের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের ই-গভর্নমেন্ট, ই-হেলথ, ই-লার্নিংসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরি, মোবাইল তৈরি, শিপ তৈরি, শিপ চালনা, বিমান তৈরি, বিমান চালনা, সাবমেরিন তৈরি, নিউক্লিয়ার, মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। সমাজে অবহেলিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত তরুণদের এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার ও প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ লক্ষ ছাত্র তরুণের সৃজনশীলতা, মেধা ও দক্ষতা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে ওঠার উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি হবে।

অর্থনীতি প্রতিদিন : ১০ জুন ২০১৩

www.pathagar.com

স্বাবলম্বী ইউনিয়ন পরিষদ : সমৃদ্ধ দেশ

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এ দেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে অত্যন্ত প্রাচীন একটি প্রতিষ্ঠান। সুদীর্ঘ ১৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে। স্থানীয় সরকার সর্বস্তরের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গ্রামীণ এবং শহুরে এলাকায় আলাদা কাঠামোতে বিভাজিত।

গ্রামীণ পর্যায়ের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে বেশ সম্পৃক্ত। গ্রামীণ পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তিনটি ধাপে বিভক্ত। যেমন জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ধাপটি হলো ইউনিয়ন পরিষদ। বাংলার গ্রামকে 'লিটল রিপাবলিক' বলেছেন কার্ল মার্কস। তিনি শব্দটির আবিষ্কর্তা নন। চার্লস ম্যাটকাফ তার একটি রিপোর্টে এটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। মার্কসের ব্যবহার ছিল অনেক গভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত। তিনি স্বায়ত্তশাসিত গ্রামগুলোকে বিশেষ নামে শনাক্ত করতে চেয়েছিলেন।

স্থানীয় সরকার নিয়ে এ দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়নি। কমিশনের পর কমিশন গঠিত হয়েছে, সুপারিশের পর সুপারিশ এসেছে, স্থানীয় সরকার কাঠামো তিনস্তর না চারস্তর হবে সে নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে। তারপরও প্রকৃত অর্থে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তিতে অর্জিত স্বাধীনতাকে সাধারণ মানুষের জন্য অর্থবহ করার লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে একটি শক্তিশালী, গতিশীল ও সমন্বিত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলার বলিষ্ঠ অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছিল। স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের প্রাজ্ঞ সংবিধান প্রণেতারা বাংলাদেশের সংবিধানে এ সম্পর্কে ৪টি অনুচ্ছেদ-৯, ১১, ৫৯, ৬০ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনুচ্ছেদ ৯-তে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত স্থানীয়

www.pathagar.com

সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহদান এবং এগুলোতে কৃষক, শ্রমিক ও নারীদের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১১-তে প্রশাসনের সব স্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এ দুটি অনুচ্ছেদ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত।

স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত, সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। এ ছাড়াও এর মাধ্যমে সর্বস্তরের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার 'দিনবদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করেছে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে। জেলা পরিষদকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, পরিকল্পিত পল্লী জনপদ এবং উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলোকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

একটি ইউনিয়নের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মৎস, পশুসম্পদ, পানিসম্পদ, ভৌত অবকাঠামো সর্বোপরি দারিদ্র্যবিমোচন এসব নিয়ে প্রতিটি প্রার্থীর মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নে একেকটি নিজস্ব স্বপ্নের রূপরেখা তৈরি হয়। নির্বাচনের সে স্বপ্ন প্রত্যাশাকে ধারণ করে প্রতিটি ইউনিয়ন তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে অগ্রসর হবে এটি বর্তমান সময়ে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের কাছে সবার প্রত্যাশা।

আমাদের দেশে সপ্তম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ৫ বছর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু বিগত দিনে বিভিন্ন কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। দীর্ঘ আট বছর পর ২০১১ সালে ৮ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন কোনো প্রকার বড় ধরনের গোলযোগ ছাড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে কিছু উপলব্ধি অবলোকন করে। পরিষদ আশাবাদী হতে চেয়েছিল যে ৮ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে একঝাঁক নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে, যারা নিজেরা তাঁদের কার্যক্রমের মাধমে ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উদ্যোগী ভূমিকা নেবেন।

www.pathagar.com

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এক অর্থে স্থানীয় সরকারের জাতীয় নির্বাচন। কয়েক গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয় বলে ইউনিয়ন হলো গ্রামীণ স্থানীয় ইউনিট। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সরকার। কিন্তু এটা স্বশাসিত ও স্বাবলম্বী নয় এবং পূর্ণাঙ্গ স্থানীয় সরকারও নয়। কার্যত এটি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ এজেন্টধর্মী ব্যবস্থা বজায় রেখেই হয়েছে ইউপি নির্বাচন। একজন চেয়ারম্যান ৯টি ওয়ার্ডের সকল ভোটারের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণ সদস্য নির্বাচিত করতে প্রতিটি ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। আবার সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্য নির্বাচনের স্বার্থে প্রতি তিন ওয়ার্ডকে নিয়ে একটি নির্বাচনী এলাকা গঠিত। প্রতি তিন ওয়ার্ডে একজন মহিলা সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। মহিলা মেম্বারদের প্রায়ই নিধিরাম সর্দার বলে উপহাস করা হয়ে থাকে।

সত্তরের দশকে জাপানের ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট, কাউন্সিলরের সহযোগিতায় ইলেকট্রনিক বিপ্লব ঘটায়। একগ্রাম একপণ্য রপ্তানিনীতি শুরু করে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে চীন জাপানকে অনুকরণ করে হাইটেকনোলজি বিপ্লব ঘটিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির চালকের আসনে অবস্থান করছে। এই দুটি দেশের ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রধান ও সদস্যগণ সবাই ছিল সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় বিভিন্ন ট্রেডে ডিপ্লোমাধারী। নির্বাচনে ভোটদান কালে ভোটারগণ কোনো এলাকায় কি ধরন ও পরিমাণের টেকনোলজি হস্তান্তর প্রয়োজন এ চিন্তা করেন। প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানা খামার, হাসপাতালে নিরাপত্তাবেষ্টনীর প্রতিশ্রুতিগুলো পর্যালোচনা করেন। আত্মীয়তা, ভাষা, ধর্ম, গোষ্ঠী, অঞ্চল বিবেচনা করেন না।

২০১১ সালের ২৯ মার্চ থেকে ৫ জুলাই ৫ মাসব্যাপি সারা দেশে ৮ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৮ কোটি ভোটার বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় ভোট প্রদান করেন। ৪৪৯৮টি ইউনিয়ন পরিষদে ৪৪৯৮ জন চেয়ারম্যান, ৪০ হাজার ৪৮২ জন সাধারণ সদস্য, ১৩ হাজার ৪৯৪ জন সংরক্ষিত মহিলা আসনে মেম্বার পদে নির্বাচিত হন। নির্বাচনী প্রচার অভিযানে প্রার্থীগণ চমকপদ নতুন নতুন উচ্চাবিলাসী ওয়াদা করেন। নির্বাচনের ২ বছর পেরিয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতির ছিটেফোঁটাও বাস্তবায়নের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পূর্বসূরিদের অনুসরণ করে গা ভাসিয়ে সময় পার করবেন বলে ধারণা করছি।

www.pathagar.com

নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানরা ভোটারদের প্রতি মায়া, মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে একটু উদ্যোগ, সামান্য ত্যাগ স্বীকার করলে জাপান ও চীনের জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে এক ইউনিয়ন এক পণ্য রপ্তানিনীতি গ্রহণ করতে পারেন। এলাকায় আধুনিক তাঁত, টেক্সটাইল, কৃষি, পোল্ট্রি, সিরামিক, থালা, ছাতা, ঘড়ি, মোবাইল, কম্পিউটার, ট্রাক্টর, রিকশা, সাইকেল, ইলেকট্রনিক ফ্যান, খেলনা, রাবার, এলুমিনিয়াম ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠা করে বেকার মুক্ত ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারেন। ইউনিয়ন থেকে বেকারমুক্ত উপজেলা, জেলা, বিভাগ একসময় দেশটি বেকারমুক্ত হবে। যাত্রাপথ তৈরি করতে হবে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে। দায়িত্ব নিতে হবে নির্বাচিত চেয়ারম্যান, মেম্বারগণকে। সরকার অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে মাত্র। মানবধর্মী, সেবামনস্ক জাতীয় কাজগুলো শুরু করতে ইউনিয়নের তরুণ প্রজন্মকে বিষয়ভিত্তিক ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে প্রশিক্ষিত করতে হবে। তাহলে কর্মের মাধ্যমেই চেয়ারম্যান মেম্বাররা ভিলেন না হয়ে নায়কের আসন গ্রহণ করবেন।

দৈনিক সংবাদ : ২২ মার্চ ২০১৪

www.pathagar.com

সংকটাপন্ন ব্রিটেনের তারুণ্য

ব্রিটেনে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আশির দশকের প্রথমার্ধের তুলনায় প্রায় এক মিলিয়নের বেশি তরুণ রয়েছে বর্তমানে, যার ব্যাপক অংশ বেকার। ২০১১ সালে লন্ডনসহ ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে দাঙ্গার সময় অগ্নিকাণ্ড, লুটপাট ও মৃত্যুর ঘটনা এতটাই অভাবিত ছিল যে কখনো কখনো একে অবিশ্বাস্যও মনে হয়েছে। তাদের সভ্যতায়, অহংবোধে ধাক্কা লেগেছে। ৬, ৭, ৮ ও ৯ আগস্টের দাঙ্গা এবং লুটপাটে তাদের মূল্যবোধ ধূলিসাৎ হয়েছে।

উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ নাগরিকের ধর্ম-বর্ণভেদে প্রায় একই রকম প্রতিক্রিয়াই দেখিয়েছেন তাঁরা। হতবাক বিস্ময়ের পাশাপাশি তাদেরও প্রশ্ন : কেন এমন হলো? এই ভয়াবহ দাঙ্গার কারণ কী? এই প্রশ্ন কেবল সাধারণ নাগরিকদের নয়, ব্রিটিশ গণমাধ্যমের প্রতিবেদক থেকে বিশ্লেষক—সবারই। ব্রিটেনের সমাজতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও হতবাক, তরুণ যুবসমাজের এ কাণ্ড দেখে।

মত বিশ্লেষণ যাই থাক তার মূলে রয়েছে বেকারত্ব আর্থিক এবং সামাজিক বৈষম্য, যা ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে। সামাজিক অবক্ষয়ের বিষাক্ত বাতাস গ্রাস করছে ব্রিটেনকে। রাজনৈতিক নেতৃত্ববিহীন হঠাৎ জ্বলে ওঠা তরুণদের সাম্প্রতিক নৈরাজ্য বিশ্ববাসীর জন্য একটি অশনিসংকেত। শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ একটি গোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার প্রান্তে। এদের কাজ নেই। বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য এই গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু আধুনিক সমাজে এরা বেড়ে উঠতে পারছে না প্রকৃত প্রযুক্তিমুখী সুশিক্ষার আলো নিয়ে।

২০০১ সালে একাধিক দাঙ্গার পর সরকারি বেসরকারি কমিশন প্রতিবেদনে তরুণদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিনির্ভর করে কর্মমুখী করার সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। লক্ষ করা গেছে তরুণরা লুটের জন্য যেসব দোকানপাট ভাঙচুর করেছে, তার অধিকাংশ ছিল

www.pathagar.com

ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জামের ডিজাইনার পোশাকের, ফার্নিচারের, মোবাইল ফোনের, স্পোর্টসওয়্যার ইত্যাদির। এসব দোকানের পণ্য তাদের কেনার সাধ্যের বাইরে। অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের এ ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাটে নির্বিকারভাবে ঘরের ভেতরে থেকেছেন।

পৃথিবী সৃষ্টির প্রান্তলগ্ন থেকে মানবজাতি বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, তুষারপাত, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি বা দেশের ক্রান্তিলগ্নে ত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করেছে অনেকেই। বিশেষ করে যুবসমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। দুঃসময়ের ত্রাণকর্তাদের সু-সময়ে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতবাসী ১ কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করেছে। যুদ্ধের শেষপ্রান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী, মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে পৃথিবীর ইতিহাসে মুক্ত আকাশের নিচে সর্বপ্রথম পরাজিত জাতিকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে। বিশ্বের বুকে যতদিন লাল সবুজের পতাকা উড়বে ততদিন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বাঙালি জাতি স্মরণ করবে। এছাড়া বিদেশি যেসব দেশ, সংস্থা ও নাগরিক বাঙালির বিপদে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তাঁদেরকে একে একে জাতীয়ভাবে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে।

ব্রিটিশ জাতি বিশ্বশাসন করছে সহস্র বছর। তাঁদের মধ্যে রয়েছে গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। তাঁরা অনুধাবন করতে পেরেছে সংকটাপন্ন ব্রিটেনে এশীয়রা নিরাপদ। তাঁদের হাতে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করা যায়। গত শতাব্দীতে ব্রিটিশ রাজকীয় সেনাবাহিনীর দায়িত্ব শ্রীলংকার গুর্খা জনগোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত করেছিল। ৮০ দশকে বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে ফকল্যান্ড যুদ্ধে গুর্খা সৈন্যদের বিরোচিত কর্মকাণ্ড।

ইতোমধ্যে ইংরেজদের সমাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, রাষ্ট্রনীতিতে এশীয়দের বিশেষভাবে অগ্রাধিকার প্রদান করছে। জনগুরুত্বপূর্ণ পদে এশীয়দের নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে যুক্তরাজ্যের অভিবাসন ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করে এশিয়া থেকে জনশক্তি আমদানি করছে। তবে তারা প্রশিক্ষিত, দক্ষ, কর্মঠ যুবশক্তিকে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে থাকে।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে ধারণা পাওয়া যায় আমদের দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবক আর তাদের ৪০ ভাগই বেকার। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সাম্প্রতিক এক

www.pathagar.com

হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছর ১৮ লাখ নতুন মানুষ কাজের জন্য মুখিয়ে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাছে দেশে বেকারের সংখ্যা কত তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। তবে অনুমান করা যায় দেশে প্রায় ২.৫ কোটি শিক্ষিত বেকার রয়েছে। বিভিন্ন তথ্যে জানা যায়, দেশের অর্ধেক লোকের স্থায়ী কোনো কর্মসংস্থান নেই।

প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নের প্রধান উৎস এতে সন্দেহ নেই। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ যারা বিদেশ যায়, যেতে আগ্রহী তাদের সকল প্রচেষ্টা একান্তই ব্যক্তিগত। সরকারি সাহায্য সহযোগিতায় বা সরকারি উদ্যোগ নিয়ে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করার দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য নয়। প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ বা কর্মদক্ষতা না থাকায় বাংলাদেশীরা বিদেশে সম্মানজনক কোনো পেশায় চাকরি লাভ থেকে বঞ্চিত। লেবার, রাজমিস্ত্রির হেলপার, গ্যারেজ, ঝাড়ুদার, অফিস পিয়ন, হোটেল রেস্তোরাঁর বয় ইত্যাদি কাজে এ দেশের মানুষ হাঁড়ভাঙা পরিশ্রম করে বিদেশে অর্থ উপার্জন করে। গুণগত মানহীন শিক্ষা ও উপযুক্ত ডিপ্লোমা শিক্ষার অভাবে প্রবাসে শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া অন্য কোনো কাজ তাদের ভাগ্যে জোটে না।

সমস্যার অন্তরালে সম্ভাবনা লুক্কায়িত। সংকটাপন্ন ব্রিটেনে জনশক্তি রপ্তানি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করতে হলে ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, মিশর, ভিয়েতনাম, কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ, বুদ্ধিমত্তা, মেধায় শারীরিক ও মানসিক সমান যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তরুণ যুবকদের পণ্য, কর্ম ও বিষয়ভিত্তিক ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। তবেই দক্ষ প্রশিক্ষিত তরুণ যুব সমাজ অহংবোধের ধাক্কায় বিধ্বস্ত ব্রিটিশ সমাজে গর্বিত অভিবাসীর মর্যাদার আসন দখলে সক্ষম হবে।

দৈনিক সংগ্রাম : ১১ এপ্রিল ২০১৩

www.pathagar.com

আরববসন্তের উচ্ছ্বাস ও যুবশক্তি

প্রাচীনকাল থেকেই মধ্যপ্রাচ্য বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিত একটি নাম। মধ্যপ্রাচ্য শব্দটি ১৮৫০ এর দশকে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অফিস'-এ প্রথম ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার নৌ-কৌশলবিদ আলফ্রেড থ্যায়ার ম্যাহান ১৯০২ সালে আরব ও ভারতের মধ্যবর্তী এলাকা বোঝাতে মধ্যপ্রাচ্য শব্দটি ব্যবহার করায় তা ব্যাপক পরিচিতি পায়। মধ্যপ্রাচ্য ইসলাম, খ্রিস্ট, ইহুদি ও জোরোথুস্ট্রিয়ানিজমের মতো উল্লেখযোগ্য ধর্মগুলোর উৎপত্তিস্থল। কৌশলগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা মধ্যপ্রাচ্য।

উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয়প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এক জনরোষ এখন রাজনৈতিক আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। তিউনিসিয়া থেকে মিশর, বাহরাইন, লিবিয়া হয়ে এই জনরোষ বিস্তৃত হয়েছে সিরিয়া পর্যন্ত। গণআন্দোলনে প্রকম্পিত এই ভূভাগের দেশগুলো হলো—তিউনিসিয়া, মিসর, লিবিয়া, বাহরাইন, ইয়েমেন, সিরিয়া এবং ওমান। এছাড়া ইরাক, ফিলিস্তিন, লেবানন মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাসঙ্কুল দেশ।

প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সংযোগভূমি হওয়ায় এই ভূখণ্ডের সমস্যা ইতিহাসের অনেক গভীরে। ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর সকালে রোজকার মতো জিনিসপত্র ফেরি করতে নিজের ঠেলাগাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন তিউনিসিয়ার ফেরিওয়ালা বুয়াজিজি। একপর্যায়ে তাঁকে পাকড়াও করে পুলিশ। রাস্তায় ফেরি করার বৈধ কাগজ নেই বলে অপদস্ত করা হয় তাঁকে। স্থানীয় পৌরসভার নারী কর্মকর্তা তাঁর গালে চড় মারেন। গায়ে থুতু ছিটান। কেড়ে নেন তাঁর মাপযন্ত্র। এই চরম অপমান হজম করার মতো মানসিক শক্তি ছিল না বুয়াজিজির।

পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে বিচার চেয়ে তা না পেয়ে পৌর ভবনের সামনে গায়ে দাহ্য তরল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন তিনি। আগুন স্বৈরশাসন, দুর্নীতি,

www.pathagar.com

অসাম্যের বিরুদ্ধে কল্যাণময় পরিবর্তনের জন্য। তিউনিসিয়ার বুয়াজিজির বিদ্রোহ থেকে 'আরববসন্ত' নামের গণজাগরণের সূচনা—তারপর এই গণজাগরণের জোয়ার মিশর, লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া ও বাহরাইনে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার আরবদেশগুলো এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে। যুদ্ধ, রক্ত আর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সূচিত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সীমিত পরিসরে হলেও রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের মধ্যে এখনো রয়েছে উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সর্ববৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ লিবিয়া। গৃহযুদ্ধের মধ্যে রয়েছে লোহিতসাগরের তীরবর্তী দেশ ইয়েমেন। আর ইসরায়েলবিরোধী দেশ সিরিয়া। সিরিয়ার সীমান্তবর্তী বৃহত্তম অ-আরব দেশ ইরানও রয়েছে অস্থিরতার মধ্যে।

মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক অশান্ত পরিস্থিতি বাংলাদেশে অর্থনীতির মূলে কঠিন আঘাত হানছে। মধ্যপ্রাচ্যে যেভাবে গণতন্ত্রমুখী আন্দোলন জোরদার হচ্ছে এবং তা দমানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষরা যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তাতে করে সংঘাত দিন দিন বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে অপরাপর দেশগুলো থেকেও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী দেশে ফেরত আসার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইয়েমেন, সৌদি আরব এবং ওমানেও বিক্ষোভ চলছে। কুয়েত, কাতার, জর্দানেও বিক্ষোভের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বাহরাইনে সৈন্য পাঠিয়েছে সৌদি আরব। বাহরাইন এবং ওমানের প্রকৃত অবস্থা ভয়ংকর। বিক্ষোভ দমন, কিংবা নতুন করে বিক্ষোভ যাতে দানা না বাঁধে, সেজন্য কঠোর দমনপীড়ন ও গোয়েন্দা নজরদারী তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে এসব দেশে।

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক লোক এসব দেশে কর্মরত। সেখান থেকে এরা যে বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠান, তা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরে প্রবাসীদের আয়ে। এই আয়ের সিংহভাগেরই যোগান দেয় আরব দেশগুলো। মধ্যপ্রাচ্যসহ আরববিশ্বের ১১টি দেশে চাকরি করেন ৪০ লক্ষাধিক লোক। লিবিয়ায় সংকটের কারণে ৫০ সহস্রাধিক বাংলাদেশীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং সেখান থেকে যাঁরা ফিরে আসছেন, তাঁরা ফিরছেন শূন্য হাতেই।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে আমাদের অর্থনীতিতে বিপর্যয় অনিবার্য। প্রবাসীদের আয় তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এমনিতে আমাদের জনশক্তি রপ্তানি অনেক দেশে বন্ধ। অথচ দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে

www.pathagar.com

চলেছে। শহরে গ্রামে বাড়ছে নানা প্রকার সামাজিক সমস্যা। গ্রামীণ স্বল্প শিক্ষিত, শিক্ষাবঞ্চিত যুবক তরুণদের স্বাবলম্বনের প্রধান উপায় মনে করা হয় চাকরি নিয়ে বিদেশগমনকে। পারিবারিক সচ্ছলতা অর্জন ও শান্তির একমাত্র উপায় হিসেবে প্রধান অবলম্বনে পরিণত হয়েছে বিদেশগমন। প্রতিবছর ১৮ লাখ থেকে ২০ লাখ লোক শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। দেশের ভেতরে এদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত নয়। সরকারকে এদের ব্যাপারে দ্রুত কার্যকরী কর্মক্ষম সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

জনশক্তি রপ্তানি খাতে সরকারের অসহযোগিতা, বিদেশি দূতাবাসগুলোর অজ্ঞতা ও দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের কারণে চরম ধস নেমেছে। গেল দুই বছরে এ সেক্টরে চরম অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। হাতছাড়া হয়ে গেছে সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, জর্ডান, ওমান, লিবিয়াসহ কয়েকটি দেশে কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে জনশক্তি রপ্তানি। সম্প্রতি যোগ হয়েছে দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা। এ কারণে প্রতিদিনই বিদেশ থেকে আমাদের শ্রমিকরা খালি হাতে ফিরে আসছে।

ইতোমধ্যে লিবিয়া থেকে ৩২ হাজার কর্মী দেশে ফেরত এসেছে। বাহরাইন পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সেখান থেকেও বিপুল সংখ্যক কর্মী ফেরত আসার আশঙ্কা রয়েছে। একইভাবে ইয়েমেন থেকেও প্রায় ১৫ হাজার কর্মী ফেরত আসর উপক্রম হয়েছে। এর ফলে বহু পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে চলে যাবে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও নাজুক অবস্থায় পড়বে। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সরকারের পক্ষে কঠিন হবে, কারণ অদক্ষরাই সমস্যার পাহাড় তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে।

প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ বা কর্মদক্ষতা না থাকায় বাংলাদেশীরা বিদেশে সম্মানজনক কোনো পেশায় চাকরি লাভ থেকে বঞ্চিত। লেবার, রাজমিস্ত্রির হেলপার, গ্যারেজ, ঝাড়ুদার, অফিস পিয়ন, হোটেল রেস্তারাঁর বয় ইত্যাদি কাজে এ দেশের মানুষ হাড়ভাঙা খাটুনি পরিশ্রম করে বিদেশে অর্থ উপার্জন করে। গুণগত মানহীন শিক্ষা ও উপযুক্ত ডিপ্লোমা শিক্ষার অভাবে প্রবাসে শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া অন্য কোনো কাজ তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ থাকলেও শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তা আমাদের নাগালের বাইরে।

বহুবিদ সমস্যার সূতিকাগার ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের অভিশাপ থেকে শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার যুবকদের দেশে কিংবা বিদেশে

www.pathagar.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারলে, আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে স্থিতিশীলতা গড়ে উঠবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ক্রমবর্ধমান বিপুলসংখ্যক বেকার যুবশক্তির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মতো ডিপ্লোমা শিক্ষায় শিক্ষিত করে সক্ষমতা আমরা অর্জন করতে পারিনি। মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তা পশ্চিমা শক্তিবর্গ তাঁদের নিজের স্বার্থে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করবে।

২৫ জুন মিশরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন মিশর গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছে মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যানারে সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসি। পশ্চিমারা মুরসিকে দলে টানার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে ইরানি প্রেসিডেন্ট আহমদিনিজাদ মধ্যপ্রাচ্যে কৌশলগত ভারসাম্য তৈরির জন্য কায়রো, তেহরানের সাথে মিত্রতা গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

অবস্থাদৃষ্টে কবির ভাষায় বলা যায় 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমি আমার সোনার হরিণ চাই।' বিশ্ব কূটনৈতিক বিবেচনায় আমাদের জনশক্তি রপ্তানিনীতি কবির সাথে সুর মিলিয়ে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে যেন বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি খাতটি বিধ্বস্ত না হয়।

আজকের বিশ্ব-বাজারের চাহিদানুসারে সাধারণ জনশক্তি রপ্তানির পাশাপাশি বিশেষায়িত পর্যায়ের উচ্চতর ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমশক্তি গড়ে তোলার বিষয়টা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। শ্রমশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্ব প্রেক্ষাপট চাহিদা পূরণের শিক্ষা চালু করা উচিত ছিল।

যে কোনো মূল্যে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সকল ধরনের অব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার যুবশক্তিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির সুযোগ করে দিতে হবে এবং তা সহজলভ্য করে তুলতে হবে। বিদেশি কর্ম-চাহিদা যাচাই করে শিক্ষা প্রদানের জন্য দেশওয়ারী ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণালয় স্থাপন করতে হবে। জনশক্তি আমদানিকারকদের চাহিদা অনুযায়ী পেশা ও পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদের প্রশিক্ষণই আরববসন্তের উচ্ছ্বাস মোকাবিলায় সক্ষম হবে বাংলাদেশ।

দৈনিক পূর্বকোণ : ১৭ মে ২০১৩

www.pathagar.com

মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক সুবাতাসে আমাদের প্রস্তুতি

আমাদের এ অঞ্চলের অনেক দেশের মতো মিয়ানমারের স্বাধীনতাও এসেছে রক্তঝরা পথে। জেনারেল অং সান ছিলেন সেই দেশের মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা রাখা মুক্তিযোদ্ধা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ৪ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।

মিয়ানমারের জাতীয় নেতা অং সান যখন বিভ্রান্ত কিছু সৈনিকের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন তখন জেনারেল অং এর তৃতীয় সন্তান অং সান সুচি ছিল মাত্র দুই বছর বয়সী। পরবর্তীতে ভারত ও অক্সফোর্ডে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী সুচি মিয়ানমার পুনরুদ্ধার রাজনীতির কর্ণধার হয়ে আবির্ভূত হন। অদম্য সাহস, অনাবিল ভালোবাসার বিষাদমাখা বিজয়ী বর্তমানে মিয়ানমারের রাজনীতিতে সু চি'র প্রভাব বাড়ছে।

১৯৮৮ সালের ৮ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই মিয়ানমারের রাজনীতিতে সু চি'র উত্থান। সুচির নেতৃত্বে মিয়ানমারে এখন গণতন্ত্রের হাওয়া বইছে। পাঁচ দশকের স্বৈরশাসন অবসানের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। দেশটির ওপর যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা বিশ্বের আরোপ করা অনেক বছরের অর্থনৈতিক অবরোধও শেষ হতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমার থেকে পণ্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। মিয়ানমার প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। খনিজ, আকরিক, তেল, গ্যাস, মূল্যবান পাথর সবই আছে দেশটিতে। বিশ্বের প্রাকৃতিক কাঠের প্রধান সরবরাহকারী। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ তেল ও গ্যাস খাতে সীমাবদ্ধ থাকলেও দেশটি সম্প্রতি উৎপাদনভিত্তিক বিনিয়োগ আকর্ষণে মনোযোগী হয়েছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সাফল্য দেখিয়েছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি ফিরছে মিয়ানমারে।

মিয়ানমার অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে ঢেলে সাজানোর জন্য জ্বালানি নীতিমালা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতিমালা তৈরি করছে। মিয়ানমারের

www.pathagar.com

উদার অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণের কারণে মিয়ানমার এখন অংশত অনুন্মোচিত একটি বিনিয়োগ কেন্দ্র হিসাবে আর্বিভূত হয়েছে। মিয়ানমারকে ৮ কোটি ডলার মঞ্জুরি সাহায্য দিতে সম্মত হয়েছে বিশ্বব্যাংক। পাশাপাশি ২৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার ঋণ দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে আন্তর্জাতিক ওই প্রতিষ্ঠানটি।

ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট জানিয়েছে, আগামী চার বছরে ব্রিটেন সেখানে ১৮ কোটি ৫০ লাখ পাউন্ড সাহায্য জোগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। খাদ্য, শিক্ষা ছাড়াও নারীদের ক্ষমতায়নে খরচ হবে এ অর্থ। মিয়ানমারে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সুইডেনের টেলিয়াসনেরা এবি, মালয়েশিয়ার অজিয়াটা ও নরওয়ের টেলিনর। অজিয়াটা ও টেলিনর এশিয়ার থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এরই মাধ্যমে মিয়ানমারে অফিস খুলছে। বহুজাতিক কোম্পানি মাইক্রোসফট, জেনারেল ইলেকট্রিক, ফোর্ড, টয়োটা, ম্যাকডোলাল্ড, কোকাকোলা, ইউনিলিভার, গ্লাক্সোসহ বিশ্বের সব কোম্পানি ইয়াঙ্গুনে অফিস খোলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কৃষিতে সমৃদ্ধ মিয়ানমার। বাংলাদেশের চেয়ে আয়তনে পাঁচ গুণ হলেও দেশের লোকসংখ্যা মাত্র ৬ কোটি। তুলা, পাট, ধান, গম, ভুট্টা, আখ, ডাল, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, রাবারসহ সব ধরনের কৃষি পণ্য উৎপাদন হয় মিয়ানমারে। ষাটের দশকের আগে দেশটি ছিল শীর্ষ চাল রপ্তানিকারক দেশ।

অবিসংবাদিত নেত্রী অং সান সুচির হাত ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মিয়ানমার নতুন করে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হওয়ার পর দেশটিতে একের পর এক আগমন ঘটছে বিশ্ব নেতাদের। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মিয়ানমার সফর করেছেন। সফরের আগে নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মনমোহনের এ সফর শান্তি ও সম্প্রীতির প্রতীক মাত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মিয়ানমার সফর করেছেন। মিয়ানমারে এটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের প্রথম সফর।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে ২০০৩ সালের ৫ নভেম্বর টেকনাফ স্থলবন্দর চালু করে। এ বন্দর দিয়ে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের আমদানিকারকরা বাইসাইকেল, টর্চ লাইট, বিছানার চাদর, টাওয়েল, লুঙ্গী, জুতা, সেন্ডেল, তালা, চাবি, গরু, মাছ, আদা, সুপারি, মাসকলাই, আচার, শুকনা বরই, তেতুল, শিমের বীজ, বিভিন্ন প্রকার ডাল, ছোলা, মসলাজাতীয় পণ্য, শুঁটকি, বাঁশ, বেত, রাবার, কাঠ প্রভৃতি আমদানি

www.pathagar.com

করে। মিয়ানমার থেকে চাল আমদানি হলেও এখনো তা বন্ধ রয়েছে। সর্বশেষ ২০০৯ সালে মিয়ানমার থেকে ৪১ হাজার টন চাল আমদানি করা হয়েছিল।

অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারে সিমেন্ট, রড, প্রসাধনসামগ্রী, হাঙ্গর, কচ্ছপের খোলস, অ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী, স্বর্ণ অলংকার, মোটর পার্টস, ওষুধ, রপ্তানি করে। বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের বাণিজ্য ঘাটতি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার।

একটি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অগ্রগতি, স্বাধীনতা হরণ, অবনতি নির্ভর করে সেই দেশের সরকার প্রধান ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা, শারিরিক ও মানসিক অবস্থানের উপর। মিয়ানমারের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রনায়ক বীর মুক্তিযুদ্ধা, জেনারেল অং সান ও রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র সেবিকা এক সময়ের মিয়ানমার রাজনীতির ত্রাণকর্তা খিন চি'র সুযোগ্য কন্যা অক্সফোর্ডের কৃতী ছাত্রী শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এবং ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির প্রধান অং সান সুচি মাত্র ৭ মাসে মিয়ানমারকে বিশ্ব দরবারে শীর্ষ স্থানে উপনিত করেছেন। এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে নিঃসন্দেহে আগামী দিনে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ করবে অং সান সুচির মিয়ানমার।

একটি দেশের শিল্প, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সমরনীতি প্রণয়ন করা হয় পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনা করে। আমাদের পার্শ্ববর্তী বৃহৎ দেশ ভারত বহু পূর্বেই সুপার পাওয়ারে উন্নতি ঘটিয়েছে। বিগত দিনের কর্ণধারেরা এর মোকাবিলায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এখন মিয়ানমারে সুচি'র জয়জয়কারে আমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে ডুগডুগি বাজিয়ে আনন্দ উপভোগ করব। তা জাতির জন্য দুর্ভাগ্যের। এখন থেকে শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা প্রতিযোগিতা মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা নিতে হবে অক্সফোর্ডের সাবেক ছাত্রীনেত্রী অং সান সুচি থেকে। সুচি অধিক সংখ্যক কর্মহীন মানুষকে টাইম বোমার সাথে তুলনা করেছেন। উচ্চশিক্ষার চেয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষায় প্রশিক্ষিত তরুণ মিয়ানমারে বেশি প্রয়োজন বলে নীতি নির্ধারণ করেছেন। জাপানের ন্যায় ৮০/৯০ শতাংশ তরুণকে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত করে একগ্রাম একপণ্য রপ্তানিনীতি গ্রহণ করবেন বলে পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে ঘোষণা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আদিকাল থেকে পররাষ্ট্রনীতির ধর্ম হলো পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা। সংস্কৃতিকে সংস্কৃতি দিয়ে, শান্তিকে শান্তি দিয়ে, অস্ত্রকে অস্ত্র দিয়ে, বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান দিয়ে, শিক্ষাকে শিক্ষা দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। ভারসাম্যহীন নীতি পার্শ্ববর্তী দেশকে অতল গহ্বরে নিপতিত করে। অং সান সুচি'র নীতিকে মোকাবিলা করতে হলে বাংলাদেশের তরুণদেরকে কর্মমুখী করার উদ্দেশ্যে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রশিক্ষণে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক সুবাতাসের সাথে বাংলাদেশ একাত্ম হয়ে উন্নতির পথে অগ্রগামী হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩

www.pathagar.com

ভিয়েতনামের উদ্যোক্তা বিনিয়োগ পরিকল্পনা

কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিয়েতনাম ও লাওসে ছয়দিনের সরকারি সফর করেছেন। নানা কারণে এই সফর বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের পূর্বমুখী যোগাযোগ অতীতে বলতে গেলে বন্ধই ছিল। বিশ্বায়নের বর্তমান বাস্তবতায় পূর্বের দেশগুলোর সঙ্গে সার্বিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও কার্যকর সহযোগিতা গড়ে তোলার তাগিদ দেখা দিয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পূর্বের দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী পারস্পরিক স্বার্থে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যে অংশীদার হওয়ার জন্য ভিয়েতনামের শিল্প উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে ধ্বংসস্তূপ থেকে আজ জেগে উঠেছে এশিয়ার নব্য অর্থনৈতিক শক্তি ভিয়েতনাম। সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খলা আর ধনতন্ত্রের স্বাধীনতা এই দুটিকে সমন্বিত করে ভিয়েতনাম চীনের মতোই উন্নয়নের যাদুকরী ঘটনা ঘটাচ্ছে।

মার্কিন-ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন প্রশাসন ৬৫ লাখ তরুণকে কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করেছিল। ৫ লাখ ৪৩ হাজার ৪০০ সেনা এসেছিল ভিয়েতনামে। ২২ হাজার মার্কিন প্রতিষ্ঠান যুদ্ধপণ্য সরবরাহ করে। ৭৮ লাখ ৫০ হাজার টন ওজনের বিভিন্ন ধরনের বোমা নিক্ষেপ করে দেশটিতে। ৭ কোটি ৫০ হাজার লিটার বিষাক্ত গ্যাস স্প্রে করে কৃষি খামার, বিভিন্ন ধরনের বন এবং গ্রামে। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ২০ লাখ ৫৭ হাজার ২৪৪ টন বোমা নিক্ষেপ করেছিল। উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বাহিনী ২ হাজার ৯২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১ হাজার ৮৫০টি হাসপাতাল, ৪৮৪টি চার্চ, এবং ৪৬৫টি মন্দির ও প্যাগোড়া ধ্বংস করে। এই যুদ্ধে আমোরিকার খরচ হয় ৩৫২ বিলিয়ন ডলার।

আজকে ভিয়েতনামের উন্নয়নের পিছনে শ্মশ্রুমণ্ডিত ছোটখাটো আকৃতির মানুষটি যে ভিয়েতনামিদের কাছে পূজনীয় তার আসল নাম নগুয়েন তাত

www.pathagar.com

থান। দেশের মানুষ ভালোবেসে তার নাম দিয়েছেন হো চি মিন। অক্ষরজ্ঞান শিখে নিজেই ধরেন পিতার পেশা শিক্ষকতা। ১৯১১ সালে উঠে পড়েন ফরাসি জাহাজে। চলে যান ফ্রান্সে। তারপর থেকে দেশকে মুক্ত করার নিরন্তর সংগ্রাম। ১৯২০ সালে ফরাসিদের সঙ্গে নিয়ে সে দেশে গঠন করেন কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯২৩ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে যোগ দিয়ে চলে যান তৎকালে কমিউনিস্টদের স্বর্গ মস্কোতে। সেখানে থেকে চীনে।

চীন এবং মস্কোতে বসেই চালিয়ে যেতে থাকেন তার রাজনৈতিক তৎপরতা। ১৯৪১ সালে ৩০ বছর পর গোপনে দেশে ফিরে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি হয়ে ওঠেন ভাগ্য নিয়ন্তা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান ভিয়েতনাম দখল করে নেয়। অক্ষশক্তি জাপানিদের পরাজিত করে ১৯৪৫ সালে উত্তর ভিয়েতনামকে মুক্ত করে হো চি মিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপরও লড়াই থামে না। আজীবন লড়াকু এই মানুষটি হাত বদল হওয়া দেশটির উদ্ধারের যুদ্ধে নামেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। তারপর আমেরিকা। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আসে। ১৯৬৯ সালে তিনি চিরতরে লড়াই থেকে বিদায় নেন। ভিয়েতনামের স্বাধীনতাযোদ্ধারা মার্কিন বাহিনী এবং তাদের মদদপুষ্ট শাসকদের পরাজিত করেন।

১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল। উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম একীভূত হয়ে যায়। হাজার বছরের লড়াই সংগ্রাম থেকে মুক্তি পায় একটি জাতি। দেশ উদ্ধারের লড়াই শেষ হলেও শুরু হয় দেশ গঠনের লড়াই। চমৎকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সহজ বিনিয়োগের সুযোগ এবং সস্তা শ্রমের কারণে সারা পৃথিবী থেকে বিনিয়োগকারীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন এখানে। আশির দশকে যেখানে ভিয়েতনামের মাথাপিছু আয় ছিল ৪ শ ডলারের ঘরে বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪,৭৩০ হাজার ডলারে। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেখানে ছিল ৫ দশমিক ৮১ ভাগ, এখন তা ৭ দশমিক ২৪ ভাগ। বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে দেশজুড়ে গড়ে তুলেছে ৯৬টি শিল্প জোন। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও সরকারি প্রণোদনার কারণে ভিয়েতনামে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠছে বিদেশি গাড়িনির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। বিশ্লেষকদের পূর্বাভাস ২০১৫ সাল নাগাদ ভিয়েতনাম বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মোটরগাড়ি নির্মাতা দেশে পরিণত হবে। এখানে অর্ধেক নারীর হাত কাজ করছে ভিয়েতনাম গঠনে। আমাদের দেশের গার্মেন্টশিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের মতো অক্ষরজ্ঞানহীন না। তারা পেশায় প্রবেশের পূর্বে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন।

ভিয়েতনামের জনগণের ধারণা বর্তমানে তাদের দেশে যে রাজনৈতিক,

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান তাতে আগামী পাঁচ বছরে তারা এশিয়ার একটি অন্যতম উন্নত দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তারা যেভাবে ফ্রান্স, আমেরিকা ও চীনকে তাদের দেশ থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে বিতাড়িত করেছি ঠিক একইভাবে তারা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জনগণের দারিদ্র্যতা দূর করতে সক্ষম হবে।

ভিয়েতনাম জাপানকে অনুসরণ করে একগ্রাম একপণ্য রপ্তানিনীতি গ্রহণ করে। গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা, প্রদেশে পণ্য ও পেশাভিত্তিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট নির্মাণ করে। ভিয়েতনামে ডিপ্লোমা শিক্ষার অনুপাত সাধারণ শিক্ষার চেয়ে বেশি। বর্তমান আমাদের বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ৮৪৮ ডলার। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ১০ শতাংশ পরিবার ঝুপড়িতে বাস করে এবং ৩২ শতাংশ পরিবার একটি মাত্র কক্ষবিশিষ্ট ঘরে স্ত্রী পরিজনসহ মানবেতর জীবনযাপন করে। শহরে বিশেষ করে রাজধানী শহর ঢাকায় বহু লোক স্বাস্থ্যসম্মত ঘরবাড়িতে বসবাস করতে পারছে না। রাস্তার পাশে, ড্রেনের পাশে ও অন্যান্য স্থানে বস্তিতে যেভাবে বসবাস করছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। শহরে বসবাসকারী দরিদ্রের ৯০ শতাংশের বেশি গ্রাম থেকে এসেছে দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় নিয়ে। ফলে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে দেশ। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়ার পরও দারিদ্র্য না কমার একটি বড় কারণ আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। শিক্ষাব্যবস্থায় কর্মহীনতা।

শিক্ষায় অনুপযুক্ত লোক শুধু যে কাজের গতিশীলতা কমায় তা নয়, পরিবেশ নষ্টেও ভূমিকা রাখে। অনুপযুক্ত লোকের কারণে প্রতিষ্ঠানে থাকা দক্ষ লোকগুলোর কর্মস্পৃহায় ব্যাঘাত ঘটে। বিশ্বব্যাংকের সদ্য প্রকাশিত প্রতিবেদন বলা হয়েছে লোকের সংখ্যা এ দেশে অধিক হলেও কাজের জন্য উপযুক্ত লোকের সংকট তীব্র।

ভিয়েতনামের লড়াকু মানুষের মতো বাংলাদেশের মানুষও অবিস্মরণীয় ত্যাগ স্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী জাতি। মুক্তিযুদ্ধে একাত্তরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের অনন্য বিজয় ভিয়েতনামবাসীর লড়াইয়ে প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভিয়েতনামিদের অনুসরণ করে এসএসসি পাস তরুণদের ব্যবহার করতে হবে। তৃণমূলে পণ্যভিত্তিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট নির্মাণ করতে হবে। তাহলেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্তিত হওয়া অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হব আমরা।

দৈনিক বাংলাদেশ সময় : ২৯ মে ২০১৩

www.pathagar.com

প্রযুক্তি বিপ্লব ও সাংবিধানিক দ্বন্দ্বে মিশর

মিশরের পিরামিড এক অনন্ত বিস্ময়। আমাদের পূর্বপুরুষদের এই অবিস্মরণীয় কীর্তি মিশরের মরুভূমিতে শির তুলে দাঁড়িয়ে আছে সদর্পে। সভ্যতার এই চরম উৎকর্ষের যুগে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পা দেবার পাঁয়তারা করছে মানুষ, নিয়ত আবিষ্কার করছে বিস্ময়কর সব যন্ত্রপাতি, একজনের হৃৎপিণ্ড অবলীলায় জুড়ে দেয়া হচ্ছে আরেকজনের দেহে। কিন্তু পিরামিডের পাশে দাঁড়ালেই বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব আবিষ্কার ম্লান হয়ে যায় মুহূর্তে। সভ্যতার সেই আদিযুগে, অপ্রতুল কারিগরির সেই সময়ে অত্যাশ্চর্য এই পিরামিডগুলো গড়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষেরা। গিজার পিরামিডগুলোকে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য সৃষ্ট কর্মগুলোর একটি হিসেবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে দীর্ঘ ৪০০০ বছরের বেশি সময় ধরে।

ঐতিহ্যের মিশর, ইসরাইলের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বিক্ষুব্ধ সৈনিকের হাতে ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাত প্রাণ হারানোর পর তখনকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সময় থেকে শুরু করে তিনি যে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তা ৩০ বছর ধরে অব্যাহত ছিল। দুর্নীতি কলুষিত প্রশাসন, অর্থনীতির ভঙ্গুর অবস্থা ও বেকারত্বের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় নির্যাতন, নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় জনতা। মোবারকবিরোধী আন্দোলনের মূলশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ থাকা সংগঠন 'মুসলিম ব্রাদারহুড' ও মিশরের প্রতিবাদী জনতা।

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। টানা ১৮ দিনের আন্দোলনে পতন ঘটে ৩০ বছরের স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের। গত ২৪ জুন দেশটির মানুষের জন্য ঘটে বড় বিজয়। মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থিত প্রার্থী ড. মুরসি ৬১.৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আরববিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ মিশরের সর্বপ্রথম বেসামরিক ও ইসলামপন্থী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ড. মুহাম্মদ মুরসি গত বছরের জুনে শপথ নেন।

www.pathagar.com

ড. মুরসি নীলনদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা সারকিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার আগে মুরসি মিশরের জাগাজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিভাগের প্রধান ছিলেন। নব্বইয়ের মাঝামাঝিতে ইহুদিবাদ বিরোধীদলের কমিটিতে একজন সদস্য ছিলেন। পরে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডের 'গাইডেন্স ব্যুরো'তে যোগ দেন। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ২০০০ সালের আইনসভার নিম্নকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে ২০০৫ সালে নির্বাচনে মুরসি হেরে যান। মিশরের ঐতিহাসিক বিপ্লবের পরে মুরসি মুসলিম ব্রাদারহুডের জোটভুক্ত ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির আইনসভার প্রধান হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ২০১১ সালের নির্বাচনে তার নেতৃত্বাধীন 'ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি' সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং প্রেসিডেন্ট হন।

ব্যক্তিগত জীবনাচরণে বিনয়ী, কোমল ও দরবেশ স্বভাবের হয়েও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অতুল দৃঢ়তা, অসম সাহস, আর রাষ্ট্রনায়কসুলভ বিচক্ষণতার বৈশিষ্ট্যে অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ড. মুহাম্মদ মুরসি। নির্বাচনে এক কোটি বত্রিশ লাখ একশো একুশ ভোট প্রাপ্তির খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহরীর স্কোয়ারে সমবেত জনতায় উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন। তার সেই ভাষণ ছিল, মৌলিক, সুচিন্তিত, সুগভীর প্রজ্ঞাসঞ্জাত। এত বিজয়ের পর মানুষ যখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে, উচ্চাভিলাষী, আবেগের আতিশয্যে নিজের দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পর্যন্ত ভুলে গিয়ে নেতৃত্বের রঙিন স্বপ্নে ডুবে যায়, মুরসি তখন হাজির হয়েছিলেন ভিন্ন অবয়বে। তিনি বলেছিলেন; আমি কোনো দলের নই মিশরীয়দের প্রেসিডেন্ট। জাস্টিস অ্যান্ড ফ্রিডম পার্টির পদ ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব থেকে ইস্তাফা দিলাম। এ মিশর সকল মিশরীয় অধিবাসীর। অধিকারের প্রশ্নে সকলে সমান। আমার কোনো অধিকার নেই, আছে কেবল দায়িত্ব।

মিশরের খ্রিস্টান, মুসলমান, সব মিশরীয়কে জাতীয় সংস্কৃতি ও উন্নয়নের অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মর্যাদা, স্বাধীনতা, মানবাধিকারের সম্মান, নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। সংবিধানহীন মিশরে উদারবাদীতন্ত্রের আলোকে সর্বজনগ্রহণীয় বৈষম্য ও সামাজিক শোষণমুক্ত একটি সংবিধান প্রণয়নের ঘোষণা দেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টেটল সংবিধান সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত *Politics* গ্রন্থে বলেছিলেন, Constitution is the way of life, the state has chosen for itself.— সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের জীবনপদ্ধতি, যা রাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছে।

বর্তমান যুগে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র রচনা করে জনগণ, আর তা পরিচালনা করে রাজনৈতিক নেতৃত্ব। মিশরের ক্ষেত্রে তাই হওয়ার কথা ছিল।

www.pathagar.com

কিছুদিন আগে দুই দফা গণভোট শেষে খসড়া সংবিধানের পক্ষে ভোট পড়ে ৬৩.৮ শতাংশ। আর বিপক্ষে ভোট পড়ে ৩৬.৯ শতাংশ। এ যেন মুসলিম ব্রাদারহুডের তৃতীয় দফা বিজয়। প্রথম দফায় হুসনি মোবারকের বিরুদ্ধে সফল বিপ্লব, দ্বিতীয় দফা জুন মাসে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুহাম্মদ মুরসিকে বিজয়ী করা আর শেষ দফায় সংবিধানের পক্ষে জনতার রায় ছিল অভূতপূর্ব। কিন্তু প্রতিশ্রুত বিষয়সমূহকে বিবেচনায় না এনে রাজনৈতিক প্রভাবের তাড়নায় কিছু সিদ্ধান্ত অল্প সময়ের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জনতার মুখোমুখি হন মুরসি।

কায়রোর তাহরির স্কোয়ার বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মারমুখী পুলিশ-জনতার সংঘর্ষে রক্তাক্ত, হতাহত হয়। অনিশ্চিত হয়ে পড়ে 'আরব বসন্তের' হাওয়া। কুক্ষিগত হয় নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ মানবাধিকার নিশ্চিত করার কার্যক্রম।

৩০ বছরের স্বৈরশাসক গণআন্দোলনে মোবারকের পতন, সংবিধান প্রণয়ন, সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে প্রেরণ, তরুণদের যথাযথ শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশ বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ছিল মিশর তথা আরবজাহানের জন্য সুখবর নিশ্চিন্ত পরিকল্পনার অংশ। সেখান থেকে ছিটকে পড়ছে মিশরের ছোটবড় ৪০টি রাজনৈতিক দলের সাথে ' মুসলিম ব্রাদারহুডের' দূরত্ব তৈরির কারণে।

বিদেশে জনশক্তি রপ্তানিতে মিশর বাংলাদেশর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। ২০১১ সালের ৭ অক্টোবর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের আল হাকাম প্যালেসের জাস্টিস স্কোয়ারে বাংলাদেশী আট শ্রমিকের শিরশ্ছেদ করা হয়। মিশরীয় নাগরিক হুসেইন সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল খালেককে হত্যা অপরাধের ঘটনা এটি। জনশক্তি রপ্তানি প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে মানবতার বিষয় ভূলুণ্ঠিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে হিন্দি, উর্দু ও আরবি ভাষাভাষীদের নিয়োগ প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি গতি মন্থর হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে যুবকদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি দক্ষ করে সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ করতে হবে। তাহলে মিশরের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সংঘর্ষে বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও বাংলাদেশের যুবশক্তির প্রযুক্তি উত্থান, মিশর হয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে।

দৈনিক বণিকবার্তা : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

www.pathagar.com

সঙ্কটময় মধ্যপ্রাচ্য ও বাংলাদেশের শ্রমবাজার

একসময় মধ্যপ্রাচ্য সংকট বলতে ফিলিস্তান-ইসরাইলই ছিল সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে। শতাব্দীর শুরুতেই আরব বিশ্বে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান এবং গণ বিপ্লবের সাথে পরিচয় হতে শুরু হলো। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব ও ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের কথা আমরা ইতিহাসে পড়ি। ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান সংশ্লিষ্টতা ছিল আমাদের।

মধ্যপ্রাচ্য বলতে আমরা পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগুলো এবং ইরান ইসরাইলকে বুঝি। কিন্তু বৃহত্তর দৃষ্টিতে আমাদেরকে এখানে উত্তর আফ্রিকার আরবদেশগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ অঞ্চলের প্রায় সব দেশই আরবলীগ ও *OIC*'র সদস্য।

তীব্র বেকারত্ব, দুর্নীতি, মূল্যস্ফীতি, গণসংকট ইত্যাদি সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার শিকার হয়ে আরববিশ্বের তরুণরা জেগে ওঠে। তিউনিসিয়ার এক বেকার শিক্ষিত যুবক মুহাম্মদ বুয়াজিজির আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে দেশের জনগণ ব্যাপক বিক্ষোভ করে। ২৩ বছর গদি আঁকড়ে থাকা বেন আলীকে ক্ষমতাচ্যুত করার মাধ্যমে জেসমিন বিপ্লব সফল করে। তার অব্যবহিত পরেই সারা বিশ্বকে টালমাটাল করে দেয়া তাহরির স্কোয়ারের লাখ লাখ জনতা ৩০ বছর ধরে আঁকড়ে থাকা মিশরের ক্ষমতা থেকে টেনে হিঁচড়ে নামায় হোসনি মোবারককে। দেখা যায় আরববিশ্বের দিকে দিকে গণতন্ত্রের কোমল হাওয়া।

সৌদি আরবে চলছে রাজতন্ত্র। বাদশাহ আবদুল্লাহ তাঁর দেশের বিপ্লবকারীদের সব দাবি মেনে নেন। আলজেরিয়ায় ১৯ বছর জরুরি অবস্থা জারি রাখে এবং সিরিয়ায় রাখে ৪৮ বছর ধরে। ইয়েমেনে আবদুল্লাহ সালেহ ৩১ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন। সুদান দু'টুকরো হয়ে গেল ক্ষমতাসীনদের দৌরাত্ম্যের কারণে। বাহরাইন, জর্ডান, মরক্কো, ওমান, কাতার, কুয়েত, আরব আমিরাত, লেবানন ইত্যাদি দেশের জনগণ গণতান্ত্রিক সুবাতাসের জন্য

www.pathagar.com

আন্দোলনমুখী। বর্তমান সারা বিশ্বের মানুষ চাচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতা, চাচ্ছে গণতন্ত্র, চাচ্ছে আইনের শাসন।

গণতান্ত্রিক দেশের সকলেই চায় আরববিশ্বেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। মাধ্যপ্রাচ্য মধ্যযুগের সেই জ্ঞান-গরিমা ফিরে পাক। আরববিশ্ব কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব ফেলবে না। আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনেও এ নিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস কিংবা উদ্বেগ নেই। ওই অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, পরিস্থিতি, ধরন অথবা পরিবেশের সঙ্গে আমাদের দেশের রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। আছে কেবল আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল চাকা প্রবাসী আয়। আর এ আয়ের বেশিরভাগেরই যোগানদাতা আরবদেশগুলো। সহজভাবে বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্যসহ আরববিশ্বের ১১টি দেশে আমাদের অন্তত ৪০ লাখ লোক চাকরি করেন। দেশগুলোতে অস্থিরতা বাড়লে তাঁদের অনেকেই চাকরি হারাবেন। দেশে ফিরতে হবে তাদের।

আরববিশ্বের রাজনৈতিক সঙ্কট বাংলাদেশের শ্রমবাজারে অশনিসঙ্কেত। গত প্রায় ৩ বছর ধরে জনশক্তি রপ্তানিতে নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, বাংলাদেশীদের ভাবমূর্তির সঙ্কট, কূটনৈতিক তৎপরতার অভাব, ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিকের সঙ্কটসহ নানা কারণ এর পেছনে রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্য এখন বাংলাদেশের অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে ভারত, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা থেকে দক্ষ প্রশিক্ষিত ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত লোক নিচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের এসব দেশ বাংলাদেশবিমুখ হওয়ার কারণে জনশক্তি রপ্তানির ওপর সার্বিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বেকারত্বের স্তূপ স্ফীত হচ্ছে। গ্রামীণ জনপদে বিশৃঙ্খল সামাজিকতা ভয়াবহ রূপ লাভ করছে।

বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানির বেশিরভাগই অদক্ষ। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় তাঁদের কোনো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নেই। এসব অদক্ষ শ্রমিকের দ্বারা বেশি কাজ, কম বেতন এবং দেশের মর্যাদাহানী ঘটে। দক্ষ ও প্রযুক্তির কাজগুলো দখল করছে ফিলিপাইন, ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, মিশর ও থাইল্যান্ড। বাংলাদেশ প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা ও ডিপ্লোমা নিয়ন্ত্রণকারী বিচ্ছিন্ন মতাদর্শের ৬টি প্রতিষ্ঠান নিম্ন প্রযুক্তিগত বিদ্যা যেমন—চুল কাটা, জুতা বানানো, খেলনা তৈরি, ছাতা তৈরি, তালা তৈরি, লবণ চাষ, বই বাঁধাই, ড্রাইভিং ইত্যাদি কর্মে ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স চালু করে জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে না। অন্যদিকে উচ্চপ্রযুক্তির এটমিক এনার্জি, ডেন্টাল হাইজিন, রেডিওথেরাপি, সাংবাদিকতা, অস্ত্র তৈরি, অ্যালুমিনিয়াম পোরসিলিন,

www.pathagar.com

জুয়েলারি ইত্যাদি বিষয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্স চালু করে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে না। উপরন্তু চালুকৃত যেসব ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্সের বিদেশমুখী চাহিদা রয়েছে সেসব কোর্সকে সংকোচিত করেছে দেশের ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তানিদের গড়া ডিপ্লোমা নিয়ন্ত্রণকারী ৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে ডিপ্লোমা কার্যক্রম পৃথক করে প্রশাসনিক বিভাগে ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রয়োজন। বোর্ড বিদেশমুখী চাহিদার সাথে যুবশক্তির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণব্রতে মনোযোগী হবে। তাহলে সঙ্কটময় মধ্যপ্রাচ্য বসন্ত সুবাতাসের সাথে সম্পৃক্ত হতে সক্ষম হবে এ দেশের তরুণ যুবসমাজ।

দৈনিক যায়যায়দিন : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

উন্নত দেশের শ্রমবাজার ও বাংলাদেশ

জনশক্তি রপ্তানিনির্ভর দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থ এ দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখছে। এটি আমাদের জন্য অবশ্যই একটি গৌরব ও মর্যাদার বিষয়। এরপরও উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, জাপানসহ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর জনশক্তির বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না বাংলাদেশ। উল্লিখিত অঞ্চলের দেশগুলোতে জনশক্তি পাঠানোর ব্যাপারে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে এখন পর্যন্ত কোনো চুক্তি হয়নি।

সরকারি হিসেবে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের জনশক্তির মধ্যে ইউরোপ ও নর্থ আমেরিকায় কাজ করেছে বা করছে ১ ভাগের কম। এর মধ্যে বেশিরভাগ ইংল্যান্ড ও ইতালিতে এবং তাদের সবাই সেখানে গেছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। জনশক্তি রপ্তানির জন্য রয়েছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড' (বোয়েসল)। রয়েছে প্রায় ৭৫০ রিক্রুটিং এজেন্সি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রয়েছে জনশক্তি রপ্তানিবিষয়ক সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের চুক্তি। এসব চুক্তি মধ্যপাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের জনশক্তি ব্যবসায়ীরা এখনো প্রবেশ করতে পারেননি।

বহুবার বহুভাবে আলোচিত হয় এই বিষয়গুলো সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষিত ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ আমদানির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে প্রশিক্ষিত দক্ষ ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ শর্তের ফাঁদে জাপানে জনশক্তি রপ্তানি।

বাংলাদেশ ২০০৫ সালে জাপানে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ পাঠানোর জন্য জিটকোর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। সংস্থাটি জাপানে কর্মী গ্রহণকারী বিভিন্ন

www.pathagar.com

সমিতির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি করে থাকে। দক্ষ জনবলের অভাবে ২০০৫ সালে জিটকোর সঙ্গে চুক্তি করেও দীর্ঘ সাত বছরে মাত্র আটজন বাংলাদেশী জাপানে পাঠাতে সক্ষম হয়েছে।

উন্নত দেশগুলোতে এখন গড়ে উঠেছে প্রচুর ওল্ডহোম। সেখানে প্রচুর স্বাস্থ্যকর্মী দরকার। ডাক্তার, নার্স, ফিজিওথেরাপিস্ট, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, ফার্মাসিস্ট সবার চাহিদা সেখানে আছে। দেশে কলেজ প্রতিষ্ঠার মহাযজ্ঞ চলছে। এসএসসি উত্তীর্ণ দক্ষ ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অকাল দিন দিন বেড়েই চলছে।

নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের চেষ্টা চালাচ্ছে। এজন্য পোল্যান্ডের একজন লবিস্ট নিয়োগ করেছে বোয়েসল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে তাঁরা অদক্ষ শ্রমিকশ্রেণির লোকবল নিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। সম্প্রতি কানাডাতে কিছু শ্রমশক্তি প্রেরণের সুযোগ হয়েছিল। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার পর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাহিদা মোতাবেক দক্ষ জনশক্তি পাওয়া যায়নি।

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বা কর্মদক্ষতা না থাকায় বাংলাদেশীরা বিদেশে সম্মানজনক কোনো পেশায় চাকরি লাভ থেকে বঞ্চিত। লেবার, রাজমিস্ত্রির হেলপার, গ্যারেজ ঝাড়ুদার, অফিস পিয়ন, হোটেল রেস্তোরাঁর বয় ইত্যাদি কাজে এ দেশের মানুষ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বিদেশে অর্থ উপার্জন করে। গুণগত মানহীন শিক্ষা ও উপযুক্ত ডিপ্লোমা শিক্ষার অভাবে প্রবাসে শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া অন্য কোনো কাজ তাঁদের ভাগ্যে জোটে না।

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের মাত্র ৪ দশমিক ৭ শতাংশ দক্ষ শ্রমিক। মাথাপিছু গড় রেমিট্যান্সেও বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশের শ্রমিকদের গড় রেমিট্যান্স যেখানে ৮৮৩ ডলার, সেখানে ভারতের শ্রমিকদের গড় রেমিটেন্স ২ হাজার ১৩২ ডলার, পাকিস্তানের ১ হাজার ২৫৩ ডলার এবং শ্রীলংকার ২ হাজার ১২৭ ডলার। বাংলাদেশ দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে রেমিট্যান্সের মাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়াতে পারে। দক্ষ কিংবা শিক্ষিত শ্রমিকরা নিজ দেশের সুযোগ-সুবিধা, কর্মরত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, তাঁর বিনিয়োগের রিটার্ন, মূল্যস্ফীতি এবং বিনিময় হার ইত্যাদি বিবেচনায় দেশে অর্থ পাঠায়।

ডিপ্লোমা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য দক্ষ জনশক্তির কদর সকল দেশে সকল সময় বিদ্যমান। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে ডিপ্লোমা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তি গড়ে তোলার

www.pathagar.com

চাহিদা বহু আগে থেকে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু, দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। ফলে, বাংলাদেশে জনশক্তি বলতে শুধু শ্রমিক রপ্তানি করে চলেছে। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে এখনই ঢেলে সাজাতে হবে—যাতে তথ্যপ্রযুক্তি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, নির্মাণ-প্রযুক্তিসহ বিষয়ভিত্তিক ডিপ্লোমা জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এই সংখ্যা যত বাড়বে, দেশের চাহিদা মিটিয়ে তত বেশি জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আরো বহুগুণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, পাকিস্তানের মতো অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলো যখন বিদেশি শ্রমবাজার দখলের জন্য সম্ভাব্য শ্রমবাজারের দেশগুলোর চাহিদা মোতাবেক শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলছে, সেখান আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। বর্তমান পৃথিবীর প্রযুক্তি উন্নত ও শিক্ষাচেতনার দেশসমূহে সকল পেশাকে বিজ্ঞান ও কলার সমন্বয় ঘটিয়ে ব্যাপক উন্নতি করেছে। সেখানে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করবে। তখন জনসংখ্যা দাঁড়াবে ২৮ কোটিতে। বর্তমানে ৩ কোটি শিক্ষিত বেকার যুবকের ভার বহন করতে হচ্ছে জাতিকে। আগামী ১৯ বছরে যোগ হবে আরো ৩ কোটি শিক্ষিত বেকার। এসময়ের মধ্যে যুবকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকার জন্য কর্মসংস্থান এবং বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থাপনা না করলে সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। দেশব্যাপী সন্ত্রাসের ব্যাপক বিস্তার হবে, অপরাধে সয়লাব হবে, অপকর্মের সংখ্যাধিক্য হবে, দেশ বঞ্চিত হবে বৈদেশিক শ্রম নিয়ন্ত্রণ ও শ্রম আয় থেকে।

বর্তমান জনশক্তি রপ্তানির শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর সামনে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে হবে। এ কাজটি সহজ করার জন্য প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে প্রযুক্তিশিক্ষাকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। প্রযুক্তি উন্নত দেশসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা কোর্স চালু করবে প্রতিষ্ঠিত ডিপ্লোমা শিক্ষা বোর্ড। আমাদের উদ্দীপনা হোক স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব হবে বেকারহীন প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বাংলাদেশে।

দৈনিক যুগান্তর : ৮ আগস্ট ২০১২

www.pathagar.com

বিশ্ববাসীর সুফল ভোগের শিক্ষা

আজ থেকে প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অনগ্রসর আরবের ভূমিতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) উপর নাযিল হয়। পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে পরিবারনীতি, সমাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধুনিক বিজ্ঞানের সকল নির্দেশনা রয়েছে।

বিজ্ঞানী নিউটনের সূত্র ধরে আমরা আধুনিক বিশ্বের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছি। ১৪৫০ সালে জার্মানির বৈজ্ঞানিক ওটেনবার্গ আবিষ্কৃত প্রিন্টিং প্রেস মানবসভ্যতাকে বহু দূর এগিয়ে নেয়। ১৯২৮ সালে ব্রিটেনের চিকিৎসাবিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং কর্তৃক এন্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিষ্কারের ফলে মানুষের মৃত্যু মিছিলের গতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৭৮ সালে আইসিডিডিআর,বি'র বাঙালি চিকিৎসক ডা. আলম বিশ্বকে তাক লাগিয়ে আবিষ্কার করেন ওরস্যালাইন। পৃথিবী সৃষ্টি থেকে অদ্য পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল ওষুধের মধ্যে খাবার স্যালাইন কম দামে সবচেয়ে বেশি লোকের প্রাণ রক্ষা করছে। ১৯১৪ সালে ফ্রান্সের নাগরিক ব্যারন ডি কুবার্টেন নব্য অলিম্পিকের জন্ম দেন। জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভালোবাসা এবং বিশ্বে জনগোষ্ঠীর হিংসা, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ সংঘাত দূর করা অলিম্পিকের উদ্দেশ্য।

সৃষ্টি বা উদ্ভাবনের কোনো পরিসীমা নেই। দিন দিন বিজ্ঞানী গবেষকরা নতুন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে বিশ্ববাসীকে। বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং আবিষ্কারের ফলে বিশ্ব আজ গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে, এর সুফল সারা বিশ্বের জনগণ ভোগ করছে। বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগে ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা, অনন্য মহৎ আবিষ্কারগুলোর মতো এ দেশের পাশাপাশি বিশ্ববাসী এর সুফল ভোগ করবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৬৫ হাজার তরুণ নিজের মেধা, অভিভাবকদের অর্থ ও প্রভাব খাঁটিয়ে উন্নতির শীর্ষ শিখরে উপনীত হয়। বাকি ১৩ লক্ষ ৩৫ হাজার যুবক দিকনির্দেশনাহীন থাকে। এসব যুবক অভিভাবক-নিজ-সন্তান তিনটি জেনারেশনকে ধ্বংস করে দেয়। দেশ, জাতি বিশ্ববাসীর কোনো উপকারে আসে না। প্রতিটি মানুষের সাথে যে বিষয়টি সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান সেটি হচ্ছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। একে গতিময় করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ডিপ্লোমা শিক্ষা। একমাত্র ডিপ্লোমা শিক্ষাই পারে প্রতিটি মানুষকে সম্পদে পরিণত করতে। কঠোর বাস্তবতাময় ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ এ পৃথিবীতে জীবনকে মানুষের উপযোগী, সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যমণ্ডিত করতে পারে একমাত্র ডিপ্লোমা শিক্ষা। গতিশীল পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে এবং উন্নত জীবনের ছোঁয়া নিতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ডিপ্লোমা শিক্ষা অপরিহার্য।

বাংলাদেশে আজ থেকে ৭০ বছর পূর্বে ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ সরকার শাসনব্যবস্থা দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী ভিন্নমতালম্বী ৬টি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে। ৭০ বছরে ৩২টি বিষয়ে ২৬৭টি ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে মাত্র। কোর্সগুলো ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস, ১ বছর, ২ বছর, ৩ বছর, ৪ বছর। ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণি, এসএসসি ও এইচএসসি। স্বাধীনতার ৪১ বছর পেরিয়ে গেলেও কোর্সগুলোর জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ হয়নি। কোনো ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ বা ছাত্র ভর্তি হয় না।

সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই জ্ঞান অর্জনে এক দেশ থেকে অন্যদেশে জ্ঞান পিপাসুরা চষে বেড়াচ্ছেন। যেই দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় কম, শিক্ষার মান উন্নত সেই দেশেকে তরুণরা বেছে নিচ্ছেন। আমেরিকা ৪২৭২টি বিষয়ে ৭৮ হাজার ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ১৮৩টি দেশের ১ কোটি ২০ লক্ষ ছাত্র অধ্যয়ন করছেন। যুক্তরাজ্যে ৩১০৩টি বিষয়ে ৩০ হাজার ইনস্টিটিউটে প্রায় ৬০ লক্ষ বিদেশি অধ্যয়ন করছেন। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতে ৪১০৩ বিষয়ে ৮০ হাজার ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ২০ লক্ষ বিদেশি ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। বাংলাদেশের অনেক আলালের ঘরের দুলাল বিদেশে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পাচার করছে।

বাংলাদেশ সাড়ে তিন দশক ধরে মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করেছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ইপিজেড।

www.pathagar.com

মুক্তবাজার অর্থনীতির হাওয়া লেগেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রেও। সেন্ট মেরিজ, সেন্ট গ্রেগরি, মেরী উইলিয়াম, নটরডেম, হলিক্রসের মতো আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিদেশি সমাজসেবক এবং বিদ্যুৎসাহীরা নির্মাণ করেছে। ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে সরকারি বেসরকারিভাবে এক ছাতা নীতি গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে আগ্রহ বোধ করছেন না।

বাংলাদেশে ছোট, বড়, মাঝারি ১৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৬১২ শিল্প আছে। এই শিল্পে যারা কর্মরত তাদের পণ্য ও পেশা ভিত্তিক ন্যূনতম প্রশিক্ষণ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিল্প পরিচালনায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। শিল্প উন্নত বিশ্বে মোট জনশক্তির ৭৬ শতাংশ ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দান করে উৎপাদন ব্যয় ও সময় হ্রাস করে উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদন করছে। বাংলাদেশে ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদের অভাবে এককালের লাভজনক শিল্প আদমজী জুট মিল, চিটাগাং স্টিল মিলের মতো শিল্প রুগ্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। প্রযুক্তিজ্ঞানহীন শ্রমিকদের কোনো ভিশন নেই। তাদের দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। পণ্য ও পেশাভিত্তিক ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হাই টেকনোলজির দেশে প্রবেশ করবে।

গত ৩ জুলাই ২০১২ ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন (ওয়াইপো) কর্তৃক সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স (জিআইআই) রিপোর্ট প্রকাশ করে। এখানে বাংলাদেশের অবস্থান হতাশাজনকভাবে ১৪১ দেশের মধ্যে ১১২তম। এশিয়ার সিঙ্গাপুর তৃতীয়, হংকং অস্টম স্থান দখল করে নিয়েছে। এই সূচক প্রণয়ন ও প্রস্তুত করতে পাঁচটি বৃহত্তর উপাদান ও দুই বৃহত্তর উৎপাদনের হিসাব নির্ণয় করা হয়। পাঁচটি উপাদানের মধ্যে আছে প্রতিষ্ঠান মানবসম্পদ ও গবেষণা অবকাঠামো বাজার ও ব্যবসায় পরিশীলন। আর দুই উৎপাদনের মধ্যে আছে জ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎপাদন এবং সৃজনশীল উৎপাদন।

বাংলাদেশ পৃথিবীর সপ্তম জনবহুল দেশ। ১৯৭১ সালে জগৎ কাঁপানো যুদ্ধ করে দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে। বীরমুক্তিযোদ্ধারা অনেকগুলো রেকর্ড সৃষ্টি করে। এর ধারাবাহিকতায় মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সন্তানরা দেশি-বিদেশি শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে হাইটেকনোলজি, খনিজসম্পদ উত্তোলন, এটমিক, এনার্জি, মহাকাশযান নির্মাণের মতো ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। কল্পনা করে দেশি-বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সাথে ভাবের আদান-প্রদানে নবধারা সূচক পরিবর্তনের।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহ তাদের শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে অগ্রসর হয়। উদ্দেশ্য, স্বনির্ভরতা অর্জন। শিল্পগুলোতে নিয়োগ দান করে প্রশিক্ষিত জনবল। বিশেষজ্ঞ শিল্প পরিচালনা করতে নিজের দেশে প্রশিক্ষিত/দক্ষ জনবল না পেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমাধারীদের বিদেশ থেকে আমদানি করে। বাংলাদেশের ৭০ লক্ষ লোক বিদেশে চাকরি করছে। তাঁদের কারোর আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় ন্যূনতম প্রশিক্ষণ নেই। ঝাড়ুদার, সুইপার, দিনমজুর, হোটেল বয়, মালি পদে কাজ করেন। সম্প্রতি ১২-৩০ বছরের মেয়েদের ফুরফুরে মেজাজে আয়া হিসেবে প্রেরণ করা হচ্ছে।

বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করে প্রতি বছর ১০ লক্ষ তরুণকে ডিপ্লোমা শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব। এর অর্ধেক বিদেশে উচ্চ বেতনে গমনের সুযোগ হবে। তাহলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাঙালি জাতিসংঘ সদর দপ্তর, বিশ্বব্যাংক, নাসা, মরুভূমি, দ্বীপ, উপকূল, সাগর-মহাসাগর, আকাশে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। মাসিক বেতন আরম্ভ থাকবে, শেষ থাকবে না।

বিভাগীয় ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড হয়ে উঠবে একবিংশ শতাব্দীর মানবতা মুক্তির সনদ। এর সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে সমগ্র বিশ্বের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ক্রীড়া, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক আমূল পরিবর্তন ঘটবে। প্রশান্ত মহাসাগরের নিঝুম দ্বীপ থেকে সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত বাংলার তরুণদের পদচারণায় মুখরিত হবে।

দৈনিক সংগ্রাম : ৮ ডিসেম্বর ২০১২

www.pathagar.com

আদিবাসী দশক : প্রাপ্তি ও অপূর্ণতা

আজ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। প্রতি বছরের মতো রাজধানীসহ আদিবাসী অধ্যুষিত শহরগুলোর আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এটিকে বিশেষ দিবস হিসেবে পালন করে। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পোশাক পরে শোভাযাত্রা, সভা-সেমিনারে একসঙ্গে মিলিত হয়। বিশেষ বক্তাদের বক্তব্যে মিলনায়তনে স্লোগান ওঠে, কোনো কোনো বক্তব্যে জোরালো করতালিও হয়। এভাবে গতানুগতিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে শেষ হবে দিবসটি—তারপর সব চুপ। পরের বছরে এ দিনটির জন্য আবার অপেক্ষা।

জাতিসংঘ ১৯৯৩ সালকে আদিবাসী বর্ষ, ৯ আগস্টকে আদিবাসী দিবস ও ১৯৯৫-২০০৪ সালকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। এর লক্ষ্য ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর বহু শতাব্দীর বঞ্চনা ও নিপীড়নের ইতিহাস এবং বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তাদের উপেক্ষিত অবস্থানের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। প্রথম আদিবাসী দশকের মূল লক্ষ্য ছিল আদিবাসী জনগণের মানবাধিকার, পরিবেশ, উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

জাতিসংঘ ঘোষিত প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক শেষ হয়েছে ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর। আদিবাসী দশকের লক্ষ্য পরিপূরণে অপূর্ণতা ও আদিবাসীদের ওপর বহু শতাব্দীব্যাপী বঞ্চনা ও অবহেলার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে জাতিসংঘ ইতিমধ্যে আবার ২০০৫-২০১৪ সালকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ঘোষণা করেছে। জাতিসংঘ দ্বিতীয় আদিবাসী দশকের কার্যপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে এবং ওই কার্যপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ সদস্য-রাষ্ট্র, বিশেষায়িত সংস্থা, আদিবাসী সংগঠন, সুশীল সমাজ, এনজিওগুলোকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

বাংলাদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক উন্নয়নের জন্য সরকারি বরাদ্দের কথা দেশি-বিদেশি এনজিওর উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির

www.pathagar.com

কথা শোনা যায়। কিন্তু উন্নয়ন বাস্তবায়নের এসব কর্মসূচি প্রচার ও বরাদ্দের ব্যাপারে নানান অনিয়ম অব্যবস্থাপনার কিচ্ছাকাহিনী প্রায়ই পত্রিকার শিরোনাম হয়। আদিবাসী নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু আদিবাসী এবং উপজাতি বলতে সাধারণত এমন সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যাদের নিজেদের মধ্যে কিছু চরিত্রগত মিল থাকে। তারা সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সংস্থাগুলো, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক আইন আদিবাসী শনাক্ত করার জন্য নিম্নোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য ঠিক করেছে :

১. আদিবাসীরা সাধারণত তাদের পূর্বপুরুষদের বাসভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বংশানুক্রমে বসবাস করে।
২. তারা তাদের এলাকাগুলোতে সুস্পষ্টভাবে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধারণ করে ও মেনে চলে।
৩. তাদের একটা বিশেষ চরিত্র হলো, তারা নিজেদের ভৌগোলিক ও প্রতিষ্ঠানগত সংস্কৃতিক রক্ষা করে চলে এবং বিদ্যামান বৃহত্তর সমাজগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতে চায় না।
৪. তারা নিজেদের আদিবাসী অথবা উপজাতি হিসেবে পরিচয় দেয়।

বাংলাদেশ একটি জাতি-বৈচিত্র্যের দেশ। বহুজাতিক, বহুভাষিক, বৈচিত্র্যময়, কৃষ্টি-ঐতিহ্যের দেশ। এ দেশে বাস করে নানা বর্ণের, নানা ধর্মের, নানা জাতের, নানা গোত্রের মানুষ। বাঙালিরা প্রধানতম জাতি হলেও এ দেশে রয়েছে অনেক নৃগোষ্ঠী—যাদের ভাষা, সংস্কৃতিক, কৃষ্টি-ঐতিহ্য, ধর্ম ও জীবনযাপন প্রণালী ভিন্ন। অরণ্য পাহাড়ের উঁচু-নিচু প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে এদের বহু অজানা কিংবদন্তি, নাচ, গান, গল্পকথা, প্রথা ও লোকাচারের নান্দনিক উপাদান। ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও জীবন-অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার এ দেশের পাহাড় থেকে সমতলে রয়েছে এ ধরনের ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ২৫ লক্ষ লোক, যারা নিজ নিজ ৪০টি ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলেন, সমতলের সংখ্যাগরিষ্ঠের নানামুখী আগ্রাসন সত্ত্বেও তারা তাদের নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, ভূমি ও সম্পদের ব্যবস্থাপনাসহ সর্বক্ষেত্রে আপন স্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট।

আদিবাসীদের এটা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য যে, এরা প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। জীবন, জীবিকা, আচার আচরণ ও বিশ্বাসে এরা প্রকৃতিনির্ভর। আদিবাসীর ২৪ ভাগ হিন্দু, ৪৪ ভাগ বৌদ্ধ, ১৩ ভাগ খ্রিস্টান এবং ১৯ ভাগ অন্য ধর্মাবলম্বী।

www.pathagar.com

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রাজশাহী অঞ্চলে বসবাস করে থাকে। বেশিরভাগ আদিবাসীর বাস গ্রামে। তাদের চেহারার মধ্যে চীনাদের মতো মঙ্গোলিয়ান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের সামাজিক রীতি-নীতি, বিয়ে, জন্ম-মৃত্যু, খাদ্যভ্যাস ইত্যাদি সামাজিকতায় দেশের অন্যান্য অংশের জনগণ থেকে ভিন্ন ধরনের। এরা অল্পতেই তুষ্ট, এদের লোভ নেই। আদিবাসীদের এক গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের বিয়ে হয় না। আমাদের দেশের প্রধান উপজাতি চাকমা। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল ও অরুণাচলে চাকমারা বাস করে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। পার্বত্য জেলাগুলোতে চাকমা ছাড়াও মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, লুসেই, পাংকুয়া, খ্যাং, কুমি, চাক ইত্যাদি আদিবাসী বসবাস করে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে গারোরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। গারোদের পাশাপাশি হাজংরা বাস করে। এরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এদের ভাষার সঙ্গে বাংলা ও অহমিয়া ভাষারও মিল দেখা যায়। এছাড়াও বৃহত্তর সিলেটে খাসিয়া বাস করে। আর উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে বিশেষ করে দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, বগুড়া এবং রাজশাহী জেলায় ওরাওঁ সম্প্রদায়ের প্রধান বাস। ওরাওঁরা হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধধর্ম পালন করে থাকে। ওরাওঁদের সমাজ এখনো প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অধীন। নৃত্যগীত এদের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। ওরাওরাঁ ভারতের রাঁচি অঞ্চল থেকে এখানে এসেছে বলে ধারণা করা হয়।

দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে আদিবাসীরা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। দারিদ্র্য তাদের ক্ষমতায়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। সে কারণে তাদের অবস্থার উন্নয়নের বিষয়েও তারা শক্তিশালী রাজনৈতিক ভূমিকা রাখতে পারছে না। প্রায় ক্ষেত্রেই আদিবাসীরা শিক্ষা, চাকরি ও অন্যান্য সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। মৌলিক অধিকারসহ আধুনিক সভ্যতার সবকিছু থেকে আদিবাসী সম্প্রদায় অনেক পিছিয়ে। পার্বত্য এলাকা নয়, সারা দেশের আদিবাসীদের অবস্থা একই। ময়মনসিংহের মান্দি (গারো) আদিবাসী কিংবা উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল বা পটুয়াখালীর রাখাইন—সবাই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ। সরকারি নানা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আদিবাসীদের অস্তিত্ব এখনো হুকমির সম্মুখীন।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্ব একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেছে। একবিংশ শতাব্দী হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। যে জাতি দেশের নাগরিকদের ডিপ্লোমা শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পেরেছে, সেই জাতি তত দ্রুত উন্নতি করেছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ডিপ্লোমা শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিটি কিশোরকে ডিপ্লোমা শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দেয়া। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় বিগত দশকে ডিপ্লোমা শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ফলে ডিপ্লোমা শিক্ষার হার বেড়েছে কিন্তু আদিবাসী যুবকদের ডিপ্লোমা শিক্ষার সুযোগ তৈরিতে তেমন কোনো পরিকল্পনা অদ্যাবধি ডিপ্লোমা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী ৭টি বোর্ড গ্রহণ করেনি।

প্রতি বছর আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা থেকে ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। শুধু ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে এসএসসি পাস ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। আদিবাসীদের একমাত্র উপার্জন উপায় হলো কৃষি কাজ ও জুম চাষ। অধিকাংশ পাহাড়-পর্বত-টিলা এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়নি। ডিপ্লোমা ভেটেরিনারি ও পোল্ট্রি প্রযুক্তিবিদ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা হলে প্রাকৃতিক পরিবেশে ভেটেরিনারি ও পোল্ট্রি খামার গড়ে তোলা সহজ হতো।

পার্বত্য অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের স্থানজুড়ে রয়েছে তিন আদিবাসী চাকমা, মং ও বোমাং রাজাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। রয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা ও পাহাড়ি জনপদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। আদিবাসীদের পর্যটনবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ দিলে প্রাকৃতিকভাবেই পর্যটনকে শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারত। আদিবাসীরা এখনও চিকিৎসাবিহীন, বিশেষ করে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। গত ৪২ বছরের ৭৯ হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে এর অধিকাংশই শিশু। 'শিংগা লাগানো' প্রযুক্তি এখনো আদিবাসীদের একমাত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা।

দুর্গম পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে আধুনিক চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে রাঙামাটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮২ সালে এক অজানা রহস্যের কারণে স্কুলটি বন্ধ করে দেয়। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বাঁধ নির্মাণ করতে গিয়ে হাজার হাজার পরিবারকে গৃহহীন, জমিহীন, কর্মহীন করে। এদেরকে ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিলে আত্মকর্মসংস্থান করে নিতে পারত।

www.pathagar.com

অবারিত সবুজ আর বিশাল পাহাড়ের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান। জেলার মাটি যেমন উর্বর, তেমনি বায়ুমণ্ডলও দূষণমুক্ত। বায়ু এবং খাদ্যের রয়েছে নির্ভেজাল উপাদান। রয়েছে ৪ হাজার বছরের আদিবাসীদের অতীত ইতিহাস। যুগে যুগে জন্ম দিয়েছে ব্যারিস্টার দেবাশীষ, ড. নীরু কুমার চাকমা, মহারাণী নিহার দেবী, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, মনি স্বপন দেওয়ান, রাজা অংসুপ্রু, কনক চাঁপা চাকমা, রাজা ত্রিদিব রায়ের মতো বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক। তারা নিজ নিজ এলাকায় অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মন্দির, উপাসনালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ করেছেন। ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা পেলে পার্বত্য জেলার প্রতিটি উপজেলায় কৃষি, টেক্সটাইল পর্যটন, তাঁত, মেডিকেল স্কুল, ভেটেরিনারি ইনস্টিটিউট নির্মাণে বহু বিদ্যুৎসাহী শিক্ষানুরাগী এগিয়ে আসতে পারতেন।

মানুষে মানুষে বিভাজন ত্যাগ করে মানবতার সমন্বয় সাধন করে সমগ্র বাংলাদেশের মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন করা উচিত। প্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকের ব্যর্থতার গ্লানী মুছে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশকে আদিবাসী যুবকদেরকে ডিপ্লোমা শিক্ষা কোর্সে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়া উচিত। এর জন্য ডিপ্লোমা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ আইন সহজ-সরল করতে হবে। আদিবাসীদের প্রযুক্তি উন্নয়ন চিন্তা করে বিভাগভিত্তিক ডিপ্লোমা শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। বোর্ডের কর্মউদ্যোগী পরিকল্পনায় আদিবাসী অনাবাসী বৈষম্য দূর হবে। শিক্ষা হয়ে উঠবে কর্মনির্ভর। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কর্মচৈতন্য সমগ্র দেশের অর্থনীতি বিকশিত হবে।

দৈনিক নয়াদিগন্ত : ৯ আগস্ট ২০১৪

www.pathagar.com

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে লক্ষ্যচ্যুতি

এ দেশের ইতিহাসে ১৯৭০ এবং ২০০৮ সালের নির্বাচন মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৭০ নির্বাচনে স্বাধীনতা, ২০০৮ সালের নির্বাচনে ভিশন ২০২১ এর পক্ষে রায় প্রদান করে এই জাতি। গত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে আসার প্রাক্কালে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা নিজেদের দল ও জোটের প্রার্থীদের ভোট দেয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের ঘোষণা করেছিল দলগুলোর নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে। নির্বাচন উপলক্ষে জোট গঠন করা হলেও মেনিফেস্টো ঘোষিত হয়েছে দলগতভাবে— জোটগতভাবে নয়।

বিএনপি 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও' শিরোনামে ৩৬ দফা কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল। আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টো উপস্থাপিত হয়েছে 'দিনবদলের সনদ' শিরোনামে। ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এতে ছিল ২৩ দফা কর্মসূচি। চারদলীয় জোটের দ্বিতীয় প্রধান শরিক দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং মহাজোটের শরিক দল জাতীয় পার্টিও তাদের মেনিফেস্টো ঘোষণা করেছিল।

মেনিফেস্টোতে মৌলিক অনেক প্রশ্নেরই বিস্তর ফারাক ছিল। যেগুলোর সাথে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। 'দেশ বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও' শিরোনামে বেগম খালেদা জিয়া যেখানে পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন। শেখ হাসিনা সেখানে 'দিনবদলেন সনদ' শিরোনামে ২০২১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিলেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প শোনাতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেছিলেন সংকটের আবর্তে নিমজ্জমান অবস্থা থেকে দেশকে পুনরুদ্ধার করে একটি উন্নত সমৃদ্ধ সুখী সুন্দর জীবন গড়ে তোলাই হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একমাত্র ব্রত। আগামী ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আর ২০২০ সাল

www.pathagar.com

হবে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী।

২০২০-২১ সাল নাগাদ এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি যেখানে সম্ভাব্য উচ্চতম প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি। দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচিয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার ঘোষণা ছিল। একটি প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ, অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল।

এই ভিশন ও রূপকল্পের আলোকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করে নির্বাচনী কৌশলপত্র, যার মূলে ছিল পরিবর্তন বা দিনবদলের অঙ্গীকার। এই কৌশলপত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিপ্রেক্ষিত এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা উন্নয়ন করা হয়েছিল।

এই রূপকল্প বিবেচনায় রেখেই প্রণীত হয়েছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখাতে গিয়ে শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার বর্তমান ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশে আনার ঘোষণা দিয়েছিলেন। নতুন প্রজন্মের যে তরুণ তরুণীরা ২০০৮ সালে ৯ম সংসদ নির্বাচনে প্রথম ভোটার হয়েছিল তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রণীত ভিশন ২০২১ উৎসর্গ করেছিলেন।

নির্বাচনী ইশতেহার ২৩ দফার উল্লেখ্যযোগ্য দিক ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ, গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, মংলা পোর্ট অবকাঠামো উন্নয়ন, পদ্মা সেতু নির্মাণ, গ্যাস, কয়লা ও খনিজ সম্পদ উত্তোলন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন, সমুদয় জমির রেকর্ড কম্পিউটারাইজেশন করা, রংপুর নতুন বিভাগ গঠন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, গ্রামীণ আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকরণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, জৈব প্রযুক্তি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সংযুক্ত, কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪ লাইন বিশিষ্ট এক্সপ্রেস সড়ক নির্মাণ, এশীয় রেল ও সড়ক পথ নির্মাণ, ঢাকায় ভূগর্ভস্থ রেল লাইন নির্মাণ, আকাশ রেল ও সার্কুলার রেলপথ, সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রেল, বাস ও লঞ্চে বিনামূল্যে চলাচলের সুযোগ দেয়া, সাহসী, দক্ষ ও অজেয় প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প বাস্তবায়ন, বাংলাদেশকে এশীয়

www.pathagar.com

হাইওয়ে ও এশীয় রেলওয়ের সাথে সংযুক্তকরণ, ঢাকায় পাতালরেল, মনোরেল, সার্কুলার রেলপথ এবং এলিভেটর (দোতলা) রাস্তা নির্মাণ, গড় আয়ুষ্কাল ৭০ এর কোটায় উন্নীতকরণ, ক্রীড়া ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন, আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ ও সুযোগসুবিধা সম্প্রাসারণ, দক্ষ শ্রমশক্তির রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিবেচনায় ট্রেডভিত্তিক ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক পরিবারের একজন কর্মক্ষম তরুণ তরুণীকে কর্মসংস্থান প্রদান করা ইত্যাদি।

ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নত, মধ্যম সারির এবং স্বল্প উন্নত দেশের মাথাপিছু গড় আয়, শিক্ষার হার, পুষ্টি গ্রহণ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, বাসস্থান, অবস্থান, প্রবৃদ্ধি, বিদেশি বিনিয়োগ, প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মানবসম্পদ, উন্নয়ন সূচকগুলো আলোচনা পর্যালোচনা করে দেখেছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার এবং রূপকল্প ভিশন ২০২১-এর মাত্র ৫৩ শতাংশ বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এশিয়ার যে কোনো দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। ৬৩ শতাংশ বাস্তবায়ন হলে বিশ্বের ৭ম স্থান দখল করে নিবে। গোল্ডম্যান সাচ নামক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছে ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশ পৃথিবীর ২২তম উন্নত দেশে পরিণত হবে।

দিন বদলের অঙ্গীকারকে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিল। মানুষ ভোট দিল। দিল এমনভাবে যাতে ক্ষমতার কোনোই কমতি না থাকে। একেবারে একতরফা ভূমিধস ক্ষমতা দিল। মানুষের মূল আশা পূরণ হওয়ার প্রত্যাশা। এ আশা প্রত্যাশা থেকেই মানুষ মুক্তিযুদ্ধের ৩৮ বছর পর আবারো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল।

দেশ পরিচালনার শেষবর্ষে এসে দেখা গেল রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে কোনো পরিকল্পনাই অগ্রগতি হয়নি। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে ৬ দশমিক ৪ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে মনে করছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। গত বছর ভিয়েতনামে ৭০০ কোটি ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। আর বাংলাদেশে এসেছে মাত্র ১০০ কোটি ডলারের মতো। এখন আমাদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৯২৩ ডলার। সে হিসাবে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় নাম লেখানো হয়েছে বাংলাদেশকে।

www.pathagar.com

বর্তমান বাংলাদেশে উন্নয়ন অগ্রগতিতে যে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে তা হচ্ছে বেকার সমস্যা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে বেকার সমস্যা আমাদের বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হচ্ছে। কখনোবা পরীক্ষার ফিসের জন্য জমি বিক্রয়, হালের গরু বিক্রি, কত কষ্ট স্বীকার করে লেখাপড়া করতে হচ্ছে। এত ত্যাগ স্বীকারের পরও সন্তানের শিক্ষাজীবনের ইতি টেনে চাকরির খোঁজে গেলে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে পায়। চার দিকে নো ভেকেন্সি, ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই। এসএসসি এইচএসসি বিএ কিংবা মাস্টার ডিগ্রি সার্টিফিকেট তখন যেন অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে এই শিক্ষিত বেকাররা নিরুপায় হয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হয়। বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় উন্নয়নের বৃহৎ ক্যানভাস। সেই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সার্টিফিকেট প্রদান শিক্ষা বন্ধ করতে হবে। চালু করতে হবে কর্মকেন্দ্রিক ডিপ্লোমা শিক্ষা।

বিষয়ভিত্তিক ডিপ্লোমা প্রযুক্তিবিদরা জাতির জনকের কন্যা-ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে সক্ষম হবে। প্রতি বছর নতুন যে ২২ লক্ষ মুখ কর্মে প্রবেশ করে তার অর্ধেককে ডিপ্লোমা প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে রূপকল্পের লক্ষ্য পূরণে অর্থনীতির গতি বাড়বে। বাস্তবে রূপ লাভ করবে ভিশন ২০২১।

দৈনিক জনকণ্ঠ : ১৪ আগস্ট ২০১৩

www.pathagar.com

দিনবদল প্রত্যাশার গুড়েবালিতে তরুণ প্রজন্ম

ক্ষমতায় যাওয়া রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হলেও এ পথটি সহজ বা মসৃণ নয়। গণতান্ত্রিক ধারায় ক্ষমতায় যেতে হলে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হয়। জনআস্থা অর্জনে সুচিন্তিত পন্থায় আন্দোলন-সংগ্রাম চালাতে হয়। নির্বাচনে জন প্রত্যাশার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করতে হয়।

দিনবদলের সনদ প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ এবং দেশ ও মানুষ বাঁচানোর ডাক দিয়ে বিএনপি গত নির্বাচনী ইশতেহার উপস্থাপন করেছিল। মূলত উভয় ইশতেহারেই জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন কর্মসংস্থান ও উন্নত অবকাঠামো স্থাপনের অঙ্গীকার ছিল। তুলনামূলকভাবে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে প্রতিশ্রুতির সংখ্যা বেশি এবং ভিশন অনুযায়ী ২২টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ ছিল, যা ইশতেহারকে আকর্ষণীয় করেছে।

শিল্প, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বাণিজ্যিক কৃষি, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্রামীণ অকৃষিজ খাতের উন্নয়ন, বিশ্বায়ন মোকাবেলায় উপযুক্ত কর্মকৌশল গ্রহণ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ শীর্ষক ছিল ২২ দফা।

বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য অপার সম্ভাবনাময় নতুন প্রজন্মের ভোটার তথা তরুণ-তরুণীদের শ্রম, মেধা, জ্ঞান ও মননকে কাজে লাগানোর কথা ছিল আওয়ামী লীগের দিন বদলের অঙ্গীকারে। ইশতেহারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু প্রসঙ্গে ডিপ্লোমা শিক্ষা গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ দেখতে পায় আওয়ামী ইশতেহার বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ পাঁচ বছরে এশিয়ার যে কোনো দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

এ লক্ষ্য পূরণের অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ২৬২টি আসনে জয়ী হয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৩০টি, জাতীয় পার্টি ২৭টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ৩টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ২টি আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট মোট ৩৩টি আসনে জয়ী হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) দলীয়ভাবে ২৯টি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২টি ও বিজেপি ১টি আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনে ৯০ থেকে ৯৫.৪৩ শতাংশ পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৮৫টি আসনে যা দেখিয়েছে তরুণরা।

অতি আশা কখনো কখনো হতাশায় পরিণত হয়। সাড়ে চার বছর আগে জনগণ বর্তমান ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকারকে অতি আশা নিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল। সরকারের প্রতি আশা ছিল সরকার ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়ন করে সুখী সমৃদ্ধ দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে। কিন্তু বাস্তবতা বড় নির্মম। সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় তরুণ সম্প্রদায়কে উপেক্ষিত রাখা হয়েছে। পরিকল্পনা হয়নি বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী করার। প্রতি বছর গড়ে ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। নিজ মেধা, অভিভাবকের অর্থনীতি ও দাপটে ৬০ হাজার তরুণ উন্নতির শীর্ষ শিখরে উপনীত হয়। কর্মকেন্দ্রিক ডিপ্লোমা শিক্ষার অভাবে বাকি ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার তরুণ দিকনির্দেশনাহীন হয়ে বেকার জীবন কাটায়।

আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোয় তিনটি প্রজন্ম অভিভাবক-নিজ-সন্তানকে কর্মহীন রেখে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মহাজোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সাড়ে চার বছর পার হয়ে গেছে। এখনও অনেক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়নি। এর প্রভাব পড়েছে স্থানীয়, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনগুলোতে জনপ্রিয়তার লড়াইয়ে বিরোধীদলের সামনে দাঁড়াতে পারছে না আওয়ামী লীগ।

কর্মসংস্থানের প্রতিক্ষায় থাকা কোটি তরুণের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবা হয়নি। তরুণদের কল্যাণে উপস্থাপিত নির্বাচনী ওয়াদা পূরণে নির্বিকার থেকেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় শেষ ভালো যার সব ভালো তার। দিন বদলের স্লোগান বাস্তবায়নে তরুণদেরকে কর্মমুখী করতে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রশিক্ষিত তরুণরা দিন বদলের অঙ্গীকারকে দল বা গোষ্ঠীর না ভেবে আপামর দেশবাসীর প্রত্যাশায় রূপান্তর ঘটাবে। তাহলেই পূরণ হবে মহাজোট সরকারের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

দৈনিক বণিকবার্তা : ১৯ আগস্ট ২০১৩

www.pathagar.com

উদ্ভাবনশীলতার সূচক অধঃপতনে বাংলাদেশ

গত ৬ আগস্ট মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক গ্লোবাল ইনভেনশন ইনডেক্স বা জিআইআই উদ্ভাবনশীলতার সূচক ২০১৩ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। এতে বাংলাদেশের উদ্ভাবনশীলতা কমেছে। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ ১৮ ধাপ নেমে গেছে। বিশ্ব উদ্ভাবনশীলতা সূচকে বাংলাদেশ এখন ১৪২টি দেশের মধ্যে ১৩০ তম।

কোন দেশ কতটা উদ্ভাবনশীল, তার ওপর করা এই প্রতিবেদনের নাম গ্লোবাল ইনভেনশন ইনডেক্স (জিআইআই) বা বৈশ্বিক উদ্ভাবনশীলতার সূচক। প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জনসন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, দ্য বিজনেস স্কুল ফর দ্য ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক পরিবেশের অবনতি, মেধাবীদের দেশে ধরে রাখতে না পারা এবং শিক্ষা ও জ্ঞাননির্ভর কর্মকাণ্ডেও ঘাটতি রয়েছে বলে অংক করে দেখিয়েছে।

মানবসম্পদ ও গবেষণা, অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, অনুকূল বাজার ও ব্যবসায়িক পরিবেশে উদ্ভাবনশীলতার প্রকৃত ফলাফল অর্জিত হয়। কোন দেশ জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কতটা সৃজনশীল কাজে ব্যবহার করতে পারে তা নির্ভর করে এই উদ্ভাবনশীলতার ওপর। এ বছর ৮৪টি নির্দেশকের সাহায্যে ১৪২টি দেশের অবস্থান, কর্মক্ষমতা ও দুর্বলতার দিক চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০৭ সাল থেকে প্রতি বছর জিআইআই প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে উদ্ভাবনশীলতার প্রকৃতি জানা এর উদ্দেশ্য।

ব্যবসায়িক নির্বাহী, নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই প্রতিবেদনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সূচকে শীর্ষ পাঁচটি দেশ যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাষ্ট্র। এই সূচকে ভারত তো বটেই, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলঙ্কা ও নেপালের অবস্থান বাংলাদেশের ওপরে।

জিআইআই সূচকে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। এ অঞ্চলে শীর্ষস্থানীয় তিনটি দেশ হলো যথাক্রমে ভারত, কাজাখস্তান ও শ্রীলংকা। প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ২১টি নিম্ন আয়ের দেশের মধ্যে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

অবস্থান ১৭তম। আফ্রিকার অনেক দেশের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের তুলনায় কম হলেও সূচকের ক্ষেত্রে ভালো অবস্থান রয়েছে। সূচকটি তৈরি করার ক্ষেত্রে দেশগুলোর উদ্ভাবনশীলতার পেছনে বিনিয়োগ ও অর্জনকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

দুটি উপসূচকের গড়ের মাধ্যমে জিআইআই নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে একটিতে উদ্ভাবনশীলতার জন্য যোগান হিসেবে ধরা হয়। উদ্ভাবনশীলতার জন্য যেসব প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন প্রয়োজন তা বেশ দুর্বল অবস্থানে আছে বাংলাদেশে। এই বছর বাংলাদেশের অবস্থান ১২৭তম। গত বছর তা ছিল ১১৫তম। এ বছর রাজনৈতিক পরিবেশ ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল হিসেবে উপস্থাপন হয়েছে।

এ ছাড়া সরকারের কার্যক্ষমতায় ১২৭, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় ১১৬, পরিবেশ রক্ষায় ১৩০, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের মানে ১২৭, আইনের শাসনে ১০৯, শ্রমিক বেতনে ১২৯, ব্যবসায়িক পরিবেশে ৮১, ব্যবসায়িক উদ্যোগের সহজসাধ্যতায় ৭৩তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। মানবসম্পদের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আরো দুর্বল। গত বছরের তুলনায় তা ১১ ধাপ কমে হয়েছে ১৩৮।

প্রয়োজনীয় সৃজনশীলতা, সামর্থ্য, জ্ঞান, সামাজিক ও ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রশিক্ষণের গুণাবলির সমন্বয়কে মানবসম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষ দুর্বলতার দিক হলো শিক্ষায় ১৩৭তম, বর্তমানে জাতীয় আয়ের বিবেচনায় শিক্ষা ব্যয়ে ১০৮ তম অবস্থান। অন্য দেশ থেকে এ দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পড়তে আসা শিক্ষার্থীর জন্য এবং বিদেশগামী শিক্ষার্থীর চিত্রটি দুর্বল বলে সূচকে বলা হয়েছে। এই দুই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ১০৫ ও ১৩২।

এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী শিক্ষক অনুপাতে ১১৪, গবেষণা ও উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ৮১তম। প্রযুক্তিশিক্ষা ক্ষেত্রের অধঃপতন উদ্ভাবনশীলতাকে ঢেকে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন ১৪২টি দেশের মধ্যে ১৩০ তম। এখনই যদি উদ্ভাবনশীলতা অধঃপতনের গতির লাগাম টেনে ধরা না হয়, তাহলে সার্বিক সূচক ভয়াভহ নিম্নরূপ ধারণ করবে। এক বছরে যেভাবে ১৮ ধাপ অবনতি হয়েছে, তাতে বিনা চেষ্টাতেই আমরা শেষের থেকে প্রথম হওয়ার 'গৌরব' অর্জন করব। জ্ঞান, চিন্তা, সংগঠন ও সম্পদ বিকাশে উদ্ভাবনশীলতা বাড়ানোর জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সবকিছুরই অভাব আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়।

www.pathagar.com

প্রতি বছর ১০টি মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড থেকে গড়ে ১৪ লক্ষ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। নিজ মেধা, অভিভাবকের অর্থ ও প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে মাত্র ৬০ হাজার তরুণ-তরুণী প্রতিষ্ঠিত হয়। বাকিরা থাকে দিকনির্দেশনাহীন। এসব বেকার যুবক উদ্ভাবনশীলতা সূচক পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখে না। উদ্ভাবনশীলতার ১ম স্থান অধিকারী সুইজারল্যান্ডের ১০০ জন শিক্ষার্থীর ৮২ জন ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করে বাকি ১৮ জন উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। দ্বিতীয় স্থানে সুইডেনে ডিপ্লোমা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার অনুপাত ৭৭। তৃতীয় স্থানে থাকা যুক্তরাজ্যে এই অনুপাত ৬৮, চতুর্থ স্থান অধিকারী নেদারল্যান্ডসে ৩৪৮২, আমেরিকায় ৬৪৮৭টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। বাংলাদেশে ডিপ্লোমা শিক্ষার হার সরকারি হিসাবে ৩ শতাংশ মাত্র। হাতে গোনা কয়েকটি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে।

বাংলাদেশ অমিত সম্ভাবনার দেশ। বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের মানুষের চেয়ে উন্নত মানসম্পন্ন, গুণসম্পন্ন, ধৈর্যশীল, পরিশ্রমী, সাহসী, মেধাবী। বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা বিদেশের মাটিতে তাক লাগানো উদ্ভাবনার জন্য পুরস্কৃত হচ্ছেন, সেখানে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকার কারণটি যে বিষয়ভিত্তিক লেখাপড়া ও পদপ্রাপ্তি বা মূল্যায়ন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকার কোনো কারণ নেই।

আমাদের উন্নয়নের পথে এখন সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ডিপ্লোমা শিক্ষায় গোঁজামিল, অপচয় এবং সুশাসনের অভাব। বর্তমানে মানসম্মত ডিপ্লোমা শিক্ষা নিশ্চিত করা সমাজের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মানসম্মত ডিপ্লোমা শিক্ষাই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায় এবং উন্নত জীবনযাপনের প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবমুখী করে।

প্রতি বছর ১৪ লক্ষ এসএসসি পাস তরুণ থেকে কমপক্ষে ৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিপুল সংখ্যক ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের মেধা, শ্রম ও সুনির্দিষ্ট কর্মের বিনিময়ে এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে উদ্ভাবনশীলতা সূচকে বাংলাদেশ প্রথম দশটি দেশের শীর্ষ তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হবে।

আমাদের সময় : ২৭ অক্টোবর ২০১৩

www.pathagar.com

একটি ইত্যাদি প্রকাশনা

ISBN 978 984 904 428 4

www.pathagar.com